

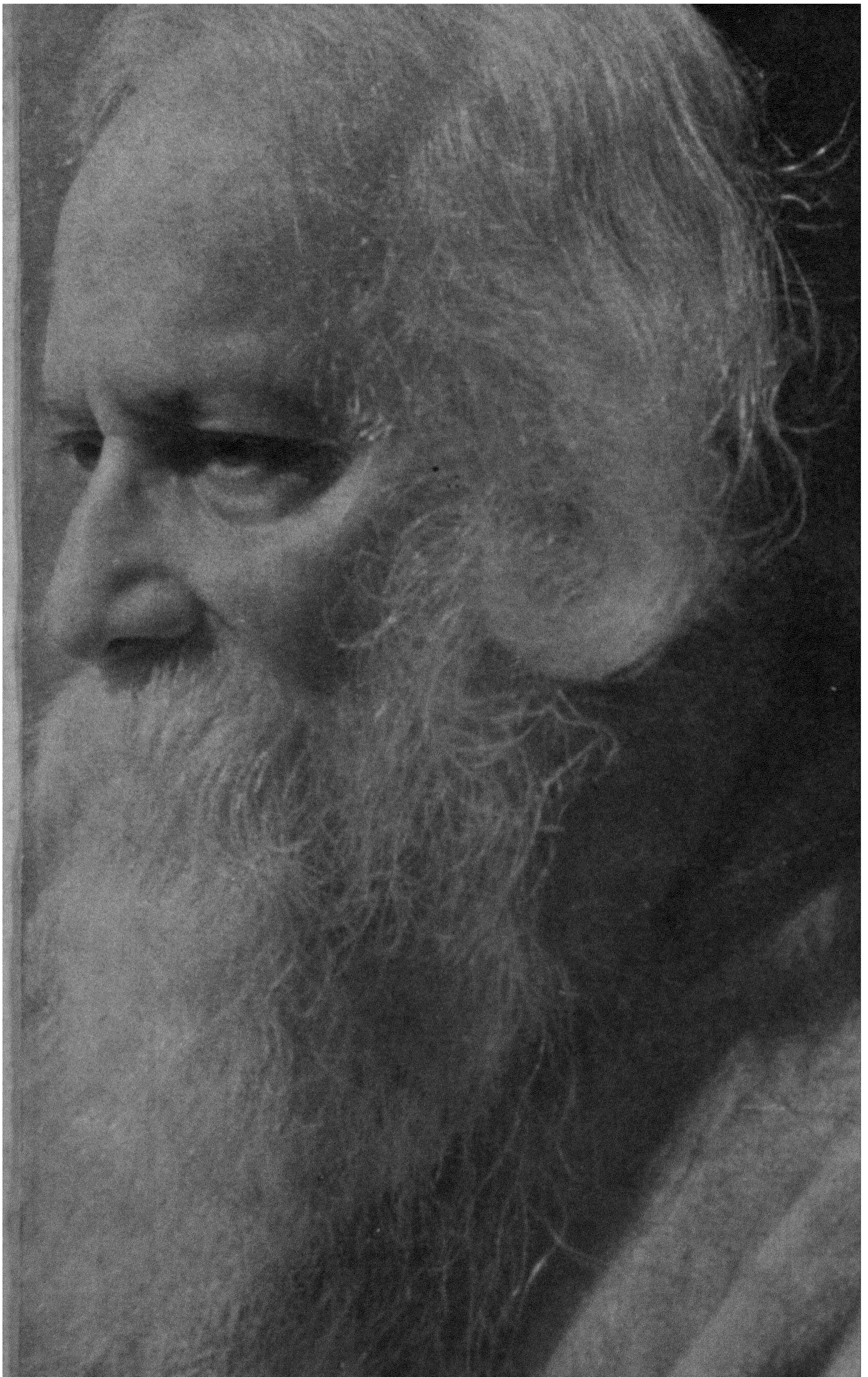
গল্পগুচ্ছ

বিশ্বনাথশর্মা



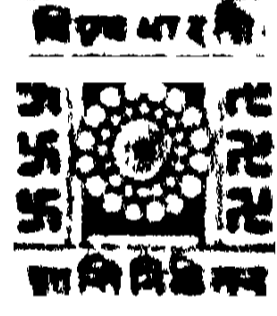
গল্পগুচ্ছ





গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বাল্মীকিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

विश्वभारती-संस्करण गणपगदूछ  
तिन खण्डे प्रकाश : १००० बंगाल  
साम्प्रतिक पदनरुमदुग : १०७०-१०७४ बंगाल  
एकत्र प्रचार . फाल्गुन १०७४ : १४९९ शकाल  
माघ १०७७ : १४४९ शकाल

वर्तमान ग्रन्थे बांग्ला १२९९ कार्तिक हईते १३५० कार्तिके मध्ये  
प्रकाशित रुदीन्दुनाथेव वरिष्ठ सकल गणपई एकत्र संकलित।  
परवर्ती काले (बांग्ला १३५७ ९५) त्र. ति. ति.  
गणपेव सामयिक पत्रे प्रकाश, सेगुलि  
'तिन संगी' ग्रन्थे पाठ्या मईते

प्रकाशक श्रीपु.निर्वाहारी सेन  
विश्वभारती। ७/३, म्बाककानाथ ठाकुर सेन कलिकाता ९

मुद्रक श्रीप्रतापचन्द्र राय  
श्रीगौराङ्ग प्रेस प्राईवेट लिमिटेड। ९, चिन्तामणि नास सेन। कलिकाता-९

বর্নানুক্রমিক

সূচীপত্র

অতিথি	...	০২৮
অধ্যাপক	...	০৬৬
অনধিকার প্রবেশ	...	২২১
অপরিচিতা	...	৭০৭
অসম্ভব কথা	...	১৭৫
আপদ	...	২৭০
ইচ্ছাপূরণ	...	০৪২
উদ্ভাস	...	৪২৭
উল্লসিতের বিপদ	...	৪৪৭
১. একটি আশ্রয় গল্প	...	১০
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	...	১১১
একবর্তি	...	৪৩
কমলা	...	৫৩
কলিতা	...	৫১৭
কল্পিত ওয়াল	...	১২১
কল্পিত পান	...	৩১৩
কথা	...	২১৫
কোকাব নুর প্রত্যাহ্বান	...	৫১
কিশি	...	২৫
২. গল্পগ্রন্থ	...	৫৭০
ঘাটের কথা	...	১
চিত্রকর	...	৭৭২
ডবল মন	...	৭৭৬
ছুটি	...	১০৬
জয়পরাজয়	...	১২১
জীবিত ও মৃত	...	১৫
ঠাকুরদাস	...	২৬৬
ডিউক্টিভ	...	০৬২
তপস্বিনী	...	৭১৬
৩. তারাপ্রসার কীর্তি	...	৩৫
তাগ	...	৭৫
দর্পহরণ	...	৪১৭



দানপ্রতিদান	...	১৫৪
দালিয়া	...	৫৫
দিদি	...	২৮২
দুরাশা	...	৩৪৭
দুবুন্ধি	...	৪৩০
দৃষ্টিদান	...	৪০৭
দেনাপাওনা	...	১৩
৫ নষ্টনীড়	...	৪৫৩
নামঞ্জুর গল্প	...	৭৫৪
নিশীথে	...	২৬৩
পগরক্ষা	...	৬১৩
পয়লা নম্বর	...	৭২৯
পাত্র ও পাত্রী	...	৭৪১
পদ্রবজ্ঞ	...	৩৫৮
পোস্ট্‌মাস্টার	...	১৯
প্রতিবেশিনী	...	৪৪৯
প্রতিহিংসা	...	৩০৭
৫ প্রায়শ্চিত্ত	...	২৪৬
ফেল	...	৪৩৪
বলাই	...	৭৬৮
বিচারক	...	২৫৭
বোষ্টমী	...	৬৫৮
ব্যবধান	...	৩১
ভাইফোঁটা	...	৬৮১
মণিহারা	...	৩৯৪
মধ্যবর্তিনী	...	১৬৪
মহামায়া	...	১৪৮
৬ মানভঞ্জন	...	২৯১
মাল্যদান	...	৫০৫
মাস্টারমশায়	...	৫৪৬
মুক্তির উপায়	...	৭০
মেঘ ও রৌদ্র	...	২২৫
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	...	৪৪২
রাজটিকা	...	৩৮৪
রাজপথের কথা	...	৯

কামকানাইয়ের নিবন্ধিতা	...	২৭
রাসমণির ছেলে	...	৫৮৪
৭ রীতিমত নভেল	...	১১৭
শাস্তি	...	১৮২
শুভদৃষ্টি	...	৪৩৭
শেষের রাত্রি	...	৬২৪
সংস্কার	...	৭৬৪
সদর ও অন্দর	...	৪২৪
সমস্যাপূরণ	...	২১০
সমাপ্ত	...	১১৪
সম্পত্তি-সমর্পণ	...	৪৮
সম্পাদক	...	১৬০
৪ সূভা	...	১৪২
স্বর্গ পত্র	...	৬৬৯
স্বর্ণমৃগ	...	১০৮
হালদারগোষ্ঠী	...	৬৩০
৪৪ হৈমন্তী	...	৬৫৭



## ঘাটের কথা

পাষণে ঘটনা যদি আশ্চিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোথিতের দেহে নতুন প্রশ আনিয়া দিতেছে। তরুণরূপ অর্মান একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আত্মকননের নীচে কখনো কখনো জাগিয়াছে সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার ব্যবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্ত বোঝা জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া বাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহার কাঁচা সোনার মতো রঙ, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। রৌদ্রের এমন রঙ আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাথিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিয়া যেন আলোতে পাখা মেলিয়া অনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া স্বকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাত্তরীসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু অনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্যমহাশয় ঠিক নিরামিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছে। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাতের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে ঘূরিয়া যায়—কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃষ্ণের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভরে

আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর, চিরদিন নৃতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই-যে বৃন্দা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, মালা জঁপিতে জঁপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘটকুমারীর পাণ্ডা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণবাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম, কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বেড়া হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দূরন্তপন করিলে তিনিও আবার তাহারিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘটকুমারীর নৌকা-ভাসানো মনে পড়িত ও বেড়া কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘটকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমন একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন ডোবে কখন ডোবে। পাণ্ডটুকুই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশ কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছি, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহ একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমন্ডপ পড়িয়াছে ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই-যে অশথগাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সূর্যকট সূর্যকট কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাশাপাশি মূঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কাঁচ কাঁচ পাতা-গুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতোছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বৃকের কাছে কিল্কিল্ করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো

সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়েছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেতর তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইন্টার অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত তখন আমার সাধ যাইত, সে ছায়াটি যদি ধরিতা রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাশে রাখিয়া রাখিতে পারি—এমন তাহার একটা মাহুরী ছিল। সে যখন আমার পাশের উপর পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছ মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পূর্নকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত বা হাসিহাস্য করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার মত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। মত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুঁস, কেহ তাহাকে বলিত খুঁসি, কেহ তাহাকে বলিত রাকুঁসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসুমি। যখন-তখন দেখিতাম, কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর ম্বর্গ ঘাটে আসিয়া কান্দিত। শূন্যলান, তাহাদের কুঁস-খুঁসি-রাকুঁসিকে শব্দবর্ষাড়া লইয়া গিয়াছে। শূন্যলান, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কাঁরা সব নতুন লোক, নতুন ঘরবাড়ি, নতুন পথঘাট। জলের পক্ষাটিকে কে যেন ডাঙায় বোপণ করিতে লইয়া গেল।

তবে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ের আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একটু অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের ক্রমাল কেমন বিষম শুনাইতে লাগিল, আন্তরনের মধ্যে পাতা কব্জর করিয়া বাতাস কেমন হা-হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শূন্যলান, তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পঠবোগে বৈধবোর সংবাদ পাইয়া, আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া, গায়ের গহনা ফেলিয়া, আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন ম্বর্গ অমলা শব্দবর্ষাড়া করিতে গিয়াছে। কেবল শব্দ আছে, কিন্তু শুনিতোঁছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি চাঁটের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত তখন আমার মনে হইত, যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত ভুলিয়া তাহাকে

কুসি-খুশি-রাবুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভারিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভারিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মূখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনও দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতাম পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল, গায়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্রমাসের শেষার্শ্ব এমন এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাহাদের মনের এক পার্শ্ব উন্মিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে কবিত্তে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই এক দিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আঞ্জিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সে দিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আঞ্জিকার এই শরতের দিন— তাহারা-হীন, তাহাদের সুখদুঃখের-স্মৃতিশেষমাত্র-হীন আঞ্জিকার এই শরতের সূর্যকরোন্মুখল আনন্দচ্ছবি— তাহাদের কল্পনার নিকটে তনুপেকাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগর্দল আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিয়াছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেইদিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোন্মুখলমুখচ্ছবি দীর্ঘকয় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমাব সম্মুখস্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাসঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। এক সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবঙ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা, কী রূপ। মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন তখন আশ্রম জলের কল্লাল শূন্যে পাইতাম না। তাহার সেই কণ্ঠস্বর শূন্যে শূন্যে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব-উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণপটের মতো ফাটিয়া চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশসরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে-এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঁঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাংশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মারাণী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাহার দীর্ঘ শূত্র পূণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠতেন, তাহার ভটাঙ্কট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকরণ তাহার সর্বাপেক্ষা পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটয়া গেল। চৈতন্যে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাদলাতলায় মস্ত হাট বাসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দোঁখবার জনাও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শব্দবর্ষা শুনে সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বাসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-একজনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, “ওমা, এ যে আমাদের কুসুমের স্ত্রী!”

আর একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, “ওমা, তাই তো গা, এ যে আমাদের চাটুভেজদের বাড়ির ছোটোশালবান্দ!”

আর-একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না; সে কহিল, “আহা, তের্মনি কপাল, তের্মনি নাক, তের্মনি চোখ!”

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী নিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, “আহা, সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তের্মনি কপাল।”

তখন কেহ কহিল, “তার এত দাঁড়ি ছিল না।”

কেহ বলিল, “সে এমন একহারা ছিল না।”

কেহ কহিল, “সে যেন এতটা লম্বা নয়।”

এইরূপে এ কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না। গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। কিঞ্চিৎ পোকা কিং-কিং করিতেছিল। মন্দিরের কাসির ঘণ্টা বাজা এই কিছুকণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ কীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে।



পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্ ছল্ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অব্যাহিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝোপে গাছে-পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চুড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের উর্ধ্বচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম তাহার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী।”

কুসুম কহিল, “আমার নাম কুসুম।”

সে রাত্রি আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছই ছিল কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রি সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে অসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে এক ধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুদ্ধিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চূপ করিয়া বসিয়া শুনিত; সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিচল তাতাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত, দেবসেবায় আগ্রহ করিত না, পূজার ফুল তুলিত, গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাতাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি স্মান ছায়া ছিল তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তির প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পাঞ্জার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিস্ময় প্রকল্পিত তাহার সর্বশবীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান-সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যা-

বেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশ বাঁজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রতুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষণ-হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গৈপ অঙ্গৈপ যেন যৌবনের সঙ্গাব হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, “প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।”

“হাঁ, তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসদায় তোমার এত অবহেলা কেন।”

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

“আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।”

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, “প্রভু, আমি পাপীরসী, সেইজন্যই এই অবহেলা।”

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা দূরিতে পারিয়াছি।”

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল—সে হস্ততো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুদ্ধিমান। তাহার চোখ অঙ্গৈপ অঙ্গৈপ জলে ভরিয়া আসিল সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে অঁচিল ও কিসা সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কহিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছু দূরে সখিয়া গিয়া কহিলেন, “তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।”

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে হামিল, মাঝে মাঝে কথা ব্যথিয়া গেল—“আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি যোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতাব মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাহাকে পূজা করিতাম, সেই অন্তরে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্যামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাহার বাম-হস্ত আমার দক্ষিণহস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব, কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন কখন তাহাকে দেখিলাম, আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গো সঙ্গো রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না; আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।”

যখন কুসুম অশ্রু মর্দাছিয়া মর্দাছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম, সম্যাসী সবলে তাহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাখান চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সম্যাসী বলিলেন, “যাহাকে ম্বশ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।”

কুসুম জোড়হাতে কহিল, “তাহা বলিতে পারিব না।”

সম্যাসী কহিলেন, “তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে ম্পন্ডে করিয়া বলো।”

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পিড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, “নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।”

সম্যাসী কহিলেন, “হাঁ, বলিতেই হইবে।”

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “প্রভু, সে তুমি।”

যেমন তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল অমনি সে মর্দিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সম্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল তখন সম্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, “তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর-একটি কথা বলিব, পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম; আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বনো, এই সাধনা করিবে।”

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্যাসীর মূখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “প্রভু, তাহাই হইবে।”

সম্যাসী কহিলেন, “তবে আমি চলিলাম।”

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। সম্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, “তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাকে ভুলিতে হইবে।” বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিলে পাইলাম, আর কিছু দৃষ্টিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিমিমাষ্ট কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মূর্খের শাপে পাবাগ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও কেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্ৰিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বকের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেড়ান করিয়া, বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ঐশ্বৰ্যের সহিত ধূলার লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শূন্য শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি সিন্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিররের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অশ্ব-ভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাতদিন পদশব্দ। কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্ৰার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহীনশ মূৰ্খের ন্যায় আর্ষিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিনেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছাঁবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়; মনে হয়, যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মূর্ত্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অক্ষুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই; তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই; তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, 'আমি চলিই বা কেন, থামিই বা কেন'— তাহার পদক্ষেপে আমার শূন্য ধূলি যেন আরও শূন্য হইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শূন্যতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটোমাত্র শূন্যতে পাই। বাকিটুকু শূন্যতার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি তখন দেখি, সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা, ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পারি। ওই শূন্য, একজন গাছিল, "তারে বলি-বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শূন্য। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত ধরিয়া আমার কানে শূন্য হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মূর্ত্তের দিকে চাহিবে, তখন বলি-বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, অতি ধীরে ধীরে ফিরায়া আসিবার সময় আবার যদি গায় 'তারে বলি-বলি আর বলা হল না'।

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়ে রাখতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পাড়তেছে, আবার নতুন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মূছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পাড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পদাঙ্গুত্বের মধ্য হইতে এমন-সকল অমর বীজ পাড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পাড়িয়া অক্ষুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্ব স্থায়ীরূপে বিরাজ কবিতেছে এবং নতুন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক— আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সন্দরে অবস্থিত তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ঐর্ষ্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিবাহ, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সন্দেহ হইতে, গৃহবাহ্যন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা ভুলিয়া সূর্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিয়া মৃত সচিবের শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না।

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালক-বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ, মাতার স্নেহ, গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই স্তম্ভকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। নিম্নলিখিত লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগড়াল যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, উহাদের পায়ের বাজিতেছে। কুসুমের লজ্জের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাখিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরণ-চরণ চলি যাতা

তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মকু গাতা।

অরণ-চরণগড়াল এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত— ছোটো দুটি নুপুড়ের বন্দবন্দ করিয়া তাহার পায়ের কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বৃদ্ধি তাহার ঠোঁট

দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, দুটি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো স্ফলনভাবে মূখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে সেখানে সে শ্রান্তমেহে গাছের তলায় চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না—হয়তো-বা আকাশের তাহার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের স্ফারে গিয়া পূর্ববী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপনে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-শ্রম্পর্শ সর্বাপেক্ষা অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোদুলির কাকের ডাক একেবারে থাকিয়া যাইত, পাখকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন কর্ণকর্ কর্ণকর্ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত, ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষার্শ্বের অপরাহ্নে যখন বিস্তর অন্ধমূকুলের কেশর বাতাসে করিয়া পড়িতেছে—তখন আর-একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাতে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শব্দ পাতা করিয়া পড়িতেছিল তেমনি মাঝে মাঝে দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তন্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্নে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাতে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে, ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মূখ চাকিয়া বুক ফাটিয়া কর্ণকর্ লাগিল। কে গা না? অর্থাৎ এই বিজ্ঞান রাতে আমার কক্ষও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই বাহার কাজ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেষ্টাও করিল। তুই বাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেষ্টাও মূক। তুই বাহার মূখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেষ্টাও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল চোখ মূছল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী ঘনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শ্রান্তমূখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো মূখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চলির আলোতে পা ছড়াইয়া বাসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পলশন নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পারের কর্ণ নুপূরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একশব্দ শোক কহিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রথর রৌদ্র। উজ্জ্বল। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি, আর তন্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, ভরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এইজন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের

জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই বাস্তু। এমন স্থানে নিজের পদগোরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণাচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না—হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

## দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিথ্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাঠ কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়-বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সম্মান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়-বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাঠ কোনো-মতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা নিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সূদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সমরকালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।” রায়বাহাদুর বলিলেন, “টাকা হাতে না পাইলে বর সমাপ্ত করা যাইবে না।”

এই দৃষ্টিনার অন্তঃপূরে একটা কারো পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চর্চিল পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিরা চূপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকূলের প্রতি যে তাহার শুব-একটা ভক্তি কিম্বা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, “কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।”

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, “দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার?” দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, “শাস্তিশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।”

বর্তমান শিক্ষার বিঘ্ন ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতাশ হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষন্ন নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বৃকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, “তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে



না, বাবা।” রামসুন্দর বলিলেন, “কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।”

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখতে পান, কোনোদিন-বা দেখতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান তো সহ্য যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বাসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে ম্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শশুরাড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, “আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখলে চোখ জুড়াইয়া যায়।” শশুরাড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, “শ্রী তো ভারি। যেমন ঘবের মেয়ে তেমন শ্রী।”

এমনকি, বউয়ের খাওয়াপরাও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপবিত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শশুরাড়ি বলে, “ওই ঢের হয়েছে।” অর্থাৎ, বাপ যদি পুত্র দাম দিত তো মেয়ে পুত্র যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধুর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বাসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাহাদের আর্পিত অত্যন্ত গুরুত্ব হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানা স্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব ব্যাকিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ষ ক্রমশ শব্দক মুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের দৃক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে দিনকতক বাপের বাড়ি বাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে

থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কাঁহল, “বাবা, আমাকে একবার বাঁড় লইয়া যাও।” রামসুন্দর বাঁললেন, “আচ্ছা।”

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই—নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক আধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সমর্যাবশেষে নিরাশ হইলে স্বীয় কথার কাঁহবার মূখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপান বাঁড় আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বাসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাঁড়িতে একটা মন্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বাঁললেন; নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবৃষ্টি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নতুন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আঙ্গুর্গাব আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথার কথার বাঁললেন, “হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাঁচ্ছি অর্মান হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বড়ো হয়ে পড়েছি।” এর্মান এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাঁহর করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অটুহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বাঁললেন, “থাক্, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।” একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাসের উল্লেখ করিয়া বাঁললেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাঁড় আনিবার প্রস্তাব কাহারও মূখে আসে না—কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, ‘সে-সকল কুটুম্বতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।’ মর্মান্বিতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বাঁললেন, “সে এখন হচ্ছে না।” এই বাঁলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মূখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাঁড় ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর দেহাইবাঁড় যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল—তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বাঁললেন, ‘এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নাহিলে আমি—’। খুব একটা শক্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর

যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, “দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?” বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চাড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃন্দ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাহার বধুগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃন্দ তাহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাহার সে সংকোচভাব নাই; স্মাররক্ষী এবং ভৃত্যদেব মূখের প্রতি সে চকিত সলঙ্ঘ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনাব গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তাব পরে রামসুন্দর কহিলেন, “এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।”

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তাহার দৃষ্টি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, “বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?”

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, “তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব! আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবে নে?” রামসুন্দর বাড়ি বিক্রম করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পারা তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মূখ তুলিয়া কহিল, “দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?”

নতিশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুৎসাহে গিয়া বলিল, “পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?”

নিরুৎসাহ সমস্ত ব্যাপার বর্ণিত পারিয়া কহিল, “বাবা, তুমি যদি আর এক পরসে আমার শব্দরকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললাম।”

রামসুন্দর বলিলেন, “ছি মা, এমন কথা বলতে নেই। আর, এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।”

নিরুৎসাহ কহিল, “টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্ষাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার ধলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিলে তুমি আমাকে অপমান করো না। তা ছাড়া আমার স্বামী

তো এ টাকা চান না।”

রামসুন্দর কহিলেন, “তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।”

নিরুপমা কহিল, “না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিরে যেতে চেরো না।”

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিবেদে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতুহলী স্বার-লক্ষনকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে তুলিয়া বাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ তুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পবের ঘরের দাসদাসী এবং কঠীগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেন, এই সংস্কার তাহার মনে বন্ধমূল হইতেনি। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশুড়ি বলিতেন, “নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ঠুর মুখে হোচে না।” কখনো-বা বলিতেন, “দেখো-না একবার, ছিঁরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে কেন পেড়াকাঠি হয়ে যাচ্ছে।”

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, “ঠুর সমস্ত ন্যাকামি।” অবশেষে একদিন নিরু সন্ধ্যায় শাশুড়িকে বলিল, “বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।”

শাশুড়ি বলিলেন, “কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।”

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না - হোঁচল সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেই দিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খুন ধূম করিয়া অস্তিত্বচিহ্নিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সংকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল— এমন চন্দনকাঠের চিত্তা এ মূল্যকে কেহ কখনও দেখে নাই। এমন ঘটনা করিয়া প্রামাণ্যও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব, এবং শূনা বার, ইহাতে তাহাদের কিঞ্চিৎ ধন হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সালফনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, “আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।” রামবাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, “বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।”

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২১৮?

## পোস্ট্‌মাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপূর গ্রামে পোস্ট্‌মাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নতুন পোস্ট্‌আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্ট্‌মাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অশ্বকার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ভত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্য়ামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সম্মত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্ট্‌মাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাধিকা খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পারে। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলারিত হইয়া উঠিত, কোপে কোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উঠেইম্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অশ্বকার দাওয়ার একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি কীর্ণ-শিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্ট্‌মাস্টার ডাকিতেন—“রতন।” রতন স্বেদে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, “কী গা বাবু, কেন ডাকছ।”

পোস্ট্‌মাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোস্ট্‌মাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকার ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্ট্‌মাস্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “আজ্ঞা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?” সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না।

মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্ট্‌মাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্ট্‌মাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি বাজন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রে আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্ট্‌মাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমনকি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমদ্যুত স্মিপ্রহরে ঈষৎ-তন্ত সুকোমল বাতাস দিগন্তেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গল্প উঠিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্রান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গাছের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিকন তরুপত্রবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভূনাবিশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্ট্‌মাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত-সংলগ্ন একটি স্নেহপূর্ণ মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পারে না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাথ-পোস্ট্‌মাস্টারের মনে গভীর নিস্তত্ব মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্ট্‌মাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, “রতন।” রতন তখন পেয়ারাতলার পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “দাদাবাবু, ডাকছ?” পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, “তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।” বলিয়া সমস্ত

দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অর্পাদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশ ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তার চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্ট্‌মাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ স্নানের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অর্পাদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঁপাখুঁপি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্ট্‌মাস্টার তাহার খাটের উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল—'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্ট্‌মাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তন্ত লজাটের উপর শাখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও নির্দি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ বাধ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রাহিল না। সেই মূহুর্তেই সে জননীর পদ আধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বাটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিররে জাগিয়া রাহিল, আপনি পথা রাখিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্ট্‌মাস্টার কীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতার কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন স্নানের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান আধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাকে মাকে উঁকি নারিয়া দেখে, পোস্ট্‌মাস্টার অত্যন্ত অনামনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটের উপর শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীর-চিত্তে তাহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা স্নানের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে বৈদ্য সহসা ডাক পড়িলে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্ট্‌মাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।



পোস্ট্‌মাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্ট্‌মাস্টার আপনাই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জ্বীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্‌টপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রাসাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্ট্‌মাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?”

পোস্ট্‌মাস্টার হাসিয়া কহিলেন, “সে কী করে হবে।” ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যিক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্ট্‌মাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল—‘সে কী করে হবে’।

ভোরে উঠিয়া পোস্ট্‌মাস্টার দেখিলেন, তাহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যিক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুব মন্দিরের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, “রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাঁছ বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ালু হৃদয় হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।”

পোস্ট্‌মাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

রতন পোস্ট্‌মাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্ট্‌মাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।”

কিছু পথথরচা বাদে তাহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন খুসায় পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ের পিঁড়ি, তোমার দুটি পায়ের পিঁড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ের পিঁড়ি, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”— বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্ট্‌মাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁখে ছাতা লইয়া, মূটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুশাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মূখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাধিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বাহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পৃথিবীর উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট্‌আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে কীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতোঁছিল না। হায় বৃষ্টিহীন মানবহৃদয়! দ্রাস্তি কিছুতেই ঘোচে না, বৃষ্টিশাস্ত্রের বিধান বহু বিনম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বৃকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং ম্বিতীয় দ্রাস্তিপাশে পড়িবার জন্য চিস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

## গিনি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পান্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাহার গোফদাড়ি কামানো, চুল ছাটা এবং টিকিটি হুম্ব। তাহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাখা শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পান্ডিতমহাশয়ের দুই একদে ছিল। এ দিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ও দিকে তাঁর বাকাজ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না। এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন, এবং মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালিমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী ম্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারও ভ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁর নাম যম; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বৃদ্ধা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বাল্যই আর নাই। সুরলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশি হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি, এবং আমাদের তিলমাট্র গ্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পান্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শূন্যে ষৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলোদের নৃতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ নই আর কিছুই নয়, কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমনকি নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমনকি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নগিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানব বস্তুর চেয়ে অবস্তুরে বেশি মূল্যবান জ্ঞান করে, সেনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরীতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মযন্ত্রণা আরও শ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্রাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারী ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক; বোধ হয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত; বেশ পড়া করিত; শুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করবার জন্য উদ্ভূত ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবা-মাত্রই মৃদুত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিস্ট্রি এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সমর বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজনা বড়ো অপ্রীতিভ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে শুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু এটা সে শুলের ছেলের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবানের ভাই, এটা যেন তাঁর একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো হুঁটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্রাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজনা মাঝে মাঝে তাহার লাজুনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া, পিঠ নিচু করিয়া, দলানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্রাসের ছেলে সেই লক্ষ্যকাতর হতভাগা বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন শুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় স্নানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীর্চিহিত কাপড়ের খিলের মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্য দিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্রাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত লক্ষ্যহাস্য হাসিয়া কহিলেন, “এই-যে, গিন্নি আসছে।”

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোন, তোরা সব শোন।”

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেগুর উপর হইতে একখানি কৌচা ও দুইখানি পা জুলাইয়া ক্রাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে, এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলক্ষ্যের দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথার শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিম্বা ভগিনী

আর-কেহ নাই, সতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়াল লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুরে বাড়ির গাড়িবান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই-চারিজন পাখিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পদতুলের বিয়ে। তাহারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরোহিতকর হবে?”

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপন্ডিত ভিজা ছাতা মূড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পদতুলের পুরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পন্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া একদৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটিব দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপন্ডিত যখন শূঙ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাম্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর ‘গিম্মি’ নামকরণ করিলেন তখন, প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া, চারি দিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমনসময় একটার ঘণ্টা বাজিল, অন্যসকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি নিম্‌টায় ও ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া স্কারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বাসিত অশ্রুজল আর কিছতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপন্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিতমনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্বাদে আশুকে ফিরিয়া ‘গিম্মি গিম্মি’ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটাবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লক্ষ্যজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনো কালেও যে সে দিনের কথা ভুলিয়া যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

## রামকানাইয়ের নিবন্ধিতা

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাহার শ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া শ্বিতীয় পায়ের হাটু চিবুক পর্যন্ত উঁখিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝাল-চর্চাড়া দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল তখন স্ত্র-পাকৃত চর্চিত ডাটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর-মুখে কহিলেন, “দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যার না।”

এ দিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্ব বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “দাদা, যদি তোমার উইল করবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।” গুরুচরণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন, “আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।” রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, “আমার স্খাবর অস্খাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।” রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাহার কলম সরিতোছিল না। তাহার বড়ো আশা ছিল তাহার একমাত্র পুত্র নবম্বীপ অপূত্রক জাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশার নবম্বীপের মা নবম্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই, এবং সকাল-সকাল বিবাহ নিয়াছিলেন, এবং শব্দে মুখে ভ্রম নিরূপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সেই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নিঃশব্দ হস্তে যাহা সেই করিলেন তাহা কতকগুলো কম্পিত বস্তুরেখা কি তাহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্রোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কানিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল “মাদ্রাকামা।” কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বস্তান্ত শুনিয়া নবম্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিবম গোল বাধাইয়া দিল; বলিল, “মরণকালে বৃক্ষনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—”

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাবান্তরে ভয় বলা হইতে পারে—কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “মেজোবউ, তোমার তো বৃক্ষনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার বা-কিছু বস্তু আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ে, এখন ঠিক সময় নয়।”

নবম্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবম্বীপ মৃত ব্যক্তিকে লাসাইয়া কহিল, “দেখিব মৃখাপিন কে করে—এবং প্রাম্ভশাস্তি যদি করি তো আমার নাম নবম্বীপ নয়।” গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ-সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাকে তার বিশেষ পরিভূষিত ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিচান বলিত, সে ক্রিচ কটিয়া বলিত, “রাম,

আমি যদি ক্রিষ্টান হই তো গোমাংস খাই।” জীবিত অবস্থায় বাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-ষে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবম্বীপ একটা সান্ধনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। ষতদিন ইহলোকে থাকি যার জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিঁদুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।”

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘ পদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুইচারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মত অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।

“ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বৃদ্ধি? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার নিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।—তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো—আমি কেন বেঁচে রইলুম।” রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘সে আমাদের কপালের দোষ।’

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবম্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই-গাড়ী-সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমন অনেকক্ষণ চূপ করিয়া সহ্য করিলেন—অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, “আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।”

নবম্বীপের মা ফোস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন, ‘লেখো’, ভাই অর্মান লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কর্তী করবে বলে বাসে আছ। আমি মলেই কেন্ পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে—আর আমার সোনার-চাঁদ নবম্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগ্গির মরাছি নে।”

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাম্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশ্যে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চূপ করিয়া রহিলেন—যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, যেন তিনি সোনার নবম্বীপকে বিবর হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী স্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বাসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবম্বীপ তাহার বৃদ্ধমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, “কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভুল হইয়া যাইবে।” নবম্বীপের বাবার বৃদ্ধিসুস্থির প্রতি নবম্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরও বৃদ্ধিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নার এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে বরদাসুন্দরী এবং নবম্বীপচন্দ্র পরম্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবম্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবম্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী, এবং সহি কারও বৃদ্ধিবার সাধ্য নাই। তাহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, “দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জুটাইব।”

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পার্কিয়া উঠিল তখন নবম্বীপের মা নবম্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমনকি, কিঞ্চৎ রসলাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, “গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।”

গর্হিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, এক দিনের তরে তো মনে পড়ে নি।” ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরম্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন—অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল—নবম্বীপের মা পদ্রবের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবম্বীপের বাপ বলিলেন, ‘রমণীর মধ্যে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর’—যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবম্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাধ হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবম্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবম্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আদার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আরোজন করিতেছে!

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষু-স্থির হইয়া গেল। উচ্চৈশ্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তোরা এ কী সর্বনাশ করিয়াছিস্।” গর্হিণী ক্রমে নিজমর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “কেন, এতে নবম্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!”

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমারুহন্তী, অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন সংকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে! যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্তগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বৃদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতৃস্পৃহে সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া



লইলে এমনি কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবৃদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্বন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকন্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবম্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবম্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রামকানাইকে ডাক পাড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শূঙ্কওষ্ঠ শূঙ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমণ্ডের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জেরের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবম্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।” এই বলিয়া রামকানাই কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, “বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।”

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, “বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল—আমার সাক্ষ্যে মকন্দমা রক্ষা পায়।”

দিদি বলিলেন, “বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।”

কারাবন্দু নবম্বীপের বৃদ্ধমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাস্তব মধ্যে উঠিয়া বুড়া বৃদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আশ্রিত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ, সর্বকর্মপণ্ডকারী, নবম্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল ‘আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত’—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

## ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালা উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাকা-স্ফুর্তি হয় নাই তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কামা খামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে; এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবৃদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সব্বেষে শিরশ্চালন, তারম্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে চেষ্টা করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্জন করিয়া পালন করিতোছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তর-বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল তখন বনমালী আপনাকে ধনা জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিম্বা একটি ছোটো শিশু কিম্বা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তার পরে হয়তো সামান্য উপস্ববে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিম্বা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তার তারতম্য-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পর্শা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক ব্যঞ্জে বই পড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, চারি দিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রম্ভার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মান্দ্র করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বৃদ্ধি জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রম্ভার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমাপ্রিয় বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বৃদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল

গাছপালাগর্দল, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগর্দলের মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সম্বন্ধে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অন্ধুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আর্দ্রতাপ্রকৃতির ষতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

স্বানের সম্বন্ধে বাগানের উপরেই একটি বাধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কৌচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিম্বা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনই তাহার আগ্রহ দেখিয়া বৃদ্ধা যাইত, এতক্ষণ খৈরসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেণুর উপর বসিত—দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্ম্মরিত করিয়া বাহিয়া যাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বাহিত না। গাছপালাগর্দল ছাবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগর্দল জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বৃদ্ধিত না তাহাও তাহার ভালো লাগিত, যে-সকল কথা আর-কাহারও নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতূকের মনে হইত। এমন প্রস্থান-বান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সর্বিশেষ পরিভূষিত লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বৃদ্ধাইত তাহাই বৃদ্ধিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল বাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পার্শ্ব-নেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে, এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয় তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া বাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাকবন্দ্য আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল তাহাদের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনও বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারই এবং পার্শ্ব-নেবুতে আর-কাহারও কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল, কিন্তু নালা এবং পার্শ্ব-নেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমনকি, পাছে বিন্যাসের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কার কাতর হইয়া বনমালী শ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আনন্দ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিষমভাব প্রকাশ করিত না।

যদিই আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল সোদিন বাড়িতে বিশেষত অস্তঃপুরে পরম উল্লাস পাড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষু ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্নে সন্ধ্যা এমন স্থানস্থানে সেই বাগানের কোণে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারও বিচ, হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সোদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর শুল্কের ছাড়া-কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল— হিমাংশু, বাড়িতে আছে। গড়গড়াড়র নল ফেলিয়া দিয়া বিষয়স্থানে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র স্নানের কাছে বসিয়া তন্ত দেখে হাওরা লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, “কেও।”

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পাড়িয়াছে। ভীষণকণ্ঠে বলিল, “মামা, আমি।”

মামা বলিলেন “কাহাকে বলিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।”

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চূপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল, হিমাংশুদের বাড়ির জানলাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা দেখা বাইতেছিল তাহাও ক্রমে

ক্রমে অনেকগুণি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাতে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল; মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত সে যে একদিনও আসিবে না, এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনও মনে করে নাই এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল, সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে; কিন্তু এক মূহুর্তে যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন ষথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবার দিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমত আজও হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়; কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙলেই আসিবে।' ঘুম কখন ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুণি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দূরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানে নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আত্মপদের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময় !'

## তারাপ্রসঙ্গের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসঙ্গ কিছু লাজুক এবং মূখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বর্ধি বোল-সকল সহজে তাহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাহাকে একটা উজ্বুক-রকমের মনে করিত, এবং লোকেরও দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তারাপ্রসঙ্গকে বলিলেন, 'মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল তা একমুখে বলতে পারি নে'— তারাপ্রসঙ্গ নিরন্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, 'তা তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার যে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন সায়াহ্নের প্রাকালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকূতি-সহকারে ভোজ্য-সামগ্রীর অর্কিণ্ডকরস্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসঙ্গকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন 'এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আরোজন। মহাশয়কে কেবলই কষ্ট দেওয়া'— তারাপ্রসঙ্গ চূপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসঙ্গকে সংবাদ দেন যে, তাহার মতো অগাধ পার্শ্চিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসঙ্গের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসঙ্গ তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্যসত্যই সরস্বতী তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসঙ্গের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আশ্বিনন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অভূক্তি করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অস্ফালনবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারণিত জ্ঞান করিয়া বিকম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসঙ্গের ভাব অন্যরূপ: এমনকি, তাহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌বৃন্দে স্ত্রীকে আশ্বমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসঙ্গের দিন বেশ কাটয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবৃদ্ধি-ক্ষমতার তাহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও

কুণ্ঠিত হইতেন না; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, “তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।” শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না—স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জ্বলের মতো বুঝা যায়, এমনকি নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুন্দর লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, “এ-সব লেখা ছাপাও।”

স্বামী বলিতেন, “বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন : প্রবৃন্তিরেষা ভূতানাং নিবৃন্তিস্তু মহাফলা।”

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন, সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দুর্ভূত গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বন্ধের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-মুখে বলিলেন, “তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।”

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “সত্য নাকি। আচ্ছা, বলা দেখি কী করিতে হইবে।”

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, “কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলো ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক—তার পরে দেখো দেখি, টাকা আর্পনি আসে কি না।”

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বাসিয়া বাসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুন্দর লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সফলপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিতর্নৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনাভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ট্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাঙ্কায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদর্লি-তাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসঙ্গ তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাঙ্কায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ক'টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বাহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো-বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও এক-খানা বই রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যোদিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বাসবার কথা সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বাসিলে উচ্চৈশ্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেল রেখেছে। অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গার উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই একটা জিনিস পাড়তে গিয়া ফেলিয়া দিলেন— তার পরে নিজের বড়ামেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তা নে-না মা, পড় না। তাতে লজ্জা করি।" বাবার বাহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, তাঁনি ওই আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বাহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়া-ছিলেন তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশসুস্থ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "এমন সারস্বত গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্‌স্-এর লন্ডন-বহুসের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ঝড়ি ঝড়ি নাটক-নব্বেলির পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয় তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে ব্যক্তি পদুবান্ধুমে বেদান্তের নাম কখনও শব্দে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসঙ্গবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই— স্থানাভাব-বশত এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত



আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।” কথাটা যদি সত্য হইত তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না তাহার সম্পাদকগণ মদ্রার পরিবর্তে মদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, ‘আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।’ চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুদ্ধিতে পারিলেন না, কিন্তু পুর্লকিতচিত্তে ঘর হইতে মাসুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে ‘বেদান্তপ্রভাকর’ পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন, দাক্ষায়ণীর পঞ্চমসন্তান-সম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফস্বল হইতে কে-একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভালরূপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেবত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসুল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বই তখনই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুদ্ধি উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি ‘গৌড়বার্তাবহ’ আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড় মেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন, এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন ‘নবপ্রভাত’ আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড ‘যুগান্তর’ বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর ‘ভারতভাগ্যচক্র’। তাহার পর? তাহার পর ‘শুভজাগরণ’। তাহার পর ‘অরুণালোক’। তাহার পর ‘সংবাদতরঙ্গভঙ্গ’। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরি-প্রকাশিকা, লালিত-সমাচার, কোটাল, বিশ্ব-বিচারক, লাভগ্যালিতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তি-রশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন; স্বামী বলিলেন, “এখনও অনেক কাগজ বাকি আছে।”

দাক্ষায়ণী বলিলেন, “সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।”

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, “এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের

মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।”

দাক্ষায়ণী বলিলেন, “আহা, ও-সব কথা নয়— আর কী আনলে বলো-না।”

তারাপ্রসঙ্গ বলিলেন, “কতকগুলো চিঠি আছে।”

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, “টাকা কত আনলে।”

তারাপ্রসঙ্গ বলিলেন, “বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।”

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা যড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুদ্ধিতে পারিলেন, ও-পাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুজো তাহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাহারই চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কাহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কর না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এ দিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থ-সংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাহাকে চতুর্গুণ দৃশ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িত্ব করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের ক্ষম্ভে ভুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে-অয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মূহূর্তের জন্য তাহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসঙ্গ পাগলের মতো হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল, “দাদা আমায় এই খানপণ্ডাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।”

বিশ্বম্ভর বলিল, “ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।” এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথর দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিয়া দিয়া বলিলেন, “যখনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ে না। আর, সেই সম্যাসীর মাদলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিও না।” আর, এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাহার স্বামীর

সর্বনাশ করিয়াছে, নতুবা ঔষধ মাদুলি এবং মাথার দিব্য-সমেত তাহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মতো তাহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবৃদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপিচুপি বলিলেন, “দেখো, আমার যে মেয়েটি হইবে সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়া ‘বেদান্তপ্রভা’, তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলবে।”

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন, ‘কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুঁচিল।’

ধাত্রী যখন বলিল “মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে” - মা একবার চাহিয়া নেত্র নিম্নীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন ‘বেদান্তপ্রভা’। তার পরে ইহ-সংসারে আর একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮?

## থোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

### প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামাচক্ৰণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জ্বাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া ম্যুন্সিফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনও তাহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নতুন কর্তীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্তী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নতুন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অস্পর্শিত হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধাবসায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মূখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সূত্র করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র অনুকূলবাট রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পূর্লকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেরি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্‌খিল্‌ হাসাকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিম্বয়ে বলিত, “মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জঙ্গ হলে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।”

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজ্ঞেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চম্ব বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যায়তীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চম্ব।’ বাস্তবিক, শিশুর মাথায় এ বৃদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত

না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্ভেদ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মদুখে দাড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকুল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকুল তাহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সার্টিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মদুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ব্দুপ্-ব্দাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মদুখিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীরগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাত্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—নেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিম্নতমতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, “চন্ন, ফু।”

অনতিদূরে সজল পিঙ্কল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লক্ষ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিন্দু করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দাড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই: ঘোড়া হইতে সে একবারেই সহসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, “দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।” এইরূপ অবিশ্রান্ত নিচিৎ কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, “তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনিছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।” বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মদুহতেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল,

জল খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দৃষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলম্বরে নিবিষ্ট স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবাশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝাঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দ্রুত জলরাশি অক্ষুণ্ণ কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দাঁখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বৃকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, “বাবু—খোকাবাবু—লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার!”

কিন্তু চয় বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দৃষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনার মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লন্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দাঁখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়া বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় “বাবু—খোকাবাবু আমার” বলিয়া ভগ্নকণ্ঠ চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্‌ করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে বত জিজ্ঞাসা করে সে কর্ণিয়া বলে, “জানি নে, মা।”

যদিও সকলেই মনে মনে বুকিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমনকি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, “তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই বত টাকা চাস তোকে দেব।” শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাহার স্তীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন ভাষা কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, “কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলোটিকে জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বোধিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলোটিকে কিছুদিন বাদে চোকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমনকি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—‘তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।’

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাটা যুক্তি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অন্তিমবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টলমল করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, ‘আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।’ তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুস করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাতিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাতিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সন্যোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উদ্ভ্রমবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জ্যোতস্না সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলোটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিত না। মনে মনে

বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অবস্থা হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপৃষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবর্শাবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছূ সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভূতা ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেলনার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্র-নিবাসে ফেলনা বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালোপে ষোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত; এবং ফেলনাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুরূপ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেলনা আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা ঝুংঝুং করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেলনাকে কিছূ টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছূদিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকুলবাবু তখন সেখানে মনুস্বেফ ছিলেন।

অনুকুলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বন্ধের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কঠী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাণগে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকুলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকুল তাহাকে সঙ্গ করিয়া অস্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"



অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, “বলিস কী রে। কোথায় সে।”

“আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।”

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলোট দোঁখতে বেশ—বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলঙ্ক ভাব। দোঁখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনো প্রমাণ আছে?”

রাইচরণ কহিল, “এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।”

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলোটকে পাইবামাত্র তাহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুব্যক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃন্দ ভৃত্য তাহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলোটের সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, “কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।”

রাইচরণ করজোড়ে গদগদ কণ্ঠে বলিল, “প্রভু, বৃন্দবয়সে কোথায় যাইব।”

কঠী বলিলেন, “আহা, থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।”

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, “যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।”

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, “আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।”

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দোঁখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।”

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, “সে আমি নয়, প্রভু।”

“তবে কে।”

“আমার অদৃষ্ট।”

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, “পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।”

ফেল্না যখন দোঁখিল, সে মূসেসফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ

হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, “বাবা, উহাকে মাৰু কৰো। বাৰ্ভিতে থাকিতে না দাও, উহাৰ মাসিক কিছু টকা বৰান্দ কৰিয়া দাও।”

ইহাৰ পৰা রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবাৰ পুত্ৰেৰ মূখ নিৰীক্ষণ কৰিল, সকলকে প্ৰণাম কৰিল; তাহাৰ পৰা স্বেৰেৰ বাহিৰ হইয়া পৃথিবীৰ অগণ্য লোকেৰ মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহাৰ দেশেৰ ঠিকনাৰ কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টকা ফিৰিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

## সম্পত্তি-সমর্পণ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুন্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, “আমি এখনই চলিলাম।”

বাপ যজ্ঞনাথ কুন্ড কহিলেন, “বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো-না।”

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা, তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীনকালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহারবিহাবে তাহারও সেইরূপ অত্যাচ্ছ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কবিত্তে পাবেন নাই, সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যান্য নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে ষতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনেকা হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ঋতুভাঙ্গা-কাতর পার্শ্ব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্র প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে, যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনাভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায় ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, “কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজাবাদশারা মরে কোন্ দংশে? যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধূম করিয়া মরিবে।”

বাস্তবিক, যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ধুনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরাজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার-সেকালের লোক তখনকার-একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার-নব্য বৃন্দাবন তখনকার-প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, “আমি চলিলাম।”

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পরসাদ দেন তবে তাহা গোরস্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধনগ্রহণ মাতৃস্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার

করিল। ইহার পর পিতাপুত্র ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অন্যত-বিপ্লবে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল। বৃন্দাবন কখন তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে, এই আশঙ্কা তাহার সর্বদাই ছিল। যে অতঃপ আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল, এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি-বৎসর-বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সংগে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়াপরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মৃত্যুর জন্য একটা জমাখবচের হিসাব উদয় হইয়াছিল— উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মর্শকিল হইয়াছে, পুত্রের সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালার এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে; বিশেষত বিছানার কাঁধার তাহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পী-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধ্বংস সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার শয়ন-গৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখন্ড দেখিয়া তাহার চক্ষু ছল্‌ছল করিয়া আসিল; সেটি পালিতা-প্রস্তুত-করণ কিম্বা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দূকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমনকি বৎসরে একখানি করিয়া ধ্বংসও নষ্ট করে

তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র ষাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমনকি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাথ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আশ্রয়স্থল হারা শীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন; দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেবা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃন্দকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বৃন্দমুক্ত গির্গিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা কাহিয়া অরণ্যভিত্তিতে পলায়ন করিল—আকাশিক ঘাসে বৃন্দের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভেঙ্গেদেব মধো ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছু দূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আশ্রয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী।”

সে বলিল, “নিতাই পাল।”

“বাড়ি কোথায়।”

“বলিব না।”

“বাপের নাম কী।”

“বলিব না।”

“কেন বলিবে না।”

“আমি বাড় ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।”

“কেন।”

“আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।”

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, “আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?”

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এমনই অস্বাভাবিক নিজেই অভিপ্ৰায়-মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল, যেন পূর্বাভূই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থানীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুদ্ধি, বৃদ্ধ আর বোশাধিন বাঁচবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল, এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বৃকের পাজিরের মতো ঢাকিয়া দেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে-মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, “ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।” বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্ষানা সে সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, “আহা, বাপ-মার মনে না-জানি কত কষ্টেই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাঁপাঠ কম নয়।”

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশ্যে অকথা উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঞ্জ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাঢ়দাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পাখকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সম্বন্ধে বোড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে। নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদাত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কাহিলেন, “তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।”

বালকের ভারি কৌতূহল হইল; কাহিল, “কোথায় দেখাইয়া দাও-না।”

যজ্ঞনাথ কাহিলেন, “এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।”

নিতাই এই নতুন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে, এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারি মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, “চলো।”

যজ্ঞনাথ বলিলেন, “এখনো রাত্রি হয় নাই।”

নিতাই আবার কাঁহল, “রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।”

যজ্ঞনাথ কাঁহলেন, “এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।”

নিতাই মূহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই কাঁহল, “এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।”

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহু কষ্টে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাসিয়া বাসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নির্দ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে ষতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে-মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে হস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কাঁহল, “এইখানে?”

ঘেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহ-ত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিম্নে একটা ঘরের মতো, এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেইসঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল, চারি দিকে পিতলের কলস; মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কাঁহলেন, “নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম, আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই-কটিমাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।”

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কাঁহল, “সমস্তই? ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?”

“যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু, একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত্র

কিম্বা তাহার প্রপৌত্র কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গনিয়া নিতে হইবে।”

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, “আচ্ছা।” যজ্ঞনাথ কহিলেন, “তবে এই আসনে বইস।”

“কেন।”

“তোমার পূজা হইবে।”

“কেন।”

“এইরূপ নিয়ম।”

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বাসিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পাড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বাসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভর করিতে লাগিল; ডাকিল, “দাদা!” যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পাড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কণ্ঠে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন “স্বর্ধাষ্টির কুন্ডের পুত্র গনেশ্বর কুন্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুন্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুন্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুন্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুন্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুন্ডকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায় উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।”

এইরূপ বারবার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের ভাল শব্দ হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ স্তান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল, যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

বাকুল হইয়া কহিল, “দাদা, কোথায় যাও।”

যজ্ঞনাথ কহিলেন, “আমি চললাম। তুই এখানে থাক—তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।”

বালিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহু কণ্ঠে বলিল, “দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।”

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর-একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, “বাব!”

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যজ্ঞের হস্তে যন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরকুন্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ডাঙা মন্দিরের ইস্ট দালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে



জাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে, একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃন্দ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মূখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে “বাবা”।

বৃন্দ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, “চুপ কর। সবাই শুনিতে পাইবে।”

আবার কে ডাকে “বাবা”।

দেখিল রোদ্দ উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানেও কে ডাকিল, “বাবা।”

যজ্ঞনাথ সর্চকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, “বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে। তাহাকে দাও।”

বৃন্দ চোখমূখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, “তোমার ছেলে?”

বৃন্দাবন কহিল, “হাঁ, গোকুল—এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লঙ্কায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি; নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।”

বৃন্দ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাঙড়াইতে হাঙড়াইতে যেন কাতাস আঁকিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, “কান্না শুনিতে পাইতেছ?”

বৃন্দাবন কহিল, “না।”

“কান পাতিয়া শোনো দেখি, ‘বাবা’ বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?”

বৃন্দাবন কহিল, “না।”

বৃন্দ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃন্দ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, “কান্না শুনিতে পাইতেছ?” পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর-চারেক পরে বৃন্দের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নির্বিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন সিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাঙড়াইয়া মূর্খু কহিল, “নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।”

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধূপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলার বেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

## দালিয়া

## ভূমিকা

পরাজিত শা সূজা ঔরঞ্জীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সূজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে, একদিন রাজার আদেশে তাহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা ম্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সূজার একটি নিবাসী কর্মচারী রহমত আলি জর্দালখাকে লইয়া সাতার দিয়া পালান, এবং সূজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনর্তিবলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভৎসনা করিয়া কহিল, “তিমি!” ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নতুন নামকরণ করিয়াছিল। “তিমি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্ম যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকা—”

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আন্দর করিয়া কহিল, “বৃদ্ধা, আজ আমার নির্দি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।”

“তোয় আবার নির্দি কে রে, তিমি!”

জর্দালিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “আমি।”

বৃদ্ধ অস্বাভাবিক হইয়া গেল। তার পর জর্দালিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মূখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুই কাজ-কাম কিছ্ জানিস?”

আমিনা কহিল, “বৃদ্ধা, নির্দির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। নির্দি কাজ করিতে পারিলে না।”

বৃদ্ধ কিয়ৎকণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুই থাকিবি কোথায়।”

জর্দালিখা বলিল, “আমিনার কাছে।”

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, “থাইবি কী।”

জর্দালিখা বলিল, “তাহার উপায় আছে।” বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, “বৃদ্ধা, আর কোনো কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।”

জর্দলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সম্বন্ধে পাইয়া কী করিয়া ধীরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান-রাজসভায় কাজ করিতেছে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল, এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জর্দলিখা আমিনাকে কহিল, “ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।”

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়ায়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে, ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুণ্ড্রগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।”

জর্দলিখা বলিল, “ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীরের কুটির।”

আমিনা হাসিয়া কহিল, “দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বড়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে, তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করবে না।”

জর্দলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, “তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলা। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, পিতা তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।”

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল, কিন্তু বেশ বঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাখিয়া দিলে বড়ার খাইতে পাইবে না।”

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জর্দলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি নিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ করিয়া একটা লক্ষের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জর্দলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জর্দালিখা চম্ভ হইয়া কহিল, “কেও!”

স্বর শূন্যিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জর্দালিখার মূখের দিকে চাহিয়া অস্মানবদনে কহিল, “তুমি তো তিমি নও।” যেন জর্দালিখা বরাবর আপনাকে ‘তিমি’ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জর্দালিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃষ্টভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্রে অগ্নিবর্ণ নিষ্ক্রেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি।”

যুবক কহিল, “তুমি আমাকে চেন না। তিমি জানে। তিমি কোথায়।”

তিমি গোলযোগ শূন্যিয়া বাহির হইয়া আসিল। জর্দালিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, “দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ। ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু নেয়াদবি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।— দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।”

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, “চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিমি। কিন্তু ও তো তিমি নয়।”

তিমি সহসা দঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, “ফের! ছোটো মূখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিমির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।”

যুবক কহিল, “চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিমি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।”

বলিয়া গোপনে জর্দালিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মূখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, “না, তুমি অতি বর্বর। শাহাজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।”

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জর্দালিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহু কষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, “এমনি করিয়া তিন পা পিছ হঠিয়া আইস।” যুবক পিছ হঠিয়া আসিল।

“আবার সেলাম করো।” আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছ হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের স্বেতের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, “ঘরে প্রবেশ করো।” যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের স্বেত রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, “একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।” বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, “দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।”

কিন্তু আমিনার মূখে কিম্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না।

বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জর্দলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, “বাস্তবিক আমি, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এতবড়ো তাহার সাহস!”

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, “দেখ্ দেখ্ বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।”

জর্দলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না—হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “সত্য করিয়া বল্ দেখ্ আমি, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ওই বর্বর যুবকটার জন্য।”

আমিনা কহিল, “তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাছ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, ‘দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি’—দালিয়া মূখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ কবি এইরকম; দু'ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখ্-না, ঘরে পরিয়াছি—বড়ো আনন্দে আছে স্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মূখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুটিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।”

জর্দলিখা কহিল, “আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।”

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।”

এমন করিয়া বলিল, যেন ওই যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয়, এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, “আজ দালিয়া আসে নাই, তিমি?”

“আসিয়াছে।”

“কোথায় গেল।”

“সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পরিয়া রাখিয়াছি।”

বৃন্দ কিছু চিন্তাম্বিত হইয়া কহিল, “যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে এমন সকলেই দূরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক খলু\* দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।”

আমিনা কহিল, “ভাবনা নাই বৃন্দা; আজ আমি তাহার কাছে দুই খলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।”

বৃন্দ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সন্মহে হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে জর্নালখার ক্রমে আর আর্পান্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্য-সমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ের তরু মঞ্জরিত হইতেছে এবং সম্মুখে নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বেচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে-মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রেয় গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবানির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সাহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমাযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্ষের কুঁটরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জর্নালখার কুলগর্ব এবং লোকলজ্জার ভাব আপনাই শিথিল হইয়া আসিল তখন পূর্ণপত কৈলুতরুচ্ছায়ে আর্মিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিহৃত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আর্মিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জর্নালখাও তেমনি আগ্রহের সাহিত প্রতীক্ষা করিত; এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্তের নিজের মনসমাপ্ত ছবি ঐষং দ্রু হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সম্মুখে সহাস্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভৎসনা করিত, আর্মিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সন্ধ্যাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়েই কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাতি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহাবাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ষের দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্যের উচ্ছ্বল ছিল, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরও তাহাকে সম্বন্ধ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নিভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জর্নালখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত, ভাবিত—সন্ধ্যাপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জর্নালখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, “দালিয়া,

এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

“পারি। কেন বলো দেখি।”

“আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বন্ধের মধ্যে বসাইতে চাই।”

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রথর মুখের দিকে চাইয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই। যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বন্ধের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে, এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদ্ভিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, ‘আরাকানের নতুন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সম্বন্ধন পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মগ্ন হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।’

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, “ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।”

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, “জান দালিয়া, আমি রাজবধু হইতে যাইতেছি।”

দালিয়া বলিল, “সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়।”

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিন্তে মনে মনে ভাবিল, “বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।”

আমিনা দালিয়াকে আর-একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল “রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।”

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, “ফেরা কঠিন বটে।”

আমিনার সমস্ত অন্তরাখ্যা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।”

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিম্ব অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, “রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।”

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্য পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমাদের বিষয় আছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অম্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দ্বার  
ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমন্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জর্জলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তদন্তনির্মিত  
কারুকার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের  
উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বস্ত্রের কাছে ছুরিটি  
একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া  
রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়;  
কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতোঁছিল, তাহার ভিতরে কি  
অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর  
হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের  
হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, “বৃঢ়া, তবে চলিলাম। তিথি গেলে তোর  
ধরকথা কে দেখিবে।”

বৃঢ়া একেবারে বালকের মতো কাদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, “বৃঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে, তাহাকে এই আঙুটি  
দিয়ো। বলিযো, তিথি যাইবার সময় দিয়া গেছে।”

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহানন্দরোগে শিবিকা চলিয়া গেল।  
আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরতল অন্ধকার নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাস্বর তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।  
দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জর্জলিখার মুখ বিবর্ণ।  
কর্তব্য যখন পূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিত-  
হৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, নব  
প্রেমের বৃষ্টি হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফটুস্ত ফুলটিকে কেন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে  
যাইতেছি।

কিন্তু, তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের স্বারা নীত হইয়া শত-  
সহস্র প্রদীপের অনিমেব তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভাগিনী স্বপ্নাহতের মতো  
চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মূহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা  
জর্জলিখাকে কহিল, “দিদি।”

জর্জলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মহলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন।  
আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জর্জলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে  
হাসিতেছেন।



জ্বলিখা বলিয়া উঠিল, “দালিয়া!” আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বৃকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মূখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মূখের দিকে চাহিল, দালিয়া চূপ করিয়া হাস্য-মূখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মূখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।

## কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল বুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নাড়িত। দিনের বেলায় আমাদেরকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং কাম্বেল শকুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল, আমাদেরকে সহসা সর্বাবিদ্যার পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে বাহারা আমাদেরকে জানেন তাহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং বাহারা জানেন না তাহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল, একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতোছিল, সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধারিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই-সে রাত্রি দুই প্রহরে একটি নীপশিখা চিরাম্বকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, অব মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাংড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না, এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুদ্ধিতে পাবিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে নৌ বৌ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাগিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, “কেও!” পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, “আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।”

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টি কাছের ভয় দেখানো কিছ, নয়— পাশ-বালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, “এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?”

অন্ধকারে মশারির অন্তিম নিকট হইতে উত্তর আসিল, “বল কী। আমার বুকের

হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাশ্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?”

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, “হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সম্মান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।”

সে বলিল, “তুমি একলা আছ বড়ি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।”

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ-একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, “সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।”

সে বলিল, “সবচেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।”

গিজ্জার ঘাড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

“যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্যাগ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পারিতাপ করিলেন। আমার শব্দর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাস্ত্রীদিকে কাহিলেন, ‘শাস্ত্র যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই।’ সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শুনিতো? কেমন লাগিতেছে।”

আমি বলিলাম, “বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।”

“তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম, আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না।— তোমার কী মনে হয়।”

“খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।”

“দেখো নাই! কেন। আমার সেই কক্ষাল। হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না; এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শব্দক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য এত লাষণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রক্ষুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে

আমাকে কনকচাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর-সকল মনুষ্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমিই সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কক্ষাল আছে।

“আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বৃষ্টিতে পারিতাম যে, একখন্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠে আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমন সৌন্দর্যের ভাঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিম্মলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভূত পৌরুষের মধ্যে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃশ্য ভাঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুষ্ঠ ছিল।

“কিন্তু আমার সেই নিলম্ব নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃক্ষ কক্ষাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এইজন্য পৃথিবীর সবচেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উদ্ভূত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।”

আমি বলিলাম, “তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর, তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।”

“আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বীর অচেন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাশ্রু ওই তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

“দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অশুভ লোক ছিলেন— পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এইজন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

“তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এইজন্য বাহিরের বৃষকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম, এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পদ্মপত্রতলে সন্ধ্যাকীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের

মুর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শুনতেছ? কী মনে হইতেছে।”

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, “মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।”

“আগে সবটা শোনো।

“একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

“আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রক্ত মূখের কিরণতা ষাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মূখের দিকে একবার চাহিলেন, তখন আমি মনে-মনে ডাক্তার হইয়া কম্পনায় নিজের মূখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মূখ; অসংযমিত চূর্ণকুম্বল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনিমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

“ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, ‘একবার হাতটা দেখিতে হইবে।’

“আমি গাশ্রাবরণের ভিতর হইতে ক্রান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চূড়ি পরিতে পারিতাম তো আরও বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন, তিনি আমার জ্বরের উদ্ভাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।— বিশ্বাস হইতেছে না?”

আমি বলিলাম, “অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।”

“কালক্রমে আরও দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

“আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিভাষ্য, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

“কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিভূষিত হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মূখ হইতাম এবং ভালো-বাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যা-বাতাসের মতো হুহু করিয়া উঠিত।

“সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না। যখন চলিতাম নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পারের অঙ্গুলিগূলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নতন-পরীক্ষোস্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে। মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁঝ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে-মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া বাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওরালা সদূর ধরিয়া ‘চাই খেলেনা চাই, চূড়ি চাই’ করিয়া

ডাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধব্ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দোঁখতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরম্ভ করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।— মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।”

আমি বলিলাম, “মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।”

“কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত-ক’টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

“তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলার ডাক্তার তাহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, ক’ী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারের কথায় ডাক্তারের মূখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীতেই দেখিলাম।

“আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড়ো বাকি নাই।”

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, “রাতিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।”

“কিছুদিন হইতে দেখিলাম, ডাক্তারবাবু বড়ো অনামনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম, তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

“আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।’

“সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, ‘মরিতে।’

“আমি বলিলাম, ‘না, সত্য করিয়া বলো-না।’

“তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, ‘বিবাহ করিতে।’

“আমি বলিলাম, ‘সত্য নাকি।’- বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

“অল্পে অল্পে শুনিলাম, এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

“কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য ক’ী। আমি কি তাহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক কাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মনুষ্যের সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

“ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, ‘ক’ী ডাক্তার-মহাশয়, আজ নাকি আপনার বিবাহ।’

“আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি নিমর্ষ হইয়া গেলেন।

“জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘বাক্য-বাদা কিছু নাই যে।’

“শুনিয়ে তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।’

“শুনিয়ে আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, ‘সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।’

“দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে, দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

“আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধু ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আচ্ছা ডাক্তার-মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন।’

“হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকু শেলের মতো বাজিতেছিল।

“অনেক রাতে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

“আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ‘ডাক্তার-মহাশয় তুলিয়া গেলেন নাকি। ষাটার যে সময় হইয়াছে।’

“এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যিক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলঙ্কিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

“ডাক্তার এক চুমুক গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদগদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ‘তবে চলিলাম।’

“বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারানসী শাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিঁদুরকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁধিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

“বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুস্ত জগতের ক্রান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

“বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আন্ধ্রকালের ঘরদুয়ার লইয়া পূর্ণিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মারার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

“ইচ্ছা ছিল, যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর-ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর-ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্‌ শব্দ জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে! বুকুর যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্‌ করিত এবং

যৌবনের পাপাড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রক্ষুণ্ণিত হইত, সেইখানে বেষ্ট নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর, সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।...

“গল্পটা কেমন লাগিল।”

আমি বলিলাম, “গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।”

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখনো আছ কি।” কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮



## মুক্তির উপায়

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মৃদুগম্ভীরের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গম্ভীর প্রচুর গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মৃদুগম্ভীরের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বৃষ্টিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাস্যখুশি ভালোবাসে; এবং বিকচোদ্ভূত পুস্তক যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যমোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যা বেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও হুঁটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির কান্ত হয়। একে নভেল পাঠ, তাহাতে আদর পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতি দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মৃদুগম্ভীর হাস্য, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জটিলতার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, 'বৃদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গম্ভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যিক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধ এবং নতনদের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করে। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গুরুতর

কর্তব্যের স্ফারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাতে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শূনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শূনা যায়, হতভাগ্য কৰ্ণাশ্রু শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

০

কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথ-পাশ্বেবর্তী এক বটবৃক্ষতলে বাসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “আহা, বৈরাগ্যমেবাত্মম্। দারাপুত্র ধনজন কেউ কারও নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।” বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল।—

“শোন্ রে শোন্, অবোধ মন।

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি

সেই সদুক্তি কর্ গ্রহণ।

ভবের শক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অব্বেষণ।

ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।”

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। “ও কে ও! বাবা দেখিছ! সম্বান পেয়েছেন বুঝি! তবে তো সর্বনাশ। আমার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।”

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্থামী চূপচাপ বাসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে হে তুমি।”

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে কুকিয়া বড়ামান্দব বহু কষ্টে যেমন করিয়া পৃথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—

“এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখিছ। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।”

বলিয়া বৃদ্ধ সন্মুখে ফকিরের সম্মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কাঁহল, “বাবা মাখন!”

বলা বাহুল্য বৃন্দের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পার।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিড়েই বল, আর পরমামাই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না। বাবা, তুই কোন্ দঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী; বড়োটিকে না ভালোবাসিস ছোটোটি আছে। ছেলোপিলের দঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কনো, একটি ছেলে। আর, আমি বড়ো বাপ, কদিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁকিয়া উঠিয়া কহিল, “কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।”

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, ‘মন্দ কী, দিন-দুই বৃন্দের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধ্যানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।’

ফকিরকে নিরন্তর দেখিয়া বৃন্দের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্ঠা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, “ওরে ও কেষ্ঠা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।”

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে আধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দেহ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়াকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুন্দর লোক আরাম পায়। তাহারা ভৃত্যও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না; আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভৃত্য অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বড়ো বাপের হাবা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল খামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি অক্ষিপন্ন না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, “আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপস্বী হয়েছেন— চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।”

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিবুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওরে মাখন, তুই কুচুকুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা করলি কী করে।”

ফকির উত্তর দিল, “যোগ অভ্যাস করে।”

সকলেই বলিল, “যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।”

একজন উত্তর করিল, “আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্র আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন কিছতেই তুলতে পারলেন না। সে কী করে হল। সে তো যোগবলে।”

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, “বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।”

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিস্কে প্রবেশ করিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যান্য পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, “বাবা, আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, আমি অন্তঃপূরে ঢুকতে পারব না।”

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, “তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।”

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, ‘এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি।’ কিন্তু দাম্ভায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুঞ্জরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তত্বে ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমানি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল, ফকির অর্মানি নর্তিশরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, “মা, আমি তোমাদের সন্তান।”

অর্মানি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত ধরির মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যনির্মিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, “ওরে ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বললি কাকে।”

অর্মানি আর-একটি কণ্ঠ আরও দুই সুর উচ্চ পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, “চোখের মাথা খেয়ে বসেছিঁস।’ তোর মরণ হয় না!”

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, “আপনারা তুল দ্বাংছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাট্টের দেখুন।”

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, “তের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ করে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাখর আছে। তোমার বম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।”

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ, ফকির একেবারে বাকশক্তিহীন হইয়া নর্তিশরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল, “এতদিন আমার ঘর নিস্তত্বে ছিল, একেবারে টুংলক ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।”

ফকির কবজোড়ে কহিল, “মশায়, আপনার পূর্ববন্ধের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।”

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা, তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ঠিকে আর

কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাম্বর বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, “মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।”

বৃন্দ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগরি এখানে খাটিবে না। ভালো-মানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, “ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।”

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতেন হইত না। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায়, পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

### ৬

ফকির দেখিল এমনি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বাসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন সাধুর উক্তি, কিসে মর্দুতি  
সেই সদৃশ করি গ্রহণ।

বলা বাহুল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের একঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল— তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুঁফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল— প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফরমাশ করিতে লাগিল আধুনিক বড়ো বড়ো নতন পিণ্ডতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার, নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পপার্শ্ব গুণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেসরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলায় আয়োজন করিল; পিড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অশ্রুভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ

হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিন্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কণ্ঠগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন ম্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকবহু অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঞ্জাপ্রিয়তার সঙ্গো প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্বেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্ব পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন; আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিচয় পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুরক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেবারেঁষ ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মৃখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জ্বিতবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুস্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না; তাহাদিগকে তিনি কীটপতঙ্গের ন্যায় দেখে হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঞ্জপালে আচ্ছন্ন হইয়া বহুইস অক্ষরের ছোটোবড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছুর তাহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভাজনোচিত ব্যবহার করিত না; শৃঙ্খলিত ফকিরের চক্ষু অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মৃখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

৭

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেঁচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাকই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, "জানেন আপনার দুই স্ত্রী?"

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহ-যোগ্য।

ফকির। আজে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন, দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন, তবে আপনার অনাধীন দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলাম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপদরূষাদিগের মানমর্যাদা-গাম্ভীৰ্যকে খাতির করে না, প্রকাশ্যে অপমান করে, এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্ত-লোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল— উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শূন্য ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজ্ঞান গালি দিল, এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মূখে আর কথা রহিল না।

ইহাব উপর যখন আটজন বালকবালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহা তাহার সহস্র অকাটা প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমনকি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বৃদ্ধিকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মৃগ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশবাস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোন চুলোয়, যমের কোন দুর্যোগে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।”

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সন্তরাং নিরন্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে ষেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ স্মারক প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা স্মারক পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাতির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, “এ যে হৈমবতী!”

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মর্দা দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতোছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বদ্বিতে পারিল, উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরভ্রম হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।” দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, “এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।”

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ব ও বীরবে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।



## ত্যাগ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আশ্রমদুকের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পদুর্কারীগীতীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাঁপয়ার গান মৃদুস্বরের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছ, চঞ্চলভাবে কখনো তার স্ত্রীর একগদ্য চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখনো তাহার বালিতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মূখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এ পাশ হইতে একবার ও পাশ হইতে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু, কুসুম সন্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামী'র চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিবিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছ, অধীরভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল, “কুসুম, তুমি আছ কোথায়। তোমাকে যেন একটা মন্ত দূরবীন কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে, এমনি দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এসো। দেখো দেখি, কেমন চমৎকার রাত্রি।”

কুসুম শূন্য হইতে মৃদু ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মূখের দিকে রাখিয়া কহিল, “এই জ্যোৎস্নারাত্রি, এই বসন্তকাল, সমস্ত এই মৃদুহৃৎ মিথ্যা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।”

হেমন্ত বলিল, “যদি জান তো সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোনো মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে বনিবাব আসে কিনা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত টিকিয়া যায় তো তাহা শুনিতে রাজি আছি।” বলিয়া কুসুমকে আর-একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল, “আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও-না কেন, আমি বহন করিতে পারিব।”

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লেথক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটিজ্ঞতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মৃদুস্বরের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে কহিল, “হেমন্ত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।”

হেমন্ত স্ত্রীর মূখের দিকে চাহিল; স্ত্রী কিছ,ই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল

মুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাঁপয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারও কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর, অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য কি।”

স্ত্রী কর্হিল, “সত্য।”

“এতদিন বল নাই কেন।”

“অনেকবার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাঁপষ্টা।”

“তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলো।”

কুসুম গম্ভীর দৃঢ় স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল—যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দংশ হইতৌছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল, মনের মধ্যে এমন একটা শূন্য অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল, পৃথিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমনকি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কাঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আন্দর, এত গাঢ়তা—যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মূহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ কেমন একটু আঘাত করিল অর্থাৎ অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল! হেমন্ত কম্পিতম্বরে এই কিছু পূর্বে কানের কাছে বলিতৌছিল, “চমৎকার রাত্রি!” সে রাত্রি তো এখনো শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাঁপয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মর্শারি কাঁপাইয়া বাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখপ্রাপ্ত সুস্ত সুন্দরীর মতো বাতাসনবর্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা। ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী, মিথ্যাচারিণী।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশূন্য হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া প্যারিশংকর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশংকর জিজ্ঞাসা করিল, “কী হে বাপু, কী খবর।”

হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মতো যেন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে”—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “আর, তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো ষড়্, বড়ো ভালোবাসা!”

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মূহুর্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, “আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।”

প্যারিশংকর কহিল, “আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। বাস্তব হইয়া না বাপ, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে।

“আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিম্বা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন, ‘মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘবে লইতে পারিবে না।’ আমি তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, ‘দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলোটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রার্থিস্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও।’ তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতৃপুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বৃদ্ধিতে পারিয়াছি—কিন্তু আর-একটু সবুদর করো—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুশি হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

“তুমি যখন কলেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুজের বাড়ি ছিল। বেচারি এখন মারা গিয়াছে। চাটুজের-মহাশয়ের বাড়িতে কুমুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড়ো সুন্দরী—বড়ো ব্রাহ্মণ কলেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দৃষ্টিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়োমানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মন্থ হইত না। পরস্পরের ছাত

হইতে তোমাদের কোনোরূপ কথাবার্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাব-গতিক দেখিয়া বৃড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সম্মুখবেলায় সে বৃড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না।

“অবশেষে বৃড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখাসাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমনকি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, ‘খুড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ—মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।’

“বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুজের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতোঁছি একটু-আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু, তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভালো হয়, কারণ গল্পের উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই।”

হেমন্ত পারিশংকরের এই শেষ কথাগুলিতে বড়ো-একটা কান না দিয়া কহিল, “কুসুম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?”

পারিশংকর কহিল, “আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান তো বাপু, মেয়েমানুষের মন—যখন ‘না’ বলে তখন ‘হাঁ’ বুদ্ধিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক নতুন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম, কোথা হইতে সম্মান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসায় সম্মুখে আসিয়া কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ, ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড়ো দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সংকটাপন্ন।

“একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম, ‘বাছা, আমি বৃড়ামানুষ, আমার কাজ লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার জো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, তোমাদের মিলন হয়।’ শুনিলামাত্র কুসুম একবারে বুক ফাটিয়া কাদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সম্মুখবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া, তোমার কথা পাড়িয়া, ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ বাতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া

মিলনের আর-কোনো উপায় নাই। কুসুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, 'তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব।' অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে খেঁপিয়া ষাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যিক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিত্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষত, এ কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অসুখী করা।

"কুসুম বদ্বিল কি বদ্বিল না, আমি বদ্বিতে পারিলাম না। কখনো কাঁদে, কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি 'তবে কাজ নাই' তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম, সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাড়াইল, তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে; বলে, 'ইহাতে কাজ নাই, জাঠামশায়।' আমি বলিলাম, 'কী সর্বনাশ। সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব।' কুসুম বলে, 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে— আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও।' আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব।' আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বৃদ্ধাবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল— আমি আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিল, "আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।"

প্যারিশংকর কহিলেন, "দেখিলাম, তোমার ছোটো ভগ্নির বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি, কিন্তু সে কেবল কর্তব্যবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য সম্বরণ করিয়া কহিল, "এই-যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?"

প্যারিশংকর কহিলেন, "আমার বাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।— ওরে, হেমন্তবাবুর জন্য বরফ দিয়া একপ্লাস ডাবের জল লইয়া আর, আর পান আনিস।"

হেমন্ত এই সদৃশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকতেছে না। পদ্মকারণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর দাগের মতো লোপিতা গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর, আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী-একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সমুদ্রের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মূখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারি দিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচরক এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চাঁটজুতার শব্দ হইল। হরিহর মূখস্থে ম্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, “অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ধর হইতে দূর করিয়া দাও।”

কুসুম এই স্বর শুনিলামাত্র একবার মূহূর্তের মতো চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা স্পিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল, চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, “আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।”

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, “জাত খোয়াইবি?”

হেমন্ত কহিল, “আমি জাত মানি না।”

“তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা।”

## একরাত্রি

সুন্দরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুন্দরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, “আহা, দুটিতে বেশ মানায়।”

ছোটো ছিলাম, কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বদ্বিতে পারিতাম। সুন্দরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বশ্বমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমতে মস্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুন্দরবালা আমারই প্রভু স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেসতার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু, আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টর সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যাচ ছিল—কালেক্টরের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে-মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা-তরকারিটা টাকাটা-সিকিটা লইয়া যে তাহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল; এইজন্য আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগুলাকে পর্বন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজা দেবতা; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নতুন সংস্করণ। বৈশ্বিক সিংহলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিংহদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর চের বেশি; সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা-কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের দাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া ষথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশ্চর্য্য আবশ্যিক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, কী করিয়া উক্ত দঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু, তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো চুটি ছিল না। আমরা পাড়াগোঁয়ে ছেলে,

কালিকাতার ই'চড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই; সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কৰ্তৃপক্ষীয়েরা বহুতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দু'পুত্র-রোদ্রে টো-টো করিয়া বাঁড়ি বাঁড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বোঁগি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদেরকে বাঙালি বলিত।

নাঞ্জির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কালিকাতার পলাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, এ দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব--বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি, ফাস্ট্ আর্ট্‌স্ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই; মাতা এবং দু'টি ভগিনী আছেন। সুতরাং কলেজ ছাড়িয়া কালেক্টর সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টার নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স্ স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভাবতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া চের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার আল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেড্‌মাস্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজ-মলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণু-ভাবে প্রাত্যহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সম্ভাব্যে সময় এক-পেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লক্ষ্য কম্পে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মান'ব, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বাড়ি আটচালার সংলগ্ন একটি চান্দার আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে একটি নড়া পুষ্করিণীর ধারে। চারি দিকে সুপারি নারিকেল এবং মানারের গাছ, এবং স্কুলঘরের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড



বৃন্দ নিম্ন গাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী— আমার বাল্যসখী সুরবালা— ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনো কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্লিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শব্দের দ্বন্দ্ব করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কোতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মৃষ্টিব দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্টন্ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বৃকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছুর নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দুয়েক মৃৎস্থ মন্ত পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক মূহুর্তে ছেঁ মারিয়া লইয়া গেল!

আমি মানবসমাজে নতুন নীতি প্রচার করিতে বাসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহীভক্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুরেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলার ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুনগুন করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত কাঁ-কাঁ করিত, ঝঞ্ঝ উত্তম্বত বাতাসে নিম্ন গাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত—কী ইচ্ছা করিত জানি না—এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশুপদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

শুকের ছুটি হইয়া গেলে আমার বহুৎ ঘরে এবেলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোনো ভুলোকে দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলার পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল চক্রের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

প্রোথার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বড়বয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত; তুমি কিনা হইতে গেলে গার্দিনাল্ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগোঁয়ে ইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। আব, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্ব-মূহুর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও যেমন, সেই কিনা কিছুর মাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল হইয়া নিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে যেদিন দুখে ধৌওয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে হিবস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জনা গহনা গড়াইতে দেখে। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই; পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তাবার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাত্তাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মোকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুল-

ঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেই-রূপ একা ছিল।

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাব-গতিক দেখিয়া হেড্‌মাস্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খন্ড খন্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। ষত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতোছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পদুস্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পদুস্করিণীর পাড়—সে পর্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন স্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের পদুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাগা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বৃষ্টিতে পরিণত। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে, কেবল হাত-পাঁচ-ছয় ম্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন-এক জন্মান্তর, কোন-এক পুরাতন রহস্যান্বকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্ব আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর, আজ কত দিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্বকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্ব আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া

ফেলিয়াছিল, মৃত্যুমোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে— এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃত্তটুকু হইতে, খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুদূরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আশ্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল— ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল— সুদূরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্টাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল— আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

## একটা আঘাতে গল্প

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি টেকা এবং গোলামের বাস। দূর তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যন্ত আরও অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে, কিন্তু তাহারা উচ্ছ্রাতীয় নহে।

টেকা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ; নহলা-দহলারা অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু, চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্ষাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জ্ঞো নাই। সকলেই ষথানির্দিষ্ট-মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়—বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মধ্যে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিবকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল-ফ্যাল ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না, সকলেই মৌন নিজীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মূখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারও কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নতুন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, স্বেধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি ঝট্-পট্ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুণির অন্তরে সেরূপ কোনো-একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এক কালে এই খাঁচাগুণির মধ্যে জীবের বসতি ছিল। তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুন্য যাইত, গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত। এখন কেবল পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সূক্ষ্মশ্রী শ্রেণী বিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখি উড়িয়াছে কি মরিমাছে কি জীবন্ত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।

আশ্চর্য স্তম্ভতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলই সুসংযত, সুবিহিত—শব্দ নাই, সন্দেহ নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশব্দ কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্দিগন্তেব শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতি-দূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগশ্বেষের স্বেদ-কোলাহল-সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে, সেই বিদেশে, এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন-মনে বালাকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে-মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিজ্ঞাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনার বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার স্কারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ওই দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মানিক, পারিজাত পদ্ম, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি পাওয়া যায়—কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে শ্বশ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে ভাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে—গৃহস্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, “মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বলো।” মা অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহার বালাশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন, বৃষ্টির কল্কল শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিতা রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, “সাতোত পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি; এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।”

রাজ্যের পুত্র কহিল, “আমিও তোমার সাঙ্গ হইব।”

কোটালের পুত্র কহিল, “আমাকে কি এক ফেলিয়া যাইবে। আমিও তোমাদের সাঙ্গী।”

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া কহিল, “মা আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।”

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের স্বাম্ভাতরী প্রস্তুত ছিল, তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল, নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খস্বীপে গিয়া এক-নৌকা শঙ্খ, চন্দনস্বীপে গিয়া এক-নৌকা চন্দন, প্রবাল-স্বীপে গিয়া এক-নৌকা প্রবাল নোকাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জারফলে যখন আর-চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল তখন সহসা একটা বিপর্যয় কড় আসিল।

সব-কটা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা স্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্‌খান্‌ হইয়া গেল।

এই স্বীপে তাসের টেকা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগুলাও তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

8

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তর্ক উঠিল— এই-যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে।

প্রথমত, ইহারা কোন্ জাতি— টেকা, সাহেব, গোলাম, না দহলা-নহলা?

স্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোত্র— ইস্কাবন, চিড়েতন, হরুতন, অথবা রুহিতন?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোরূপ ব্যবহার করাই কঠিন।

ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে— ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈঋতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে, তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এত বড়ো বিষম দর্শিচন্টার কারণ ইতিপূর্বে আর-কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ-সকল গুরুতব বিষয়ে তিনমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান ঋজিবার জন্য টেকারা দিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দূরির তিরি পর্যন্ত অবাক। তিরি কহিল, “ভাই দূরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই।”

দূরি কহিল, “ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচ-জাতীয়।”

আহারাদি করিয়া ঠান্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখনকার মানুসগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের তিরি শরীয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুর্লিয়া দুর্লিয়া বেড়াইতেছে। যাহা-কিছু করিতেছে তাহা যেন আর-একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুংলাবাজির দোদলামান পুতুলগুণির মতো। তাই কাহারও মূখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অগচ সবসুন্দর ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবন্ত নিজীবতার পরমগম্ভীর রকম-সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মূখ তুলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কোতুকব উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলেই এমনি একান্ত যথাস্থ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি সুগম্ভীর যে, কোতুক আপনার অকস্মাৎ-উচ্ছ্বাসিত উচ্ছ্বল শব্দ আপনি চাকিত হইয়া, স্তান হইয়া,

নির্বাচিত হইয়া গেল—চার দিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাশ্রয় স্বয়ংক্রিয় গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল, “ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর এক দণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আঁছ কি না।”

রাজপুত্র কহিল, “না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মতো দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক-ফোটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।”

৫

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মূখ ফেরানো, উপড় হওয়া, চিং হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্বাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না; বরং সকোতুকে নিবীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমস্ত যথার্থবাহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে-একটি সিগ্গজ গম্ভীর আছে ইহারা তন্মারা অভিবৃত্ত হয় না।

একদিন টেকা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া আঁচলিত গম্ভীরমূখে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা বিধানমতে চাঁগতেছ না কেন।”

তিন বন্ধু উত্তর করিল, “আমাদের ইচ্ছা।”

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বনাভিবৃত্তের মতো কহিল, “ইচ্ছা।”

ইচ্ছা কী সেদিন বৃকিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃকিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চাঁগিয়া এমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এ দিক আছে তেমনি ও দিকও আছে—বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল, বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানায়ক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ওই সেটি যেমনি অনুভব করা এমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গর্তনিত্র প্রকাশিত অজগরসর্পের অনেকগুলো কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সংঘটন করিতে থাকে সেইরূপ।

নির্বিহারমূর্তি দিবি এতদিন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, নির্বাক, নিরুদ্গিশনভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চাঁকতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষা উর্ধ্ব উর্ধ্ব করিয়া রাজপুত্রের দিকে মূখ নেত্রের কটাকপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “এ কী সর্বনাশ। আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা মূর্তিবৎ—তাহা তো নহে,



দেখতেছি এ যে নারী!”

কোর্টালের পদ্র ও সদাগরের পদ্রকে নিভতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, “ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধুর্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল, যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈর্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।”

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, “সত্য নাকি, সাঙাত।”

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মদুমদুম তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্ব শ্রেণীবন্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাৎ রাজপদ্রের পার্শ্ব আসিয়া দাঁড়ায়; গোলাম অবিচলিত ভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, “বিবি, তোমার ভুল হইল।” শূন্য হরতনের বিবির শ্বভাবত-রক্ত কপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপদ্র উত্তর দেয়, “কিছু ভুল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।”

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী অভাবনীয় লাবণ্য বিস্মুরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব-অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশষ মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্সা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগুলা পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই পুরাতন স্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মাহিমা এক সুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে—আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দূরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্সা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারও বা রাতে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারও ঈর্ষা, কাহারও অনুরাগ, কাহারও ব্যাকুলতা, কাহারও সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেকা ভাবিতেছে, 'সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চাল-চলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।'

সাহেব ভাবিতেছে, 'টেকা সর্বদা ভারি টক্‌টক্‌ করিয়া ঘাড় বাকাইয়া বেড়াইতেছে; মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগদুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল।' বলিয়া ঈষৎ বক্ক হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগদুলা বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আ মরিয়া যাই। গর্বির্গীর এত সাজের ধুম কিসের জন্য গো, বাপদ। উহার রকম-সকম দেখিয়া লজ্জা করে!' বলিয়া ম্বিগদুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দূই সখায়, কোথাও দূই সখীতে গলা ধরিয়া নিভূতে বসিয়া গোপন কথাবার্তা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো ধান-অস্তিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

যুবকগদুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া, শব্দকপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া, অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুন্দরীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন-মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়—যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খাপা যুবক দুঃসাহসে ভব করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মূহূর্তের মতো ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখি ডাকিতে থাকে, বাতাস অশ্লল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝরঝর্ মরমর্ করে এবং সমুদ্রের অবিগ্রাম উচ্ছ্বাসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে ম্বিগদুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন, জোয়ার-ভাটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা ধম্‌ধম্‌ করিতেছে—কথা নাই, কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে; কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে, এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাঁশি আনো, তুরীভেরী বাজাও, সকলে

আনন্দধ্বনি করো, হর্তনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।”

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দূরির তিরি তুরীভেরী লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি, চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, লতায় বৃক্ষে, নানা ভাঙিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধুর স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হর্তনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতোছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মর্দিত হইয়া আসিয়াছিল; হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মূখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুপ্ত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সমস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলঙ্ক লুপ্তন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রি শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার সঙ্গন্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবন্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নর্তনশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মূখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মালা স্থলিত হইয়া তাহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারানী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মান্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মতো সেই অবিচ্ছিন্ন

শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাম্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগশ্বেষ বিপদসম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন, কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধান-মতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

আষাঢ় ১২৯৯

## জীবিত ও মৃত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধুটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পিতৃকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলোট, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরও যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি—কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল-অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে ম্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলোটের প্রতি সিঞ্জন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পদলিসের উপদ্রব ঘটে, এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহু দূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বহু মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিত্রাব কাঠ আঙ্গুর প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে, অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত দিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। প্রথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেঁচাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সজে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, “ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই।”

অন্য ব্যক্তি কহিল, “আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।”

বনমালীর পলারনের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, “মাঠারি! আর, আমি বুঝি

এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে-মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পদক্ষরিতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শব্দা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, যেন খাটটা ঝেং নড়িল, যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শব্দ হইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শব্দা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মূহুর্তে ঘর হইতে লক্ষ্য দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল, গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে--অনর্থাবলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ আশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কঠিন্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটির গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শব্দা খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শব্দা গেল লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদন-বস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। শ্মশান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা উমিয়াছিল, তাহাতে শ্রীলোকের সন্দা এবং ক্রূত পদাচিহ্ন।

শাবদাশংকর সহজ লোক নাইন, তাহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ সে কোনো শব্দকল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

স্তরের নিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল তাহারা সংবাদ পাইল বিলম্ব দেখিয়া প তাই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য কাপ্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্বার মৃতদেহ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদামিনীও মরে নাই—হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস-মত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল

'দিদি'—অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বন্ধের কাছে একটি বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসদৃশ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্ব-গ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মূহুর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সন্নিবিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কার্কিয়া বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেরটুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না, বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বৃষ্টি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শূন্য নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মৃত্ত্বা স্ফার দিয়া হঠাৎ একটা ঠান্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মূহুর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সূদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পূণ্য তীর্থ উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল, সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখন ভাবিল, 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অসুখ হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাঙ্গা।'

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাতে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অন্তর্ভুক্তিগত শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মূহুর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহু-দূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, 'আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী; আমি আমার প্রেতাঙ্গা।'

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অদ্ভুতপূর্ব নতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা-ভয়-ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধানক্ষেত্র, কোথাও বা এক-হাট্টা জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ের বাশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শূনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নতুন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে; মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাগিতজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদাম্বিনীর যে রূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে চেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পৃথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, “মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধু বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।”

কাদাম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধুর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পৃথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অসম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পৃথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, “চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌছাইয়া দিই—গ্রামের বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।”

কাদাম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদাম্বিনী জানাইতে চাহে, ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল; যোগমায়া জানাইতে চাহে, কাদাম্বিনী গ্রামের ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক দৃষ্ট কহে কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদাম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, “নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।”

পৃথিক কালিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদাম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে



বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিষ্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, “ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু, ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!”

কাদম্বিনী চূপ করিয়া রহিল; অবশেষে কহিল, “ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।”

যোগমায়া কহিল, “ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সহী, তুমি আমার”— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মূখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সহীয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য বাস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে-মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সহীয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সহীয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না— মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মূখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে, ‘স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহু দূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।’

যোগমায়াও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। মৃত্যুলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য মৃত্যুলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক বাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গাড়িয়া তোলে— যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়, বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন ম্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চাঁৎকার করিয়া উঠিত, এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌ছম্ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল।

চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন বেখানে-সেখানে ছুত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদাম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহস্থারে আসিয়া কহিল, “দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিলো না।”

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমন রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তন্দ্রাভেদেই কাদাম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠান্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, “হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেয়েমানুষ আপন স্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপিস্তমাত্র শুনি না। তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।”

বাস্তবিক, সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সজনা স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায় অথচ সুন্দরী কাদাম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রায় চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিবৃদ্ধি তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও, তাহার বাদস্তারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, নিশ্চয়ই স্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদাম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি। এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদাম্বিনীকেও এই অপপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাহার স্ত্রী তাহার অসাড় কর্তব্যবস্থিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদাম্বিনীর স্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এ দিকে যোগমায়া আসিয়া কাদাম্বিনীকে কহিল, “সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।”

কাদাম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।”

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, “তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধুকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।”

কাদাম্বিনী কহিল, “আমার স্বশুরঘর কোথায়।”

যোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ! পোড়াকপালি বলে কী।'

কাদাম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বৃষ্টিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বৃষ্টিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু, ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গাড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।"

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগুলো বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বৃষ্টিতে পারিল, কিন্তু আসল কথাটা বৃষ্টি না, জ্বালাও দিতে পারিল না। ম্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মৃদুস্বপ্নে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহা করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেক ক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যা প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শুনিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনবামাত্র যোগমায়া মনে-মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েবা কখনোই করে না; যদি-বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুবুদ্ধি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে কহিলেন, "কিরকম শুনিলে।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছে সে তোমার সই কাদাম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্ত্রীর মূখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার শ্রী।"

শ্রীপতি বৃদ্ধাইলেন, এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদাম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, "ওই শোনো। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ।"

কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।”

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয় পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি শ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কার্দাম্বিনীকে এই দশেই গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না— কারণ, শ্রীপতির বিশ্বাস তাহার অর্থাধি ছন্দপরিচয়ে তাহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্রাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কার্দাম্বিনী শুনিয়া আছে।

একজন বলেন, “ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।”

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, “সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।”

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, কার্দাম্বিনী কবে মরিল বলা দেখি।”

তাৎক্ষণিক কার্দাম্বিনীর কোনো একটা চিঠির তারিখের সাহিত অনেক বাহির করিয়া শ্রীপতির দ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সম্ভাব্যে কার্দাম্বিনী তাহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিকামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম দোষ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বান্ধাব বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কার্দাম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কার্দাম্বিনী কহিল, “সই, আমি তোমার সেই কার্দাম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।”

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: শ্রীপতির বাক্যস্বর্ভিত হইল না।

“কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই— ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।” তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে স্তম্ভ বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।”

এই বলিয়া মর্ছিত দম্পত্যকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কার্দাম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না। এমন সময় সৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শাবদাশংকরের স্ত্রী তাহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রমাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলেব চক্ষু এতাইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি অসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষু দেখিয়া ঘাইবার ইচ্ছা। তাহার পদ কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল, রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তুষার হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বসাই হইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পদ মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভাব দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিবিয়া অধিনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" "আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনও ভুলিস নাই!" তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া, খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাত্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শয়ন করিয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?"

কাকিমা কহিল, "হাঁ, খোকা।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাদিল— ঝি এক-বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিয়া ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি

একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মৃদু দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, “কাঁকমা, তুই যা।”

কাদাম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরম্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত-ভাবেই আছে, মধো কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সেইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বালাকালের সে সেই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া বৃষ্টিতে পারিল, খোকার কাঁকমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কাঁহল, “দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেরনি আছি।”

গির্মা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভূমির কাণ্ডে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরদাব্দ স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি জোড়হস্তে কাদাম্বিনীকে কহিলেন, “ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শূকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যাধি আর ছাড় না, নিন্দ্রাত কেবল ‘কাঁকমা’ ‘কাঁকমা’ করে। যখন সংসার হইতে বিনায় লইয়াছ তখন এ মারাবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সংকার করিব।”

তখন কাদাম্বিনী আর সহিতে পারিল না; তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বৃদ্ধাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।”

বলিয়া কাসার কাঁটটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে অঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, “এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।”

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন; খোকা ভয়ে দাবাকে ডাকিতে লাগিল; মৃদু মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদাম্বিনী “ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই—” বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধো গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শূন্যতে পাইলেন অপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিনাম নাই। কাদাম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

## স্বর্ণমৃগ

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বৃন্দ্বি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কথানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্धानে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনী একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃন্দ্বির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সন্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কথানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহু যত্নে ছাঁড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছাঁড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যিক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমন্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে, তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্ন-কাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গী এবং চাল-চলনের গৌরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ, একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বণ্ডনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভালো

লাগে না। সকলই অসুবিধা এবং মানহানি-জনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাত কুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামাচিকে-শাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসম্ভা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জ্বল আসে। এ-সকল অভ্যুত্তির প্রতিবাদ করা পদ্রুপের ন্যায় কাপদ্রুপজাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া স্বর্ণমৃগ মনোযোগের সহিত ছাঁড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্প-কার্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতে। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্য দিকে চাহিয়া বলিতেন, “গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও।”

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন, “দুধটা— বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।”

গৃহিণী উত্তর করিতেন, “আমানি।”

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত— গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, “আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো।”

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কী করিতে হইবে।”

স্ত্রী বলিতেন, “এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।” বলিয়া এমন একটা ফর্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসুয়যন্ত্র সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন, “এত কি আবশ্যক আছে”— উত্তর শুনিতেন, “তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।”

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বৃদ্ধিতে পারিলেন, ছাঁড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা-কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, “হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট্ ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।”

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, তাহার স্ত্রী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ‘বিধবাবিবাহ করিব’ বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাহার স্ত্রীর বিধবা-বিবাহ হইতে পারে না তাহার সদন্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সম্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মূহুর্তেই



বিদ্যুত্তের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বৰ্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতে পাইলেন। সম্রাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহাৰ্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর জানিতে পারিলেন, সম্রাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হৃদয়বর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনা মণ্ডিত করিয়া মনে-মনে বিন্দ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সম্রাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছাড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধ দ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কতী গৃহিণী কাহারও চক্ষুপ নাই। নিস্তত্বেভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়েব চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্র নেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্যাস্তপথের মতো ছলন্ত সূবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সম্রাসী আশ্বাস দিল, “কাল সোনার রঙ ধরবে।”

সেদিন রাতে আর কাহারও ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সূবর্ণপূবী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পবিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাতে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সম্রাসীর দেখা নাই। চারি দিক হইতে সোনার রঙ ঘটিয়া গিয়া সূর্যকিরণ পর্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন, “বৃষ্টির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাকো।” বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে, যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মহত্বের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্বক সাতিশয় চতুরতার সাহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “কী আনিয়াছি বলো দেখি।”

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, “কেমন করিয়া বলিব,

আমি তো আর 'জ্ঞান' নহি।”

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দাঁড়ির গাঠি অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের খুলা কাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট্‌ স্টুডিয়ার রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিস্ময়াবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি ভেলের ছবি মনে পড়িল; অপরিপাক্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, “আ মরে যাই! এ তোমার বৈঠকখানার রাখিয়া, বাসিয়া বাসিয়া নিরীক্ষণ করো গে। এ আমার কাজ নাই।” বিমর্ষ বৈদ্যনাথ কহিলেন, অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন জোগাইবার দূরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এ দিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সখবাবস্থায় মরিবেন; কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত বাগ্ন ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাহার কৌতূহল-নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাহার সন্তানভাগ্য ভালো, পুত্রকন্যার তাহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অন্যেবে একজন গনিয়া বলিল, বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পার্জিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণকর তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন-উপার্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যাবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু, দৈবধন-উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনো দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্‌ পুকুরে ডুবুরি নামাইবেন, কাড়ির কোন্‌ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুত্রব্রহ্মানন্দের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে, তাহা তাহার পূর্বে ধারণা ছিল না। বলিলেন, “একটু নাড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বাসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।”

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্‌ দিকে নাড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব, দাওয়ার বাসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছাড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এ দিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। বড়িতে

মানকচু, কুমড়া, শঙ্ক নারিকেল; টিনের বাস্কের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা, ছাতা, কাপড়; এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স, সাবান, নতুন গম্পের বাঁহ এবং সুবাসিত নারিকেলতৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; পকপ্রায় ধান্যক্ষেত্র ধর্ধর্ করিয়া কাঁপিতেছে; বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্‌সির্‌ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া, কাঁধে একটি প্যাকানো চাদর ঝুলাইয়া, ছাতি মাথায়, প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মূখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সাঁহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, 'বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।'

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে অবু, এবার পূজোর সময় কী চাস বল দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।"

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে নূন হওয়া কিছু নয়; কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো, বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর-কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এ দিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক ঝুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায় উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বৃষ্টি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্মিণী সেই সম্বন্ধ পাইয়া তাঁহার সঙ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে, সেখানে গুস্ত-ধন মিলিবার কথা; সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কী সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে 'অশিক্ষিত পটু' আছে। মোক্ষদা মূখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লক্ষ্যের ধোঁয়া দিতে পারিতেন;

কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন-দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলো কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া, কুঁদিয়া, জোড়া দিয়া, দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন, লাল শালদর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন; একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিন্তা-চাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব, বৈদ্যনাথ সন্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকাদুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাযথানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমাধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কার্দিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনাদুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সার্জিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আনিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ!

ছোটো ছেলে তো উদ্‌ব্রাসে কার্দিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মূখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু, টাকা কোথায়। তাহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া, চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কার্দিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়স্বশুরের মজেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিস্তি ঘোঁত করিয়া নদীপ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিররের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মূড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু, কিছতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা বন্বন্ব শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ বন্দু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ডান্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল, এবং সেইসঙ্গে দুর্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিত হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এ ঘরে গেলে মনে হয়, শব্দ ও ঘর হইতে আসিতেছে; ও ঘরে গেলে মনে হয়, এ ঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এ-ঘর ও-ঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নির্দ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে, পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নিৰ্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পৃথক স্তম্ভভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এ দিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাহার সন্তোষহীন মূখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিশ্ট চকিত নেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মেঝের শাবল চুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্তী ছোটো কুঠারির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিশ্চুপ হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায় তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন, নীচে একটা ঘরের মতো আছে—কিন্তু সেই রাত্রির অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু, শব্দ এমন পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল যে, ভয় সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শূন্য। ভূতকে ঘরের মধ্যে চুকিতে না দিয়া বাহিরে আহাৰাদি করিলেন। আহাৰান্তে ঘরে চুকিয়া দ্বারে ঢাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গনাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শূন্য গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্তের কাছে আস্তে আস্তে মূখ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনর্গত-উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক-হাট্‌র অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মূহুর্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশলাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বালিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাধা

রাহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হর এবং শিকলি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্ছপ্ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন, কলসীর গলা ভাঙা। যেন এক কালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাংড়াইতে লাগিলেন। কদম্বস্তরের মধ্যে হাতে কী-একটা ঠোকল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকক্ষালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ববর্তী ঘে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মস্ত একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরও অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাপেক্ষা ভাল কাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভূগর্ভের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চাড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্বিতন্দা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল, নদীর জীর্ণ পাড়ের মতো কপ্ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু, তবু সেই জিনিসপত্র বাধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চাড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মনে-মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালিয়ায়ত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্বপ্রথমে কি তাহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল—ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাহার সেই পূর্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুদ্ধমুখে স্নান হাস্য লইয়া, একটা ছেলেকে কোলে করিয়া, একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মতো নিস্তত্ব হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছ্ বালিলেন না, তার পর মৃদু স্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছ।”

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইল।”

বৈদ্যনাথ নিরন্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মূখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকান্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বালিল, “সেই নাপিতের গল্প বল্।” বালিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল, কিন্তু দুজনের মূখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী-একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বালিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড়ো ছেলটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, “বাবা।” তখন তাহার বাবা সেখানে নাই।

অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বকণ্ঠে রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, “বাবা।” কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তাম্বাক সাজিয়া তাহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তদের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

## রীতিমত নভেল

### প্রথম পরিচ্ছেদ

‘আল্লা হো আকবর’ শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে তিন লক্ষ যবনসেনা, অন্য দিকে তিন সহস্র আৰ্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বখব্দের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবস্বর্ষ চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

‘হর হর বোম্ বোম্!’ পাঠক, বলিতে পার কে ওই দস্ত যুবা পর্যাটনজন মাত্র অনূচর লইয়া মৃত্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কর্নিকান্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমস্ত্রিত ‘হর হর বোম্ বোম্’ শব্দে তিন লক্ষ স্লেচ্ছকণ্ঠের ‘আল্লা হো আকবর’ ধ্বনি নিম্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেঘবৃথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মূহূর্তের মধ্যে উধর্শ্বাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার সেদিনকার আৰ্যস্থানের সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাণ্ডীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্বনিক্ত।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ কাণ্ডীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক, জান কি। হর্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কি বায়ুভরে না আনন্দভরে। স্বেদে স্বেদে কদলী-তরু ও মঙ্গলঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরদ্বকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হৃদধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অস্ত্র ভেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উন্মিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুবাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ওই-যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরস্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি। উনিই আমাদের সেই পূর্বপরিচিত ললিতসিংহ, কাণ্ডীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাণ্ডীরাজপদতলে শত্রুরক্তাক্ত ধ্বজা উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু, এত-যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কণপাত নাই; গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত-যে পদ্পব্ধি করিতেছেন, সে দিকে তাহার দৃকপাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শূন্য পদ্রুশি



তাহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি দ্রুক্ষেপ করেন। অধীরচিত্ত ললিত-সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শঙ্ক পত্রের ন্যায় নীরস লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল তখন মদুহর্তের জন্য সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন; অশ্ব মদুহর্তের জন্য স্তম্ভ হইল; মদুহর্তের জন্য ললিতসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; মদুহর্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মতো তাহার মূখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পদুমমালা খসিয়া তাহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উর্ধ্ব চাহিলেন। তখন স্ফার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্বাপিত।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্যকে পাষণদুর্গের মতো হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকলা সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য মদুহর্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে। কিন্তু, ছি ছি, সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখের মতো রাজ্যান্তঃপুরের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু, যে উপন্যাস লেখে তাহার কোথাও বাধা নাই; স্বাবীরাও স্ফাররোধ করে না, অস্বয়ম্পর্শ্যরূপা রমণীরাও আপ্যন্ত প্রকাশ করে না, অতএব এই সূর্য্য বসন্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণবায়ুর্বীজিত রাজ্যান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক। হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অনন্যতী হইতে পার—আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখো, বকুলতলের তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মতো ওই রমণী কে। হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উঁহাকে জান কি। অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখনো বর্ণনা করা যায়। ভাষা কি কখনো কোনো মন্তবলে এমন জীবন যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক তোমার যদি শ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মূখ স্মরণ করো: হে রূপসী পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঞ্জিনীকে বলিয়াছ 'ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক সুন্দরী, কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই' তাহার মূখ মনে করো—ওই তরুতলবার্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যামালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঙ্গুলি আপনার সূকুমার কার্ণে শৈথিল্য করিতেছে; উদাসীন দৃষ্টি কোন-এক অতিদূরবর্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু, হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজ এই নিস্তত্বে সন্ধ্যায় কোন্ মর্তদেবতার আরাতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ওই দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দুইফোটা অশ্রুজল দুটি সুকোমল কুসুমকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুম্ব শ্বরে বলিয়া উঠিল, “রাজকুমারী!”

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারি দিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে-মনে কাঁহলেন, ‘দেবী, তোমার নেত্রও যখন প্রভারণা করিতে পারে তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।’ একটি বৃহৎ দসাদলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণো বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইরূপ ঘটনায় কী করিত। নিশ্চয় যেখানে নির্বাসিত হইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেষ্টা দেখিত, কিম্বা একটা নতুন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই - সে অস্বাভাবে। কিন্তু, সেনাপতির মতো মহৎ লোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন এক নিশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে এবং মনোবাঙ্কা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, “রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বৃকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ দসাদ্যবসায় আরম্ভ করে। এইরূপ ইংরাজি কাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা বাজপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দসাদ্যে উপদ্রবে দেশের লোক চম্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু, এই অসামান্য দসাদ্যে অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্বলের আশ্রয়; কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্প্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোব অরণ্যে, সূর্য অস্তপ্রায়। কিন্তু, বনচ্ছায়ায় অকালরাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তবুও যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধাবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারি বন্ধ রাখিয়াছে, তাহারই ভার দঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, তথাপি এই আসন্ন রাতি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, “মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে। মাথায় মৃকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।”

দস্যুপতি কহিলেন, “তবে এ শিকার আমার। তোরা এখানেই থাক।”

পাখিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শব্দ পত্রের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা বৃকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিধিল, পান্থ ‘মা’ বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মূখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পাখিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল, “ললিত!”

মৃদুস্বরে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীৎকারশব্দ বাহির হইল, “রাজকুমারী!”

দস্যুরা আসিয়া দেখিল, শিকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বন্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে অরণের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জনা করিয়াছে।

জয়পরাজয়

রাজকন্যার নাম অপরাধিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোনো নতুন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন সে দিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পাড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সমুদ্র গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সংগীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাহার জীবনের একাট অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো নৃপদরশিঞ্জনের মতন শূন্যে বাইত; বসিয়া বসিয়া মনে-মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নৃপদর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাইতেছে। সেই দুইখানি রীতিমত শূন্য কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সৌভাগ্য কী অনুগ্রহ কী করুণার মতো করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণদুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পাড়িত এবং সেই নৃপদরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু, যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নৃপদর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার নৃপদর, এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে বাইত শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নিষ্ঠুর দেখিলে সে সকালে সম্মুখ শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল এমনও বোধ হইত না, যদি-বা আবশ্যক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আশ্রয়কূল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিও করিয়া তাহাকে বসন্ত-মঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, “আ সর্বনাশ!”

আবার কবির বসন্তবর্ণনার মধ্যে ‘মঞ্জুলবঞ্জলমঞ্জরী’ এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমনকি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাহার কবির এইরূপ রসার্থিকোর পরিচয় পাইয়া বড়োই আশ্রয় বোধ করিতেন— তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, “ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভার গান গায়।”

কবি উত্তর দিতেন, “না, পদ্মমঞ্জরীর মতও খাইয়া থাকে।”

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আশ্রয় করিত; বোধ করি অন্তঃপদ্রে রাজকন্যা

অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়— খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়। জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া— প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাঙ্গিনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যথার্থ অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাহার গান সকলেরই মধু। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাহার রচিত গান উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিত— তাহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত— এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ছায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা নুপুর শব্দা যাইত।

এমন সময়ে দক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শাদুলবিক্রমীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, “এহি এহি।”

কবি পুন্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন, “যদুম্ধং দেহি।”

রাজার মান রাখিতে হইবে, যদুম্ধ দিতে হইবে; কিন্তু, কাব্যযদুম্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুন্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সূতীক্ষ্ণ বক্র নাসা এবং দর্পোন্মিত উন্নত মস্তক দিগ্বিনিকে অশঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মধু সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিম্বন্দ্বী কবি পুন্ডরীককে নমস্কার করিলেন; পুন্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইপিগতমারে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনবতী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরে জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—বর্ষিতে

পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কোতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার বায়ুদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উর্ধ্বলোকে উৎক্লিষ্ট করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন; মনে-মনে কহিলেন, 'আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবী, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।'

তুরী ভেরি বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শূদ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভার প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পদ্মডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বহু সভা স্তম্ভ হইয়া গেল।

বন্ধ বিস্ফাবিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ উর্ধ্ব হেলাইয়া, বিরাটমূর্তি পদ্মডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ঘরে না—বহু সভাগৃহের চারি দিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরণের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বন্ধকবাট ধরু, ধরু করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাকরের কত দিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।

পদ্মডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন কিছুক্ষণের জন্য নিস্তম্ভ সভাগৃহ তাহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে 'সাধু সাধু' করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মূখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সঙ্করণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকবঞ্জনার্থে স্মিতীয়বার অগ্নি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল, 'আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। কিন্তু—' তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পদ্মডরীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারি দিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মতো দাঁড়াইল। তরুণ শুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মূখ, পান্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত ম্লপ—দেখিলে মনে হয়, ভাবের স্পর্শমাতেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মূখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধহয় কেহ ভালো করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মূখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজনভার পাষণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সন্নিষ্ঠ পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায়

উর্ধ্ব উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধবিগ্রহ, শৌর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদনুষ্ঠানের কথা দিয়া তাহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দুরস্মৃতিবন্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মূখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন— যেন দূর দূরান্তর হইতে শতসহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজাপিতামহদিগের এই অতিপুরাতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল— ইহার প্রত্যেক ইষ্টকে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, উর্ধ্ব অন্তঃপুরের বাতায়নসম্মুখে উখিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহান্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহা-মহোৎসবে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, “মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।” এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে-অভিষিক্ত প্রজাগণ ‘জয় জয়’ রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমন্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দন্ত গর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।” সকলে এক মূহুর্তে স্তম্ভ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সভ্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ, অতএব বাক্য তাহাদের অপেক্ষা বড়ো। ব্রহ্মা চারি মুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না; পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সূর্যালোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্বার বজ্রনির্দানে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।”

দর্পভরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোনো উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডিত্যগণ ‘সাধু সাধু’ ‘ধনা ধনা’ করিতে লাগিল; রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মতো সভা ভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন— বৃন্দাবনে প্রথম বর্ষিণ বার্জিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বার্জিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণপবনে বার্জিতেছে; একবার মনে হইল, উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের

জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল, যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশ বাঁজিয়া উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জ কুঞ্জ, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্ছে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র বাঁজিতে লাগিল—বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ৰ ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, বশ-অপবশ জয়পরাজয় উত্তরপ্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া, শেখর আপনার নিজের হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাইয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ময়ী মানসী মূর্তি, কেবল কানে বাঁজিতোছিল দুটি কমলচরণের নুপূরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বাচনীয় মাধুর্যে, একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতার সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল—কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুন্ডরীক সিংহাসনসম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, “রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।” বলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।” বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, রাধা প্রণব ঠিকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ, এবং বৃন্দাবন দুই ড্র মধাবতী বিন্দু। ইড়া, সূক্ষ্মনা, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরশ্মি, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। ‘রা’ অর্থেই বা কী, ‘ধা’ অর্থেই বা কী, কৃষ্ণ শব্দের ‘ক’ হইতে মূর্ধন্য ‘ণ’ পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি; একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়্‌দর্শন; তাহার পরে বুঝাইলেন, কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তরপ্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে, পাণ্ডিত্যদের দিকে এবং অবশেষে তাঁর হাস্য শেখরের দিকে চাহিয়া পুন্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুন্ডরীকের আশ্চর্য ক্রমতাব মূগ্ধ হইয়া গেলেন, পাণ্ডিত্যদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মূছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন; ইহার পরে তাহার আর গান গাইবার সামর্থ্য রহিল না। সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।



পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, শ্বব্যস্ত এবং শ্বিসমস্তক, বস্ত, ভার্য, সৌত্র, চক্র, পশ্ম, কাকপদ, আদ্যস্তর, মধ্যোস্তর, অন্তোস্তর, বাক্যোস্তর, শ্লোকোস্তর, বচনগদ্যস্ত, মাত্ৰাচ্যুতক, চ্যুতদন্তাক্ষর, অর্থগদ্য, স্তুতিনিন্দা, অপহৃত, শৃঙ্গাপত্রংগ, শাস্ত্রী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অশ্রুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শূনিয়া সভাসদৃশ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত। আজ তাহারা স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিল, তাহাতে কোনো গুণপনা নাই; যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস আনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নাহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে দুর্দহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না সর্বাধাও হয় না। কিন্তু, আজ যাহা শূনিল তাহা অশ্রুত ব্যাপার, কাল যাহা শূনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকর পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুঙ্খের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গদ্য আন্দোলন চলিতে থাকে, সর্বোবরের পশ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমন তাহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুদ্ধিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাহার কবির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, 'আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না, তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।'

শেখর শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেবল এই কণ্ঠ কথ্য বলিলেন, "বীণাপাণি, শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মন্ত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী তাহাদের কী গতি হইবে।" মৃদু স্বরে উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভূজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক সশব্দে হাস্য করিলেন, এবং শেখর-শব্দে শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, "পশ্মবনের সহিত খয়ের কী সম্পর্ক এবং সংগীতের বিস্তর চর্চা সত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফলভাভ করিয়াছে। আর, সর্বস্বতীর অধিষ্ঠান তো পুণ্ডরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে, এ দেশে তাহাকে খরবাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।"

পাণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাহাদের দেখাদেখি সভাসদৃশ সমস্ত লোক, যাহারা বুদ্ধিল এবং না-বুদ্ধিল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপর প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাহার কবিসখাকে বারবার অশ্রুশের ন্যায় তাঁক দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে-মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মস্তুর মালা খুলিয়া পুন্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এক কালে অনেকগর্দাল বলয় কঙ্কণ নুপুরের শব্দ শূন্য গেল—তাহাই শূন্য শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বাহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ব-বন্ধুর ন্যায় মস্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমণ্ড হইতে শেখর আপনার পুঁথিগর্দাল পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাহিয়া বাহিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগর্দাল পৃথক করিয়া রাখিলেন। অনেক দিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগর্দাল রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগর্দাল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাহার কাছে ইহা সমস্তই অর্কিণ্ডকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়। কতকগুলো কথা এবং ছন্দ এবং মিল!" ইহার মধ্যে যে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধ্বনি, তাহার হৃদয়ের কোনো গভীর আত্মপ্রকাশ নিবন্ধ হইয়া আছে—আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোনো খাদ্যই রুচে না তেমনি আজ তাহার হাতের কাছে যাহা-কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রি সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড়ো বড়ো বাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ।" কিন্তু, তখন মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। "অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখন অশ্বমেধ হয়—আমার কবিষ যোদিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বাসিয়াছি—আরও বহুদিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।"

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগর্দালই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতোছিলে, হে মোহিনী বহির্রূপণী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ ভূমি, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি “যে যে ফুল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি সাদা ফুল—জুই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মৃঠা মৃঠা লইয়া নির্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারি দিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটা উন্ডিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মৃদ্রিত হইয়া আসিল।

নন্দুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিম্নীলিতনেত্রে কহিলেন, “দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এত দিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।”

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, “কবি, আসিয়াছি।”

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুল নেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাহার হৃদয়ের সেই ছারাময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, “আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।”

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, “রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।”

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পদুমমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

## কাবুলিওয়াল

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মূহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরওয়ান কাককে কোয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?”

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে মিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। “দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শৃঙ্গ দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।”

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, “বাবা, মা তোমার কে হয়।”

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, “মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্ গে যা। আমার এখন কাজ আছে।”

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্ব আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাপ্তনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়াল, ও কাবুলিওয়াল।”

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগাড়ি মাথায়, কুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাস, এক লম্বা কাবুলিওয়াল মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্ব-শ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই কুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়াল আসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ওই কুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—  
আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন  
তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছ্‌ না কেনাটা ভালো  
হয় না।

কিছ্‌ কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস,  
ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমার লড়কী কোথায়  
গেল।”

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে  
ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেষিয়া কাবুলির মূখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ  
নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি  
বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছ্‌তেই লইল না, ম্বিগুণ সন্দেহের সহিত  
আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছ্‌দিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যিকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার  
সময় দেখি, আমার দুহিতাটি ম্বারের সমীপস্থ বৌগুর উপর বসিয়া অনর্গল কথা  
কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমূখে শুনিতেছে  
এবং মধ্য মধ্য প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।  
মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতার বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো  
পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি  
কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, “উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।”  
বলিয়া পকেট হইতে একটা আধূলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধূলি  
গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পড়িল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধূলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ  
বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভৎসনার স্বরে মিনিকে  
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুই এ আধূলি কোথায় পেলি।”

মিনি বলিতেছে, “কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।”

তাহার মা বলিতেছেন, “কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধূলি তুই কেন নিতে  
গেলি।”

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।”

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া  
গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা  
নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেশ্তাবাদাম ঘৃষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র মূখ  
হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গৃঢ়তক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—  
যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলি-  
ওয়ালো, ও কাবুলিওয়ালো, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত,  
“হাঁত।”

অর্থাৎ, তাহার কাবুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের  
সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উত্তরেই  
বেশ একটু কৌতুক অন্তর্ভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একাট বয়স্ক এবং  
একাট অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, “খোঁশী,  
তোমি সসুরবাড়ি কখনে যাবে না!”

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল ‘শ্বশুরবাড়ি’ শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু  
আমরা কিছ্ একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সম্ভান  
করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত  
না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার  
স্বভাবাবিরুদ্ধ—সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মৃষ্টি আশ্ফালন করিয়া বলিত,  
“হামি সসুরকে মারবে।”

শূন্য মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা  
করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শূন্য শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন।  
আমি কালিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা  
পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের  
পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শূন্যলেই অর্থাৎ  
আমার চিন্তা ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অর্থাৎ নদী-পর্বত-অরণ্যের  
মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার  
কথা কল্পনার জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উন্মত্তপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার  
বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে  
টোঁবলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের  
কাজ হইত। দুই ধারে বৃন্দর দুর্গম দৃশ্য রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ  
মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগাড়-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-  
বা উটের পুরে, কেহ-বা পদব্রজে, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে  
চকমকি-ঠোকা বন্দুক—কাবুলি মেঘমন্ডলে ভাঙা বাংলার স্বদেশের গল্প করিত  
আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শূন্যলেই তাহার  
মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া  
আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বদাই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া  
শূয়াপোকা আরসোলা এবং গোরুর ম্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে)  
পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গাটিকতক প্রশ্ন করিলেন, “কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকান্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।”

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু, তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাণ্ডনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না সে দিন দেখি, সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই টিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাকাবুলিওয়ালার লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি ‘কাবুলিওয়ালার ও কাবুলিওয়ালার’ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

এক দিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রফুর্শাট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুইদিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরণ প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শূনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালার বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্র রক্তাচ্ছ এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে ‘কাবুলিওয়ালার ও কাবুলিওয়ালার’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মদুখ মদুহর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্বেচ্ছা আজ ঝড়াল ছিল না, সুতরাং ঝড়াল সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শব্দরবাড়ি যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, “সস্দুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব—হাত বাঁধা।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্ত-মতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চণ্ডলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখা স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমনকি, এখন তাহার বাবার লিখবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অধিকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নতুনখোঁত বৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। এমনকি, কলিকাতার গলির ভিতবকার ইন্টেকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপূর্ণ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশ যেন আমার বৃকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদবাধাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্ব-জগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝড়াল নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে ভেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।



কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শূভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছ্ ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?”

তাহার মনে বৃষ্টি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো ‘কাবুলিওয়ালো, ও কাবুলিওয়ালো’ করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকবহু পুরাতন হাস্যালাপের কোনো রূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি, পূর্ববন্দুত স্মরণ করিয়া সে এক-বাল্ল আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোনো শ্বদেশীয় বন্দুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের বৃষ্টিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।”

সে যেন কিছ্ ক্ষুণ্ণ হইল। স্তম্ভভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পরস্য দিবেন না।—বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছ্ কিছ্ মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বৃকের কাছে কোথা হইতে এক-টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্নার এই স্মরণচিহ্নটুকু বৃকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তার মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বৃকের মধ্যে সুখাসণ্ডার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি

মেওয়াওয়াল আর আমি যে একজন বাঙালি সম্প্রান্তবংশীয়, তাহা ছুঁলিরা গেলাম— তখন বৃষ্টিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বত্যী সেই হস্তাচছ আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপদ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপদে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবোশিনী মিনি সলঙ্কভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়াল প্রথমটা খতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সমুদ্রবাড়ি যাবিস?”

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লঙ্কার আরম্ভ হইয়া মূখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আদার নতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রিকরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বাসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপদে মেয়েরা অভ্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শূভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

## ছাটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাণ্ড মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পাড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যিক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গর্দড়ের উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য় দেখিয়া কিছ্ বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছ্‌মাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আশ্ফালন করিয়া কহিল, “দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।”

সে তাহাতে আরও একটু নড়াচড়া আসনাটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু, এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না; কারণ, পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুস্থ ওই কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু, অন্যান্য পার্শ্বব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষ্ঠানিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিম্বা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—‘মারো ঠেলা হেঁইয়ো, মাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।’ গর্দড় এক পাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হর্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছ্‌ শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয়া ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পাড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মূখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গর্হাভিমূখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিম্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চাঁড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী

ভদ্রলোক কাঁচা গোফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।”

বালক ডাটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, “ওই হোখা।” কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুদ্ধিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা।”

সে বলিল, “জানি নে।” বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সম্মুখে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্দি আসিয়া কহিল, “ফটিকদাদা, মা ডাকছে।”

ফটিক কহিল, “যাব না।”

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, “আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!”

ফটিক কহিল, “না, মারি নি।”

“ফের মিথ্যে কথা বলছিস!”

“কখনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।”

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, ‘হাঁ, মেরেছে।’

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কবাইয়া দিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা!”

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, “আঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!”

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, “কী হচ্ছে তোমাদের।”

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।” বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহু দিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহার আনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন ধুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিনায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সূশান্ত সূশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, “ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।”

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে ফটিক, আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?”  
ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “যাব।”

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল—কোন দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

‘কবে যাবে’ ‘কখন যাবে’ করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাতে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশত তাহার ছিপ ঘাড় লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃন্দে মনে-মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগোঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বাল্যই আব নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসংসর্গও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্শাম্বব্দে স্তব্ধ করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে-মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য চর্চাও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে-মনে বৃদ্ধিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভূহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাটার মতো বিধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিতে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্য্যহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যিক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত—অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, “ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু পড়ো গে যাও”—তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর আবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা খাউস ঘড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, ‘তাইরে নাইরে নাইরে না’ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী আবিচারিণী মা অহর্নিশ তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অব্যক্ত ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে বাইবার অশ্ব ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোখলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক ‘মা মা’ ক্রন্দন—সেই লম্বিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্ৰান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেনের যখন খেলিবার ছটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই স্নিগ্ধ-রৌদ্র কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেরা কিছ-একটা খেলার ছলে কণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

এক দিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মামা, মার কাছে কবে যাব।” মামা বলিয়াছিলেন, “স্কুলের ছটি হোক।”

কার্তিক মাসে পূজার ছটি, সে এখনো ঢের দেরি।

এক দিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতি দিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও কেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আশ্রয় প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কাঁহল, “বই হারিয়ে ফেলেছি।”

মামী অধরের দুই প্রান্তে ক্রান্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, “বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।”

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাতে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্ সির্ করিয়া আসিল। বৃষ্টিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। বৃষ্টিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সম্বান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পদলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সম্ম্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝড় ঝড় করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পদলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাপেক্ষা কাদা, মুখ চক্কু লোহিতবর্ণ, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “কেন বাবু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।”

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দৃষ্টিচ্যুত তাহার ভালোরূপ আহালাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্‌ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কাঁহল, “আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।”

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্কু একবার উন্মীলিত করিয়া কাঁড়কাঠের দিকে হতবুদ্ধি-ভাবে তাকাইয়া কাঁহল, “মামা, আমার ছুটি হরুছে কি।”

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সন্নেহে ফটিকের শীর্ণ তন্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, “মা, আমাকে মারিস নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।”

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশার

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মূখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মূখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।”

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মূখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মৃহুতেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সূর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, “এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ না।” কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সূর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, “ফটিক! সোনা! মানিক আমাব।”

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, “আঁ।”

মা আবার ডাকিলেন, “ওরে ফটিক, বাপধন রে!”

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদু স্বরে কহিল, “মা, এখন আমার ছটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।”



## সুভা

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিচলিত প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিপায়নরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরুক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা হৃদয়স্বরূপ দেখিতেন; কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন—কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লবাবিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদের অনেকেটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু, কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মর্দিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অন্তহীন চন্দ্রের মতো অনিমেঘভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মূখের ভাব বৈ আক্ষয়কাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়ান্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঞ্জাভূমি। এই ব্যাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজ্ঞান মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন ম্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলস তম্বী নদীটি আপন কল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতাম্বনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁধারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢোঁকশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গৃহস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখন অবসর পায় তখন সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃত যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইরা কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইরা সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিঃশব্দ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঁঙিয়া ভাঁঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড়ো বড়ো চন্দ্রপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; কিম্বদন্তি-পূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঞ্জিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে বাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া-নৌকা বন্ধ থাকিত, সজ্জন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা ধামিয়া গিয়া উয়ানক বিজ্ঞানমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শব্দে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বৃদ্ধিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বৃদ্ধিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেঁটন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গাউনের ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে বাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যে দিন কোনো কঠিন কথা শুনিত সে দিন সে অসময়ে তাহার এই মৃক বন্ধুদুটির কাছে আসিত—তাহার সহিতাপরিপূর্ণ বিবাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী-একটা

অন্ধ অন্দমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বৃদ্ধিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ধনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরও একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেরা—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করবে, বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আশ্বীয় লোকেরা তাহাদের উপরে বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যিক তেমন গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় দাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্ষাদা বৃদ্ধিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অন্যতর মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু, কিছুই কবিবার ছিল না। তখন সে মনে-মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কান্ড

ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া বাইত, বলিত, “তাই তো, আমাদের সুভার যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।”

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া বাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্ক—কে বাসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তম্ভ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না। তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজ্ঞান্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোসাইনের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

## ৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নতুন অনির্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, এবং বুদ্ধিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমাগাত্র সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমাপ্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বাসিয়া—যৌবনের রহস্য পূর্নকে বিবাদে অসীম নিষ্ঠূর্ণতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমনকি তাহা অতিক্রম করিয়াও ধম্ধম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তম্ভ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তম্ভ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগুস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমনকি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শূনা যায়। বাণীকণ্ঠের সঙ্কল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ট্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “চলো, কলিকাতায় চলো।”

বিশেষ্যাত্মক উদ্ভোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাম্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা-বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক্ জন্মত্ব মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ৰ মেলিয়া তাহাদের মূখে দিকে চাহিয়া কী-একটা বুদ্ধিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, “কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।”

বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোবোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সে দিন গাছের তলায় আর বসিল না। বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতৌছিলেন, সুভা তাহার পায়ের কাছে বসিয়া তাহার মূখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ধনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শূঙ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে ষত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মূখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সৌদিন শুক্লম্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে; পাছে চোখ ফুলিয়া খরাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভৎসনা মানিল না।

বন্ধুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শীর্ণ, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বালর পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত ম্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মন্দ নহে।"

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন ইহার হৃদয় আছে, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।' শক্তির মন্ত্রার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূলা বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আব-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শূভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জ্ঞাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে দ্বীপে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়—ভাষা পার না—যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মূখগর্ভি দেখিতে পায় না—

বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্লদন বাজিতে লাগিল—  
অন্তর্ঘামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চন্দ্র এবং কণ্ঠেশ্বরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট  
কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

মাঘ ১২২১

## মহামায়া

## প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, 'তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এপর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?'

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমনকি অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—আরও দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা শূন্য কেবল বলিল, "চলো, আমরা বিবাহ করি গে!"

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রেব মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রেব মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নিভীক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন—তাহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাই-বোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই, কিন্তু এমন একটা তেজ আছে যে দিবা স্নিহ্রের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন; তাহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোলো, সতেরো, আঠারো, এমনকি উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এরূপ অসামান্য সুদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া ভারি খুশি হইলেন; মনে করিলেন,

ছেলোটি তাহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এ দিকে সাধ্যাতীত বায় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনূরূপ কুলসম্পন্ন পাঠ জোটে না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্ণ তিন যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এযাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাহার প্ররোচনায় দূটো-চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না— তাহার নিস্তত্ব গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাথার দিয়া দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্ণ হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পর হয় আমরণ সুখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, “চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।” এবং তার পরে বিস্মৃত-পাঠ ছাত্রের মতো ধতমত খাইয়া চূপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেক ক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তত্বতার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমৃদু আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল। মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমূলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শব্দ পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্ সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উচ্চ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাং ছলাং করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরতল হইতে একটা রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মূখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্না-বিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মূখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিন্ধুকভাবে মহামায়ার মূখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, সে হইতে পারে না।”

মহামায়ার মাথা ষেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে; আর-কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচালিত করে। প্রবল কুলান্ধমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে— সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলানি ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া বৃষ্টিতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনা-



হীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বদ্বিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “আমি কালই এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।”

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে—‘সে খবরে আমার কী আবশ্যক’। কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন।”

রাজীব কহিল, “আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।”

মহামায়া আবার অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল, “আচ্ছা।” সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “চাটুঞ্জমহাশয়!”

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে; বদ্বিল, তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভূর্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তত্বে-ভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, “রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।”

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাহার অনুগমন করিল—আর, রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাতেই ভবানীচরণ একখানা লাল চোল আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, “এইটে পরিয়া আইস।” মহামায়া পরিয়া আসিল।

তাহার পর বলিলেন, “আমার সঙ্গে চলো।”

ভবানীচরণের আদেশ, এমনকি সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাতে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিজ্ঞেয় শূভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বদ্বিল, এই

মদুর্ঘর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপ্যায়িত লেশমাত্রও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদ্রবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুশয্যার আর্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্তোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনার বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেন্দুপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধবাসংবাদে সেরূপ হইল না। এমনকি, কিঞ্চৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু, সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, দ্বিতীয় অন্ন-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধুম। মহামায়া সহমৃত্যু হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজীব এক মাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, “তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।” সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস—এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া স্বারে স্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মৃশলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিস্ফলব উপস্থিত হইয়াছে তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজের যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি অকাশ পাতাল ছাড়িয়া ততটা শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে সবলে কে স্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মৃৎ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বাসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?”

মহামায়া কহিল, “হাঁ। আমি তোমার কাছে অপগীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অপগীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে-মনে সেই মহামায়া আছি। এখনও বসো, এখনও আমার চিতার ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনও আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মৃৎ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।”

মদুর্ঘর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট; তখন আর-সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, “তুমি যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।”

মহামায়া কহিল, “তবে এখনি চলো—তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে সেইখানে যাই।”

ঘরে যাহা-কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এখনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটা গুলির মতো গায়ে বর্ষিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পাড়বার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহ-মরণপ্রথা প্রচলিত ছিল তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শূনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নি-প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধু ধু করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মৃদলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভঙ্গ হইয়া তাহার হাতদুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গায়ে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদ্রবতী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটারই মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা স্বিগ্ধ দঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চিরদিন পার্শ্ব থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজ-কবচ-ধারী, সে

আপনার স্বভাবের চারি দিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরও একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগার্গন্ডর বাহিরে বাসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সুন্দর অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাতি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নত নেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিথাপন করে।

এমানি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র বাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিম্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুস্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বাসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বাসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আঞ্জিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তম্ভ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনার মহামায়ার বামগন্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; দেখিল, সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুকিল এইবার বক্তৃ উদাত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল; পারে ধরিত্তা করিল, “আমাকে ক্ষমা করো।”

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সম্মান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দম্বাচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

## দানপ্রতিদান

বড়োগিন্মি যে কথাগুলো বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমন। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুস্তাল একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলো তাহার স্বামীর উপর লক্ষ করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রে আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্বুকুটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্বুকুট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু, এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমাণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল যাহা ইতিপূর্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কক্ষগবংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতেল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রাব চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাহাকে বিশেষ কার্য-বশত ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যিক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমাণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মূহূর্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে।”

রাসমাণি উচ্ছ্বাসিত স্বরে কহিলেন, “শোন নাই কি।”

“শুনিয়াছি। কিন্তু, বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্তেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চাপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কাঁড় হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে খাইতে পরিতে দেখ সে যদি দূটো কথা বলে তাহাও খাওয়াপরাই সাঙ্গ করিয়া লইতে হয়।”

“এমন খাওয়াপরাই কাজ কী।”

“বাঁচতে তো হইবে।”

“মরণ হইলেই ভালো হয়।”

“যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্ঠা করো, আরাম বোধ করিলে।” বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু, প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়োগিন্মি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত, শশিভূষণ

দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্মীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্মীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত টিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়-কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাহার স্বামীকে বঞ্চিত করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না রাধার প্রতি তাহার বিশ্বাস ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রতি নির্বিশেষ অবজ্ঞা-প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া ম্বিগুন দঢ় করিতেন। তাহার এই বহুদয়পোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্নিদুঃপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকায়ে প্রায় মাঝে-মাঝে উষ্ণভাষার উচ্ছ্বাসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না— কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ দাস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অসুখ হয় নাই তো?”

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, “না, আর তো আমার এখানে থাকি হয় না।” এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, “এই! এ তো নতুন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দূটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাঝে-মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।”

রাধা কহিলেন, “মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া ভীষ্মলাম কী করিতে। কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।”

শশিভূষণ কহিলেন, “তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।”

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এ নিকে বড়োগৃহিণীর আক্রমণ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মৃদু-মৃদু বাক্যবাহে রাসমণির অন্তরাষ্ট্রাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। বাধা যদিও চূপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্মীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, শশিভূষণের সহিত তাহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে— দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্ডাভাত খাইয়া পাতভাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালার বাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া

রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাতে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিত যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলো দিনকে কি এক দিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু, এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরাম্প্রত্যাশার সূচতুর ছন্দবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু, এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগনা এনাংশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন সে রূপ তাহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গার্হস্থ্যী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময় দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসয়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অসুখেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইপিগাতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং

হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাতে রাধামুকুন্দ কী কী বৃত্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল। শূনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাতেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই। অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, “ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্ষাদা ও কি বৃত্তিতে শিথিয়াছে। ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।”

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আদ্যাক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বই মন্দ নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনার রাসমণিকে বরণ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন ক্লম হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য কবে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময় গভীর রাতে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, “তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার ঠৈপত্বক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশ দিন সেরিও নাই।”

বাস্তবিক বেশি দিন সেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে ধরিদ করিয়াছিল সে বাদসারী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর-খাজনা দিতে হইত—এক পরসামান্য পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধা ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় বাদসাজীদী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারি বিস্তর মকদ্দমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইয়া এই কষ্ট হাত হইতে ছাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় বহু অল্প দিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রাপ্ত প্রৌঢ়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তরমুখ মানসিক উত্তাপের বাষ্পখানে চাঁড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া



পেঁপেঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন তখন কী জ্ঞান কেন আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও টিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সদর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী বল, ভাই।”

রাধামুকুন্দ বলিলেন, “অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বইকি।”

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেষণাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারিদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্ন শরীরে আর সাহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দূরূহ উপসর্গের সাহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, “বড়ো শক্ত ব্যাধি।”

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া নিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, “দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।”

শশিভূষণ কহিলেন, “ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকে দিব।”

রাধামুকুন্দ কহিলেন, “সবই তো তোমার।”

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, “এক কালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।”

রাধামুকুন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর প-দুটি ধরিয়া কহিল, “দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সম্মত নাই।”

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল—“দাদা, আমার ভালো করিয়া বলবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্ভাগী জ্ঞানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বৃষ্টিতে পারে তো হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল—তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখলাম, এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমি সদর-খাজনা লুণ্ঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।”

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে করিলেন, “ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখতে পারিলে। দয়াময় হরি!”

বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া করিল, “দাদা, মাপ করিলে তো?”

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া করিলেন, “ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি ষাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।”

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লম্জিত মুখ লুকাইয়া কর্ণিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে করিল, “দাদা, মাপ যদি করিয়াছ তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।”

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাহার বাকরোধ হইয়াছে—রাধামুকুন্দের মস্তকের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কী বৃঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বাকিয়া থাকিবে।

## সম্পাদক

আমার স্ত্রী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া, এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বন্ধে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুর্হিতাকে ম্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম না পত্নীহীন পিতাকে পবন যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুদ্ধিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিম্মিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ওইটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পাষ নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানাঘ শয়নাইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সংপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধামত লেখাপড়া শিখাইতেছি, কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্নেন্ট-আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফু দিলে বিনা খরচে বাঁশ বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে হতভাগ্যের বৃদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আশ্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তাম্বিত মূখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহ-সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, নাইতে যাবে না?”

আমি হৃৎকার দিয়া উঠিলাম, “এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস নে।”

বালিকার মৃৎখানি বোধ করি একটি ফৃৎকারে নির্বাণিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্কুক সুর করিয়া ভিক্কা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপাশ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নাম-নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি।—হায়, কেহই বৃদ্ধিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতোছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতোছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এ দিকে প্রভার যোগ্য পাঠগর্ভা অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জন্টিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অপর্দাল নির্দেশ করিয়া দেখাইত, এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পাশ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথার কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মৃৎলেখিকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃকের জীব আমাকে পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিষ্পত্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মৃৎ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাক্যে লিখিতাম, আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফৃটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলো পর্বস্ত যেন চক্কর সমক্ষে চাঁৎকার করিতে থাকিত। এইজন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বৃদ্ধিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাত্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কটকৌশল-সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বৃদ্ধিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। শেষে পাড়িয়া সুরদীর্ঘ সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল

করিয়াছি; কারণ, ষথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রুপ করিবার সুবিধা এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রুপ করিতে পারে হনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রুপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুদর্শিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমনকি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলোর কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল, মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বৃষ্টিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ, গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতাচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতৈছিলাম। পাখির নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল তখন বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুদর্শি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতোছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্র তার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বৃষ্টিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতৈছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মূখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতৈ পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অনামনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল, “বাবা।” কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত ভুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া বাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিম্নীলিত; দিনশেষের করিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দোঁধ অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তম্ভ নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ্ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কম্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতন্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং জাহিরগ্রামের বত কাগজ ছিল সমস্ত পড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সূখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার কিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চালাইয়া গেলাম।

## মধ্যবর্তিনী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরান্তস্থ স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহম্বরে খোলা গারে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন-বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই-সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপ্ত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপসিমাছ-ওয়াল আসে সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর ষথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দাঁড়িতে বুলানো চাপকানটি পরিয়া, এক-ছিলাম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ-পূর্বক আর-একটি পান মূখে পুরিয়া আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা ষাপন করিয়া আহারান্তে রাতে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিবৃত্ত ঝির অবাধতা, ছেঁচকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্বন্ত কোনো কবি ছন্দোবন্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো স্কাভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার বতই কুইনাইন দেয় বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত উর্ধ্ব চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্বন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভার বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দার বসিয়া চিন্তিতমূখে তামাক টানিতে থাকে। দুই বেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে বাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অবাবস্থিত শূন্যতা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু, এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি কেন বহুদূর হইতে অতি কীর্ণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাষ্ট।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উক নিশীথের

চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উদ্ভূত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড়ো-একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শৃঙ্খ ডালের মাচার উপর কুম্ভাডলতা উঠিয়াছে; বৃক্ষ কুলগাছের তলার বিষম জঙ্গল; রাসাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইঁট জড়ো হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দম্ভাবশিষ্ট পাথরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু, বাতাসনতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতি মূহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল তাহার অর্কাণ্ডকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামানদীটি যখন বাঙ্গুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্বন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বারদ্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ প্দলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুস্বপ্নতির ন্যায় আঁত সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ ব্ধিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত ‘কেমন আছ’ তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্জ সফুতজ্জ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশখগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি ব্ধলাইতে ব্ধলাইতে হরসুন্দরী কহিল, “আমাদের তো ছেলেপুতে কিছুই হইল না, তুমি আর-একটি বিবাহ করো।”

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতোছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মান্দব মনে করে, ‘আমি সব করিতে পারি’। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মর্ছিত করে তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস, একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দৃষ্ণের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত প্দলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, ‘আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হার, যতখানি সাধ ততখানি সাধা কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য



নাই, বৃষ্টি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

‘আর, স্বামীকে যদি দুঃখফেনের মতো শূন্য, নবনী মতো কোমল, শিশু-কন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুস্তালি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না।’ তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বন্ধ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, শ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও কণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ ষত বারম্বার এই অনুরোধ শুনিল ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মনে হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তান-পরিবৃত্ত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, “বুড়াবয়সে একটি কচি শুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মান্দ্র করিতে পারিব না।”

হরসুন্দরী কহিল, “সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মান্দ্র করিবার ভার আমার উপর রহিল।” বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাড়ুকোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মূখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, “আমার আপিস আছে, কাজ আছে, ভূমি আছে, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।”

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না। এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, “আজ্ঞা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা ভূমি থাক।”

নিবারণ সে কথা উত্তরমাট দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপালে হাসিয়া তর্জনী-আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলক-পরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মূখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ‘ওই তো একফোটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিকল্প বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে কেন পরিচাল্য পাওয়া যায়।’

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে-মনে বড়ো আশ্রয় বোধ করিত। এক-একদিন হাত চাপিয়া ধরিতা বলিত, “আহা, পালাও কোথায়। ওইটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলবে না।”

নিবারণ ম্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিতা বলিত, “আরে, রোসো রোসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।” বলিতা যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া ম্বার আটক করিতা বলিত, “আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না।” অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বাসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, “আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রম্বা করিতে নাই।”

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিতা নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিতা তাহার অন্ত মন্থ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, “আহা, কেমন চাঁদের মতো মন্থখানি দেখো দেখি।”

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিতা বাইত এবং বাহির হইতে কনাং করিতা দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত, দুটি কৌতুহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে; অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মন্থ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল তখন ম্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌতুহল, এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানা ভাবে নানা দিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুকের মন—বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্রুতের মতো সহসা সর্চকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে, নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাকমোরান কোম্পানির আপিসের হেড্‌বাব্দ শ্রীযুত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল; যখন বৌকন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরান্তান্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একবারে পাকা আশ্রয়ের মধ্যেই যে পতলা জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকাচাম্বুখ গোলাপের আধখোলা মন্থটির কাছে ঘুরিতা ঘুরিতা তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে, তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউন-পর্য্য কাঁচের পুতুল, কখনো বা একশিশি

এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া স্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কাড়ি লইয়া দশ-পাঁচশ খেলিতেছে।

বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহাৰাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল, কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবণতার কী আবশ্যিক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্র তাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে-মনে কহিল, 'আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন—যেন আমি উহাদের সুখের কাটা।'

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবাধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না; রাধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদুষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, 'তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।'

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হার, আজ কোথায় সে বল যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাতে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল স্ফাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, 'আমার কোথাও সীমা নাই।' তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের সদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বৰ্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয় চিরদারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি স্বৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পান্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শব্দে স্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া

ভাসিভেছিল। মনে হইয়াছিল, 'আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে।' ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।'

হরসুন্দরী যে দিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বদ্বিভে পারিল সে দিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাশ্রে যে শয্যার প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে, সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিলির অপর প্রান্তে একজন শোখিন যুবা বেহাগ রাগিনীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর-একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তম্ভ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘূমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, "সই!"

লোকটা ইতিমধ্যে বিষ্কমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি বোঁবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বৃদ্ধিশক্তি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উন্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারী কোনোকালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন-সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন-সকল দুর্দাম দুর্ন্ত শক্তি যাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব শঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়-ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায় কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আঁপিসে ঘাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জ্বলতা, কোনো উদ্ভাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা ভরিতরকারির ঝঞ্জাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্ব এক গোপন মহামহেশ্বরভান্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু, ভাগাভাগি

করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর-একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গোরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারীজীবনের ষথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মনুহৃত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া, বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে; কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উল্লম্বখীন হইয়া রহে তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে ক্ষীণ হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, ‘আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি’। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক দিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্কল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নুতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বাসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে স্বেদের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তাঁরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্ব গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, “গোটাকতক গহনার আশ্রয় হইয়াছে। জান তো অনেক-গুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।”

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, “তবে কি আজ হইবে না।”

হরসুন্দরী কহিল, “না।”

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এ দিকে ও দিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, “তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখি গে যাই।” বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বদিকিল। বদিকিল, নববধু পূর্বরাগ্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুত্রটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, “দিদির সিদ্ধকন্ডরা গহনা, আর আমি বদিক একখানি পরিতে পাই না?”

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিদ্ধক খুলিয়া একে একে

সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনার ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো সুমিষ্ট, একটি সদ্য পক্ক সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল, রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরসে রক্তের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কাঁহিল, 'আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অর্মানি যৌবনের শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সে দিন আসিল এবং কখন সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না।' কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরণ্য তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্মাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নির্বোধের মতো এ-সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্মা ছাড়া আর-একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে; এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর, শৈলবালা সোনামানিক ঝক্ ঝক্ করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল, চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে; কারণ সে হইল শৈলবালা, সে হইল সেই।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়; কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিতমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাকমোরান কোম্পানির হেড্‌ব্যাঙ্কটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাক্‌থানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিল এবং বহু দূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্য এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে; সন্ধ্যা সন্ধ্যা ম্যাকমোরান কোম্পানির ক্যাশ্‌ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত, 'আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব'। কিন্তু, আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্যন্ত চাঁকিতের মতো চিক্‌মিক্‌ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে অস্তহিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পূর্বদানক্রমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে—

তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিন মাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, “সর্বনাশ হইয়াছে।”

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, “শীঘ্র গহনাগুলো বাহির করো।”

হরসুন্দরী কহিল, “সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।”

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, “কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।”

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, “তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।”

ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, “তবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু, আমার মাথা খাও, বলিয়ো না যে, আমি চাহিতোছি কিম্বা কী জন্য চাহিতোছি।”

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণা-ভরে বলিয়া উঠিল, “এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।” বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, “সে আমি কী জানি।”

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, “সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।”

নিবারণ দেখিল, ওই দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিঁদুরকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পৃষ্কারিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, “তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।”

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, “তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।”

নিবারণ কহিল, “আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতোছি।” বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহু কষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্বাধর-জগন্মের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্রেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্বাধর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটোবউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছতেই বৃদ্ধিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর-একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুৎখুৎ করিয়া বলে, “আমি দিনরাতি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।”

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, “আমি আর-একটা ভালো বাড়ির সম্বন্ধে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।”

শৈলবালা বলিত, “কেন, ওই তো পাশে আর-একটা ঘর আছে।”

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মূখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দূরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা এক দিন দেখা করিতে আসিল; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছতেই ম্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্‌টারিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমনকি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, “তুমি শৈলকে বাঁচাও।”

হরসুন্দরী দিন নাই, রাতি নাই, শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ঘুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছতেই সাগর খাইতে চাহিত না, বাটিসুস্থ ছুঁড়িয়া ফেলিত, জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, অনর্থপাত করিত। হরসুন্দরী তাহাকে ‘লক্ষ্মী আমার’ ‘বোন আমার’ ‘দিদি আমার’ বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্রুদ্র অসম্পূর্ণ বার্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল; পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বান্দন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মৃত্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বৃকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মূহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাথবীলতাটির মতো এই-ষে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্‌বন্দনরঞ্জু।

আর, তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখসুখের স্মৃতিস্মিরের মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্রুদ্র



উজ্জ্বল সন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত নিবারণ ধীরে ধীরে হরসন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়ম-মত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু, এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরসন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে ঘেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল; কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লক্ষন করিতে পারিল না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

## অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জ্ঞানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাণ্ড কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন-খানটিতে তাহার রাজত্ব, এ-সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল; আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পূর্নকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মনুহৃৎের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয়, লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেরানার মতো মূখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সেই রাজা।”

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রকৃত্ত্ব-পাণ্ডিতের মতো মূখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, “এক যে ছিল রাজা তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।”

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, “অজাতশত্রু! ভালো, কোন অজাতশত্রু বলো দেখি।”

লেখক অবিচলিত মূখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, “অজাতশত্রু ছিল তিনজন। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আট মাস বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।” অবশেষে ম্বিতীর অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নারক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, “ওরে বাস রে, কী পাণ্ডিত্য। এক গল্প শুনিলে আসিয়া কত শিকাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।”

হায় রে হায়, মানুষ ঠিকিতেই চার, ঠিকিতেই ভালোবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলো আনা আছে। এইজন্য প্রাণপণে সেরানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তার আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, ‘প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিযো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিলে হইবে না।’ বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদা-উৎসাহিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মূখোশ-পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমূখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনতে বসিরাছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বৃষ্টি আসল কথাটা কোন্টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বর্জিত হয়, এত অনাবশ্যক কথাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একগ্রন্থিতে প্রার্থনা করি, 'হে দেবতা, আর একটুখানি। কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও।' তখন মনে হইত, পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আঘাটে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষত পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হার, মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাঙ্গ এক মূহুর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন-পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছাটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মৃধোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্দি খেলিতেছিলেন। বৃষ্টি করিয়া এক পাশে শূইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" আমি মৃধ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্ৰাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, "আজ তবে থাক, মাস্টারকে যেতে বলে দে।"

কিন্তু তিনি বেরূপ নিরুদ্বেগভাবে বিন্দি খেলিতে লাগিলেন তাহাতে বেশ

বোঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম— আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দাদিমাকে ধরিয়া পাড়লাম, “দাদিমা, একটা গল্প বলো।” দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, “রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।”

আমি কহিলাম, “না, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দাদিমাকে গল্প বলতে বলো-না।”

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, “যাও খুঁড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।” মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, ‘আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।’

আমি দাদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ ঝড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নাড়িয়াচাঁড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল— তার পরে বলিলাম, “গল্প বলো।”

তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল; দাদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন— এক যে ছিল রাজা। তাহার এক রানী।

আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে— বৃষ্টিতে পারি, দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে দিখম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম, যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিশ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায়, তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু রাজা ফিরিলেন না।

মেয়ের মৃৎখের দিকে চার আর রানীর মৃৎখে অমজল রুচে না। ‘আহা, আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।’

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অনুর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি আর কিছ্ চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিরা খাইয়া যাও।”

রাজা বলিলেন, “আজ্ঞা।”

রানী তো সে দিন বহু ষণ্ডে চৌষটি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাখিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মূখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।”

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।”

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে!”

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।”

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেয়ের বিবাহ দাও নাই?”

রানী কহিলেন, “তুমি ঘরে নাই, উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাঠ খুঁজিতে বাহির হইব।”

রাজা শূন্য হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “বোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজস্বারে যাহার মূখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।”

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শূকন কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, “ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব।”

রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা-বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছ ঘেঁষিয়া নিরাতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “তার পরে?” নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগ্যবান কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই। যখন সেই রাত্রে ঝপ্ ঝপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গদন্ গদন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরাণ রহস্যময় অনাবিস্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রাপ্ত এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজার কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা-বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁধি, কানে তাহার দুল, গলার তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কান্ন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং

আলতা-পরা দুটি পায়ে নুপুড় বন্ম্ বন্ম্ করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বৎসর বনে বাসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত, ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গাভিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গার বিষয় একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, স্বিতীয়ত সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু, পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাস্তি নয় যে সকল কথা চূপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাস্তিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তার পরে?”

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলোটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড়ো যত্নে মানুস করিতে লাগিল।

আমি একটুখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া পাশ-বালিশ আরও একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, “তার পরে?”

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলোটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলোটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “ওই-ষে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেরেটি তোমার কে হয়।”

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেরেটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে, একদিন সকালে রাজবাড়ির স্বেদের সম্মুখে শূকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু, সে দিন কী একটা মস্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলোটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, ওই-ষে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রূপসী মেরেটি থাকে, ও তোমার কে হয়।”

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মূখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, “আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ওই সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেরেটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।”

রাজকন্যা বলিল, “আজিকার দিন থাক্, সে কথা আর-একদিন বলিব।”

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, “তুমি আমার কে হও।”

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, “সে কথা আজ থাক্, আর-একদিন বলিব।”

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, “আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।”

তখন রাজকন্যা কহিলেন, “আচ্ছা, কাল নিশ্চয়ই বলিব।”

পরদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, “আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।”

রাজকন্যা বলিলেন, “আজ রাতে আহাৰ করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।”

ব্রাহ্মণ বলিল, “আচ্ছা।” বলিয়া সূৰ্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এ দিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি খব্ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে স্দগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাতে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহাৰ শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ‘আজ শুনিতে পাইব, এই সাতমহলা বাড়িতে যে সন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।’

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাতে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহু দিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, ‘সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।’

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে প্দুশয্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বন্ধঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তার পরে কী হইল।”

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—

কিন্তু সে কথায় আর কাজ কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা ‘তার পরে’ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে ‘তার পরে’র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুর অনঙ্গমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অশ্লল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু, এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে— কেবল হয়তো একটা কলার ভেলার ভাসাইয়া দিয়া গুটি-দুই মন্ত পড়িয়া মাত্র—যে, সেই ঝপ্ ঝপ্ বৃষ্টির রাতে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রে স্দর্শনদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে

প্রান্ত দাঁট চক্কু আপনি মর্দিয়া আসে, তখনও তো শিশুর কঁদু প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুস্বপ্নিতর ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দাঁট মায়ামস্ত পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলে।

কিন্তু, যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্যসাম্বাদনের জন্যও এক ইঞ্জি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয় তাহার কাছে কোনো-কিছুর আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া, গল্পের বেখানে বথার্থ বিরাম সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোল,  
নোটে গাছটি মড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ ধামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতো পাই—

আমার কথাটি ফুরোল না,  
নোটে গাছটি মড়োল না।  
কেন্ রে নোটে মড়োল নে কেন।  
তোর গোরুতে—

দূর হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কেন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।



## শাস্তি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবাকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর শূনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, “ওই রে বাধিয়া গিয়াছে।” অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্বদিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমন এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ শব্দটাকে জীবনবথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরণ ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত ধম্‌ধম্‌ ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, সে দিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সে দিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যে দিন আরম্ভ হইল সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন নৌখল স্তম্ভ গৃহ গম্‌গম্‌ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগূলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জঙ্গলময় পাটের খেত হইতে সিন্ধু উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাস্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবাব মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তম্ভ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পল্লী নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমনকি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মূর্ছিত প্রসারিত অঙ্গুলিগূলি শূন্য একটা-কিছু অস্তিম অবলম্বন আঁকড়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও পারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া বাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া

লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাথ্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিষেধ হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জব্দান্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজতে হইয়াছে—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সম্মুখবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দ্রা ভূমিতে অশ্লীল পাতিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রু-বর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাখা মূখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল; তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলোটো কাঁদিতোছিল। দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল দেখিল, উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ৰোধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, “ভাত দে।”

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফর্লঙ্গপাতের মতো এক মূহূর্তেই তীব্র কঠম্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, “ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিল। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।”

সারাদিনের শান্তি ও লাঞ্চার পর অমহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে, প্রজ্বলিত কুখানলে, গৃহিণীর রুদ্ধ বচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবাবেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ৰুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, “কী বলিলি!” বলিয়া মূহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাখা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মূহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দ্রা রক্তসিক্ত বস্ত্রে “কী হল গো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবৃষ্টির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলোটো জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকা এ পারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চূপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার কোরফা প্রজা দুখিরাম অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া, চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া, ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ার দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত ‘মা মা’ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুখি, আছিস নাকি।”

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বাসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।”

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাতি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, “হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।”

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, “কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।”

ছিদাম দৌধল, আর রক্ষা হয় না; হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, “ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।”

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ‘ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।’ মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “আঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!”

ছিদাম কহিল, “মরিয়াছে।” বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, ‘রাম রাম! সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে।’ ছিদাম কিছতেই তাহার পা ছাড়িল না; কহিল, “দাদাঠাকুর, এখন আমার নউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।”

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, “দেখ, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্ গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ কথা বলিলে ছুড়িটা বাঁচিয়া যাইতে।”

ছিদামের কণ্ঠ শব্দ হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, “ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।” কিন্তু, যখন নিজের

স্ট্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে বৃদ্ধি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা বৃদ্ধিসংগত বোধ করিলেন; কহিলেন, “তবে যেমনটা ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।”

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দ্রা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথার দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমন হৃদয় শব্দে পদলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্‌বিন্দু হইয়া উঠিল।

### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ-সুন্দর রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে; এখন আবার আর-একটা কিছ্ প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছ্ ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ট্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ট্রী চন্দ্রাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বক্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।”

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপৃষ্ট গোলগাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ, অটুসটি; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছ্ বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অভ্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতুহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে, এবং কুম্ভ কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঝেং ফাঁক করিয়া উল্লস চঞ্চল ঘনকৃক চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছ্ সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অভ্যন্ত এলোমেলো, ঢিলেঢালা, অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকম্বার কাজ কিছ্ই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছ্ কাজও নাই, অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছ্ কথা বলিত না, মৃদু স্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া বকিয়া-ককিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুখ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছ্ৰু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্চকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য -বিজ্ঞিত এবং কোথাও যেন কিছ্ৰু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাঁছিয়া বাঁছিয়া কণ্ঠ কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাটা, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরূপ গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষু আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছ্ৰু সূক্ষ্ম ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছ্ৰু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছ্ৰুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমনকি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছ্ৰু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছ্ৰু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে ঘাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পষটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলোটের প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্ম কোথাও এক দণ্ড গিয়া সূস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোট্টে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোনদিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।”

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, “কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের।” এই—দুই জায়ে বিষম স্বন্দ্র বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, “এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গুড়াইয়া দিব।”

চন্দরা বলিল, “তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে ঘাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে স্বেদ  
রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই।  
চন্দ্রা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া  
আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্জলি পারদকে মৃষ্টির মধ্যে  
শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মৃষ্টিমের স্ট্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা  
তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জ্বর্দাস্তি করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল।  
তাহার এই চণ্ডলা স্বভাবী স্ত্রীর প্রতি সদর্শনিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার  
মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমনকি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায়  
তবে আমি নিশ্চিত হইয়া একটুখানি শাস্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে  
মানুষের ষতটা ঈর্ষা হয় ষমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দ্রাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কাঁহল সে স্তম্ভিত  
হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্কু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার  
স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত  
হইয়া স্বামীরাকসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।  
তাহার সমস্ত অন্তরাঙ্গা একান্ত বিমূখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, “তোমার কিছু ভয় নাই।” বলিয়া পুলিসের কাছে  
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দ্রা সে-সমস্ত দীর্ঘ  
কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুর্ধরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দ্রার  
উপর দোষারোপ করিতে বলিল দুর্ধি বলিল, “তাহা হইলে বউমার কী হইবে।”

ছিদাম কাঁহিল, “উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।” বৃহৎকার দুর্ধরাম নিশ্চিত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, “তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে ক’টি  
লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন  
করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।” এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে  
অজংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে  
শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দ্রাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন  
করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল  
সাক্ষীর স্বেচছাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দ্রাকে প্রশ্ন করিল চন্দ্রা  
কাঁহিল, “হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।”

“কেন খুন করিয়াছ।”

“আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।”

“কোনো বচসা হইয়াছিল?”

“না।”

“সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?”

“না।”

“তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?”

“না।”

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, “উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—”

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে ধামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কাঁ নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, ‘আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম— আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।’

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চণ্ডল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধু, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাফিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সহ-সাঙাতরা, কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ ম্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, “দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।” হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, “খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ‘বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে সন্তি দিন।’ আমি ভালো মন্দ কিছই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, ‘আমি যদি বলি, আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।’ আমি কহিলাম, ‘খবর্দার হারামজাদা, আদালতে এক-বর্ণও মিথ্যা বলিস

না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।” ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা কারবার উদ্দেশে অনেকগুলো গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দৌখল চন্দরা নিজে বাকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, ‘ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যর দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভালো।’ এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকাম্বা পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী ম্যুসফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। বৃন্দনশালার পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ডোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচাঁল্লশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কত শত লোক আপন আপন কড়াগন্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর-কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত কাস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, “ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কত বার করিয়া বলিব।”

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জন?”

চন্দরা কহিল, “না।”

জজসাহেব কহিলেন, “তাহার শাস্তি ফাঁসি।”

চন্দরা কহিল, “ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।”

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মূখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, “সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।”

চন্দরা দুই হাতে মূখ ঢাকিয়া কহিল, “ও আমার স্বামী হয়।”

প্রশ্ন হইল, “ও তোমাকে ভালোবাসে না?”

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল ছিদাম কহিল, “আমি খুন করিয়াছি।”

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।



দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মর্ছিত হইয়া পড়িল। মর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, “সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।”

“কেন।”

“ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।”

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বৃষ্টিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা পুলিশ হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যে দিন একরাত্রি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মূর্খটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শব্দরঘরে আসিল সে দিন রাত্রে শূভলক্ষ্মীর সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছিল যে, ‘যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সঙ্গতি করিয়া গেলাম।’

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?”

চন্দরা কহিল, “একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।”

ডাক্তার কহিল, “তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।”

চন্দরা কহিল, “মরণ!—”

## একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু, আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারি দিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমত সে চেষ্টার চুটি হয় নাই।

কিন্তু, পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্ণভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার ষোণা নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না; কিন্তু প্রধান কারণ এই যে বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবনপেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাহার এই বিধান ছিল যে, 'যদি তুমি আশ্রয়লাভ করিতে চাও তো একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।' চিন্তাও সেই নিরালার বাস-স্থানটুকুর জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, কিন্তু, পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুদ্ধিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উদ্ভূত করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন; আমি তাহার সেই হাস্য যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্তি পাইতে পারিত, কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনাপূর্বক প্রাণীগণকে যথাসাধা কর্মে নিরোগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিয়ন্ত্রিত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যিক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও চুটি কর না। আবশ্যিক অতীত হইয়া গেলে সেবকামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আশ্রয়গৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই 'সাধারণ'-নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু, অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শুনাইব। শ্রান্ত মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে

পাড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শুনিতে খৈষ্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।—

পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টিচিন্তে উভয়ে ধরাধামের যশকীর্তন করিয়া পৃষ্ঠকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে, দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, “ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।”

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, “ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা একে-বারে অন্তঃসারবিহীন।”

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লক্ষ্য দিয়া, পৃথিবীর কোমল কর্ণমে অনবরতই চণ্ড বিম্ব করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল। এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বাবস্বার চণ্ড আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বির্ধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বশিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু, ইহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ, পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতিপুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহু দিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দে চণ্ডপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ্ খচ্ শব্দে চণ্ড বিম্ব করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে, সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চণ্ড আপনায় উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দুটি বিশ্বব্য-বিষজর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পার না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামন্ডু অর্থ কী আছে কিছ্ বদ্বিতে পায় নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছ্ই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বদ্বিতে পারিবে।

যাহাই হউক, সর্বস্বস্থ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাগ ১০০০

## সমাপ্ত

## প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা-অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুগ্ধ আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কলে কলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্ জ্বল্ এবং বাতাসে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বর আগমনসংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অর্মানি কোথা হইতে এক সন্মিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বাসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথ গাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লম্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নতুন ইন্ট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাবই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এর্মানি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিন্তিতে পারিল, তাহাদেরই নতুন প্রতিবেশিনীর মেয়ে : নবী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছ্বাস স্বভাবে সর্বদা ক্রীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সময়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গীর উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রভাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্বক মন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চকুতে না আছে লম্জা, না আছে জ্বর, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাগ্ন। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল, কিন্তু

তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সে দিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশবাস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মৃধরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগর্দল পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমনকি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মৃধ চোখে পড়ে, কিন্তু এক একটি মৃধ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মৃধের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিষ্কৃটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, যে মৃধে সেই অন্তরগদহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে মৃধ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মৃদুিত হইয়া যায়। এই বালিকার মৃধে চোখে একটি দূরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মত্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে; সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মৃধখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধর্নি যতই সূক্ষ্ম হউক, দুর্ভাগ্য অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্রেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যগ্গ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমৃধে দ্রুতবেগে গৃহ-অভিমৃধে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইন্টের স্তপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শব্দ কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোবাক্য শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইন্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধর্নি শূন্যে শূন্যে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সম্বন্ধে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধূয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, 'বি.এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর-কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাঠী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাঠী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাতে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বাসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাঞ্জিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্থলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, 'আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।'

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধূতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোশ্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বানিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া, সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত স্বপ্নরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মর্দাছিয়া, রঙ করিয়া, খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া, একখানি পাংলা রঙিন কাপড়ে মর্দাছিয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রোঁটা দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনাধিকার-প্রবেশোদাত লোকটির পাগড়ি, ঘাড়ের চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রোঁটা দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ শ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধূপ্ধাপ্ শব্দ শোনা গেল এবং মৃহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃকপাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত

কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগাড়ি-পরা মস্তকে অপ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘাড়ের চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটোঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুর্মরিয়া গজ্ঞান করিতে লাগিল এবং ভ্রমীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন-মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটোঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমনকি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক দিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝড়টির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল কাঁচ্ কাঁচ্ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কৌকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিক কক্ষ স্থায়ী হইল না। পিন্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী-সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুন্মফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। স্ফারের নিকটে গিয়া দেখে বার্নিশকরা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহু চেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন টিলা চটিজোড়াটা পরিয়া, প্যান্টলুন চাপকান পাগাড়ি-সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুঙ্করিণীর ধারে নিজের পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্য-কলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নিলঞ্জিত অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুত বেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কৌকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপূর্ণ সহাস্য দৃষ্ট মৃদুখানির উপরে শাখান্তরাল-চ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নিব্বরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর উর্ধ্বাংকিশ্ত মূখের উপর, ভড়িস্তরল



দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মৃদু শিথিল করিয়া যেন ষথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিত্তা মারিত তাহা হইলে সে কিছই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপূর্ণ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিকণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্যা গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মূহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরণের মধ্যে এসেন্স, জুতা রুবিনের ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং 'হারমোনিয়াম-শিক্ষা' বহির মধ্যে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীবৃদ্ধ অপূর্বকৃষ্ণ রায়, বি. এ., কিছতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে অপূর্ব, মেয়ে কেমন দেখিল। পছন্দ হয় তো?”

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, “মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।”

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “তুই আবার কী মেয়ে দেখিল।”

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বসিয়া বসিল, ‘মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।’ অন্য জড়পদার্থ মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধ তাহার বিষম বিতর্কতার উদ্বেক হইল।

দুই-তিন দিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী

হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মন্ময়ীর মদুখখানি সুন্দর। কিন্তু, তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাহার কম্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ দুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মন্ময়ীর বাপ ইশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানি-রূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল-ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্রয়-কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্কু বাঁহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ইশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, “এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।”

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর বাধিতহৃদয় ইশান আর-কোনো আর্পত্তি না করিয়া পূর্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষাবসীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মন্ময়ীকে অহ্নির্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা-অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মন্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এক তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দৃষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছ হটিয়া বলিয়া বসিল, “আমি বিবাহ করিব না।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাসনদণ্ড সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মদুখ করিয়া কহিলেন,

“দেখো বাছা, তুমি কিছুর আর কাঁচ খুঁকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহালাপনা করিলে চলবে না।”

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বৃষ্টি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাখাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ি মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষণীগণ মন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝড় ঝড় শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, “মন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?”

মন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, “না। আমি তোমাকে কখনোই ভালোবাসব না।” তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।”

মন্ময়ী কহিল, “তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।”

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবন্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড় ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সন্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মৃদু নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এসো আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।” মন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, “না।” অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মৃদু তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “একবার দেখো কে এসেছে।” রাখাল ভূপতিত মন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবৃষ্টির ন্যায় স্ফারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মন্ময়ী মৃদু না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, “রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?” সে বিরক্তি-উচ্ছ্বাসিত স্বরে কহিল, “না।” রাখালও সর্বাধা নয় বৃষ্টিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। মন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া স্ফারের শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃত্যুরী বাপের কাছে হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাহার প্রাণপ্রতিমা মৃত্যুরীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃত্যুরী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, “আমি বাবার কাছে যাব।” শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনার তাহাকে ভৎসনা করিয়া উঠিলেন, “কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই; বলে ‘বাবার কাছে যাব’। অনাসুচি আবদার।” সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া ম্বার রুম্ব করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।”

গভীর রাতে তাহার স্বামী নির্দ্রিত হইলে ধীরে ধীরে ম্বার খুলিয়া মৃত্যুরী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতোছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাতে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃত্যুরী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক ‘রানার’ গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃত্যুরী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃত্যুরী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্ দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত কুম্ভকম্ শব্দ শুনিত পাইল। চিঠির খোলে কাঁধে করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুরী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, “কুশীগঞ্জ আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো-না।” সে কহিল, “কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানি নে।” এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃত্যুরী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, “মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জ নিয়ে যাবে?” মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “আরে কে ও! মিন্দু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।” মৃত্যুরী উচ্ছ্বাসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, “বনমালী, আমি কুশীগঞ্জ বাবার কাছে যাব, আমাকে তোমার নৌকায় নিয়ে চল।” বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছ্বলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত; সে কহিল, “বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।” মৃত্যুরী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মৃদলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্র-মাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃত্যুরীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অশ্রু পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দ্রুত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন মন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, “মা, বউকে দুই-এক দিনের জন্য একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।”

মা অপূর্বকে ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’ ভৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দসদ্-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গজনা করিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, “মন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?”

মন্ময়ী সবেগে অপূর্বের হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, “যাব।”

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, “তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পাগিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।”

মন্ময়ী অত্যন্ত সঙ্কতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তত্শ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম নৈশচার আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহাব হৃদয়ের আনন্দ-উন্মেষ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনাতিবিলম্বেই মন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুই ধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুই ধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উসারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বাহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতার কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটাই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মনুসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত চান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চোকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, “বাবা।” সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্দর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই-সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বৃদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেহানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, “বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাখিব।” অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অস্বাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্রের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল।

এমান করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল, সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নিৰ্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাখাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহীপনার সহস্র চুটি প্রদর্শন -পূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণম্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, “কাজ নাই।”

বিদায়ের দিন কন্যাকে বৃকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রু-গদগদকণ্ঠে ঈশান কহিল, “মা, তুমি শ্বশুরঘর উচ্ছ্বল করিয়া লক্ষ্যী হইয়া থাকিবে। কেহ যেন আমার মিন্দুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।”

মৃন্ময়ী কাদিতে কাদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই ম্বিগুণ নিবানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না বাহা সে কালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ,

নিম্নতম অভিমান, লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকমার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, “মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।”

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, “বউয়ের কী করবে।”

অপূর্ব কহিল, “বউ এখানেই থাক্।”

মা কহিলেন, “না বাপু, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।”  
সচরাচর মা অপূর্বকে ‘তুই’ সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্লেম্বরে কহিল, “আচ্ছা।”

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দোঁখিল, মন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষয়কণ্ঠে কহিল, “মন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?”

মন্ময়ী কহিল, “না।”

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমাকে ভালোবাস না?” এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, “রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?”

মন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, “হাঁ।”

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. -পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্যা যুবকের সূচির মতো অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সূতীক্ষ্ম ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, “আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পার না।” এই সংবাদ সম্বন্ধে মন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না।

“বোধ হয় দু-বৎসর কিম্বা তাবৎ বেশি হতে পারে।”

মন্ময়ী আদেশ করিল, “তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিন-মুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।”

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উঠিত হইয়া কহিল, “তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?”

মন্ময়ী কহিল, “হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।”

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই থেকে। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?”

মন্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু, অপূর্বের ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নির্দ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল; কহিল, “মন্ময়ী, আমার

বাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।”

মৃন্ময়ী শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, “এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ বাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?”

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, “কী।”

অপূর্ব কহিল, “তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।”

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মূখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মূখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মূখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কণ্ঠমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দসুর্বৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আশ্রাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগোরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রভূষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, “ভাবিয়া দেখলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।”

সুগম্ভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

### সন্তম পরিচ্ছেদ .

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় বাইবে, কাহার সাহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুদ্ধিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া বাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া বাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পঙ্ক-পত্রের ন্যায় আজ সেই বস্তুচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছাড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শূন্য যায়, নিপুণ অঙ্ককার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তন্মারা মানুষকে স্বেচ্ছন্দ করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখন্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং



মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুন্-গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শূন্য যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, “মা, আমাকে শব্দরবাড়ি রেখে আর।”

এ দিকে, বিদায়কালীন পত্রের বিষয় মৃন্ময়ী স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাহার মনে বড়োই বিধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী স্নানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্র তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মৃন্ময়ীর মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধুর মূখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যিক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বৃদ্ধিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমন পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই-যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন দেহনা দিতে লাগিল। প্রথম আঘাতের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চেতনের ছায়ায় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিষ্ক্ষেপ করিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, ‘আমি আমাকে বৃদ্ধিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বৃদ্ধিত না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিতাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।’

তাহার পর, অপূর্ব যৌদিন প্রভাতে পৃষ্কারিণীতীরের নিষ্ঠুর পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছুর না বলিয়া একবার কেবল তাহার মূখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পৃষ্কারিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বৃদ্ধিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মূখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরু-মরীচিকাভিমুখী ভ্রমত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুরেই তাহার

আর পিপাসা মিটল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, 'আহা, অমৃক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমৃক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'

অপূর্বর মনে এই বলিয়া স্ফোভ জ্বলিয়াছিল যে, 'মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই।' মৃন্ময়ীও আজ বাসিয়া বাসিয়া ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুদ্ধিয়া গেলেন।' অপূর্ব তাহাকে যে দূরন্ত চপল অববেচক নির্বোধ বালিকা বালিয়া জ্ঞানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারার প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বালিয়া পরিচয় পাইল না, ইহাতেই সে পরিভ্রমে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ষণ্ণদূলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বালিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না।' মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বেদ রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আর কী বলিবার আছে কিছই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আব-একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যিক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেককণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর কাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফাস মৃন্ময়ী প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাদ, অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সূচন এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেখকসমাজ নগরটুকু দাতীত্ব প্রদও যে কিছু লেখা আবশ্যিক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাশ্চ শাসুড়ি অথবা আব-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাতে দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল, অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত ভুল, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে,

মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিম্বের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।” দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, “হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাস্তুর মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌ কালে পেয়েছে।”

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, “বউমা, অপূর্ব অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?” মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া স্কার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নাড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষন্ন হইয়া, আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া, বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অন্ততন্ত্র রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, ‘মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাতে এইখানেই আহালাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।’—শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, সব ভালো তো?” মা কহিলেন, “সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।”

অপূর্ব কহিল, “সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা—” ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, এবার বুকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।”

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, “আইনের পড়াশুনা—” ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, “ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।”

ভগ্নী কহিল, “ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁকে উঠতে পারে।”

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতোছিল না। তাহার মনে হইতোছিল, সেই যখন মা কলকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া দ্রাবিড়সংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, “দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।”

দাদা কহিল, “না, বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।”

ভগ্নীপতি কহিল, “রাতে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে এক রাতি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জ্বাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।”

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্ব সে রাতি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, “দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চলো শূতে চলো।”

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, “বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব কি, দাদা।”

অপূর্ব কহিল, “না, দরকার নেই, আমি রাতে আলো রাখি নে।”

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিকণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপটে-তুল্য ওষ্ঠাধর দসদর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময়প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বৃষ্টিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাহায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারার সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন ১০০০

## সমস্যাপূরণ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিকড়াকোটোর কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের ষত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমনকি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াকড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বড়ো কর্তার কাছে রক্ষা ছিল, কিন্তু ইহঁদের কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও এক দিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন, তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনার ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছুর প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, 'এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাঞ্ছনাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না।' তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বাসিয়া এইসব জমির উপস্বস্ত ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশস্ত দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব, তাঁহার পিতা ষেরূপ নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলবে না, বরঞ্চ সেগর্দল কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতেন—এমনকি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিন-বিহারীকে পত্র লিখিলেন যে কাজটা গাঁহঁত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখলেন যে, 'পূর্বে যেমন দান করা বাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দান-প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নতুন নতুন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেণাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয়-রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম-রক্ষা করা দুর্দূহ হইয়া পড়িবে।'

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাদিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন, 'এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে, আমাদের সে কালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়টা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।'

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা-মামলা হাঙ্গামা-ফ্যাসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক-প্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জাবিবির পুত্র অহিমন্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর একটা অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন, কর্তার আমল হইতে দাস্তানিক ইহারা বহুকাল অনগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অনগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু, বিপিনের নিকট এই অনগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্ষান্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত, ইহারা যেন তাহার দয়া-দুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অহিমন্দিও উন্মত্ত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, 'প্রাণ বাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না।' উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অহিমন্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত

কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এত দিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য—জমিদারের প্রার্থনা-মত কিছুর ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছির্মন্দি কহিল, “মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুরই বোঝ না।”

মকন্দমায় অছির্মন্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মিজর্বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সক্রমণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সন্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, “তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো করুন। বাবা, অছির্মন্দি তুমি নষ্ট করিয়ে না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো— সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এক কণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না, বাপ।”

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্ভতা-বশত বৃদ্ধি তাঁহার সহিত ঘরকম্পা পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “তুমি মেয়েমানুষ, এ-সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছুর জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।”

মিজর্বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ের কিছুরই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মর্দুছিতে মর্দুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকন্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছির্মন্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু, ডাঙার বাঘের মূখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারি করিল। অছির্মন্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনা বেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছির্মন্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু, তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের খালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন

জাঠি হস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ম্বারী কলকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছির্মাদি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পদালিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনা বেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাই সে যে আমাদিগকে খাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদাবি অসহ্য। যাহা হউক, বেটা ষেরূপ বদ্‌মায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, ‘মা গো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা।’ তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহাৰাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত বৃদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ভেদে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে বাইতে হইবে। ইতিপূর্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হয় নাই, কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগাড় পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পার্লিক চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হৃদ্ধক আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বর্কন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া ‘আবশ্যক আছে’ বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছূ দূরে এক বটতলার তাহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবালি, হাতে হরিণামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্ব বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোষা এবং আট প্যান্টলুন লইয়া কণ্ঠে তাহাকে প্রণাম করিলেন।



মাথার পাগাড়াটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘাড়টি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সেগর্দলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল করিলেন, “না, আমার ষাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।”

বিপিনের অনুচরগণ কোতুহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল করিলেন, “অছিম ষাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিবে।”

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।”

কৃষ্ণগোপাল করিলেন, “সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে, বাপু।”

বিপিন ছাড়িলেন না; করিলেন, “অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই—আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এত দূর পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কান্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।”

কৃষ্ণগোপাল কিস্তিগণ চূপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে করিলেন, “লোকের কাছে যদি সমস্ত খুঁলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়া, অছিমনিদন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।”

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া করিলেন, “ষবনীর গর্ভে?”

কৃষ্ণগোপাল করিলেন, “হাঁ, বাপু।”

বিপিন অনেক ক্ষণ স্তম্ভভাবে থাকিয়া করিলেন, “সে-সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলুন।”

কৃষ্ণগোপাল করিলেন, “না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে ষাহা উচিত বোধ হয় করিয়া।” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধ-পূর্বক কম্পিত-কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু, এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা ও চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্রিস্ট শব্দক শ্বেত-ওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মর্লিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের দ্বাতা!

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার সোমসাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্প দিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বর্ণিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল

না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

সুকুম্বদ্বিষ্টি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানদ্ব করিয়াছিলেন। সে যরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এত দিনে সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। 'যিনি যত মালা জপন, পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা।' সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। বাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহত্ব সমস্তই যে কাপটা ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি-অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

## খাতা

লিখিতে শিখিয়া অর্থাৎ উমা বিষয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে— জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নীচে 'হরিদাসের গদ্যতত্ত্ব' ছিল, সেটা সম্বন্ধ করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছে— কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার নতুন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে এক-প্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে— লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ-প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনো-প্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে এক দিন একটা গদ্যরত্নের দৃষ্টিতে ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিম্বা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গদ্যরত্নের ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল ষড়্ভিত্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডন-পূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নিজের ম্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল— গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকের প্রতি বিশেষ লক্ষ করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পপার্শ্ব পেন্সিল, আদ্যোপান্ত মসীলিন্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহু-যত্নসিদ্ধিত বৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গদ্যরত্ন লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বদ্বিষ্টে না পারিয়া, ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অন্তর্ভুক্তি উমাকে তাহার লুপ্ত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইনটানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার

বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া, ঝি সঙ্গে করিয়া, যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা স্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল—পাখি সব করে রব, রাত্তি পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান—ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্ভূত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাপ্ত ও বকের গল্পটা যেখানে কাঁপ করা আছে, তাহার নীচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিম্বা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর-কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন, আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিম্বা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু, যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দৃ পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-দোষ লক্ষিত হয়। এক স্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পর-বৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন এক দিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারী-মোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাহাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্ষ হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া, ঘোমটার ক্ষুদ্র মূখখানি আবৃত করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে শব্দরবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, “বাছা, শাশুড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।”

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, “দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে; সে তেমন বাড়ি নয়। আর, প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবদার কলম চালাস নে।”

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বৃষ্টিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না; এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ

বলে, দুটি বলে, তাহা অনেক ভৎসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সে দিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু, সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

ষাশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছু দিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা ষাশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্রমিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অক্ষয়লীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহীণনার মধ্যে বালিকাম্বডাব-রোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আশ্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছু দিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছু দিন পরে ষাশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সে দিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, টিনের বাস হইতে খাতাটি বাহির করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল—ষাশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোদ্যত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে—দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তা হলে দাদার লেখা আর কখনো খরাপ করে দেব না।

শুনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে-মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি-শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে-মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রুপে জড়িত এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাটা সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল—দাদা, তোমার দুটি পায়ের পিড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

এক দিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার নন্দ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কোতূহল হইল, সে ভাবিল বউদিদি মাঝে-মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সেও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল।

তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সেও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহু কষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া লম্বায় ভয়ে বিছানায় মূখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

তা ছাড়া, বিশেষ চিন্তা স্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সুক্কু তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্য-শক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া-শিক্ষার স্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে বধেষ্ঠ ভৎসনা করিল এবং কিঞ্চৎ উপহাসও করিল; বলিল, “শামলা কর্মণ দিতে হইবে, গিন্নি কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।”

উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই, এইজন্য তাহার এখনও ততদূর রসবোধ জন্ম নাই। কিন্তু, সে মনে মনে একান্ত সংকুচিত হইয়া গেল; মনে হইল, পৃথিবী ম্বিধা হইলে তবে সে লম্বা রক্ষা করিতে পারে।

বহু দিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু, একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনি আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মূখ রাখিয়া চূপ করিয়া শুনিতোছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অর্থাৎ এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

পূরবাসী বলে, উমার মা,  
তোয় হারা তারা এল ওই।  
শুনে পাগলিনীপ্রায় অমনি রানী খায়—  
কই উমা, বলি, কই।  
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে—  
একবার আয় মা, একবার আয় মা,  
একবার আয় মা, করি কোলে।  
অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি  
অভিमानে কাঁদি রানীরে বলে—  
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।

অভিमानে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে

ডাকিয়া গৃহস্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।”

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল; “লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিস নে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।”

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বলপ্রয়োগ করিয়া সেটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল; কৃতকার্ঘ্য না হইয়া, অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, “খাতা দাও।” আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, “দাও।”

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অননয়দৃষ্টিতে স্বামীর মূখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল, প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগদ্য উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বন্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই।

প্যারীমোহনেরও সঙ্ক্ষতভুক্তকটিকিত বিবিধপ্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল, কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবাহিতৈষী কেহ ছিল না।

## অনাধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সাহিত একটি অসমসাহসিক অনুরোধ সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল “পারিব”, আর-একটি বালক বলিল “কখনোই পারিবে না”।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যিক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাখানাথ জীউর মন্দিরের আধিকারিনী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পল্লীর নিকটে এক দিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাকা সমস্তই তাহার পল্লীর অংশে পাড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধ বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মূখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাশা প্রখরবৃষ্টি স্ত্রীলোক। তাহার স্বামী বর্তমানে তাহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত নাকি বকেয়া আদায়, সীমাসবহান্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার প্রাণ হইতে কেহ তাহাকে এক কড়ি দণ্ডিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকিতে তাহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা না নাকি কান্না তাহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লীবাসী ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের স্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড় স্বভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং উল্লাসে একেবারে দণ্ড করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-সম্পদে তাহার নিয়ন্ত্রণ হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই আধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বন্ধে তাহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।



রোগীর সেবায় তিনি সিম্বহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে ষমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতৃপুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুত্রুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ব পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেনছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়-বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিন্তাও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় এক দিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদগমদৃশ্য তাঁহার কম্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পল্লীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুত্রিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধু ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা ষক্কের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র বস্তুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরান্দ দেবতা পূরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার ষক্ক ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তক্কতক্ক করিতেছে--কোথাও একটি ভুগমাত্র নাই। এক পার্শ্বে মণ্ড অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শব্দ পত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগলিশু আসিয়া মাধবীলতার বকলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল যাতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগলিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই স্কারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অঙ্গ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাশ্রয়ী হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক-কুকুটমাংস-লোলুপ ভাগিনীপতি আশ্রয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ঝরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভাগিনীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্বন্ধে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী— ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনত। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাহার স্বামী, পুত্র, তাহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিযাইছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলার দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্ন-শাখার ফুলগুর্লি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মণ্ডে আরোহণ করিল। উচ্চ শাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অর্মানি সেই প্রবল চেস্তার ভরে জীর্ণ মণ্ড সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহার ভ্রাতৃপুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মৃদু, মৃদু, সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রক্ষা করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিবন্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রী বালককে কমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মণ্ডসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সন্তরে নিকটে আসিয়া কহিল, “ঠাকুরমা, কাকাবাবু কুখার কাঁদিতেছেন, তাহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি।”

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, “না।” মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদ্রবতী কুটিরের কক্ষ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আতর্কণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দ্রবতী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটি তুমুল কলরব উঠিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, “নলিন!”

কেহ উত্তর দিল না। বৃঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, “নলিন!”

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবতী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয় তাহলে— বিধবাব সেই প্রাণাধিক যজ্ঞের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, “যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।”

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাহার রাখানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনার নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতিক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংকুণ্ড হইয়া উঠিল।

## মেঘ ও রৌদ্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বাদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্রান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে স্নান রৌদ্র ও খন্ড মেঘে মিলিয়া পরিপকপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেতের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তাল ব্লাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতার আঁকিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসাররঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উন্মোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গড়টিকতক মাটির ঘর বেষ্টিত করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গারে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্রমে ক্রমে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণহস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গড়টিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছিল। মূখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে নান্দুর্বাট তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সাহিত্য বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে 'সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত বাসন্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না'।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পূর্বাট চক্ষু কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সুতরাং অনেককাল নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্দের নিকটে অভিমানের বিশদৃশ্যতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্রমে ক্রমে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পূর্বাট মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া স্মিগ্ধ নিবিষ্টভাবে অশ্রু ল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বাট প্রকৃষ্ণিত করিয়া বিশেষ চেষ্টা-সহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসামুখে ডাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঙ্গলের মধ্যে জাম-পরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপদ্রুষ্ণের বৃষ্টিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, “কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?” গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অশ্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিতমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবাপদ্রুষ্ণের দৈনিক বরাদ্দ। কী জানি, সে কথা কিছতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্ধ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পদ্রুষ্ণটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পাড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, পদ্রুষ্ণের জলে এবং বর্ষাশ্রুত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুব পদ্রুষ্ণটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঙ্গে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গদ্রুতর এবং নিগদ্রুত প্রভেদও কিছ, কিছ, ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক, ঘরের ভিতরকার মান্দ্রুষ্ণটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দৌঁখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলো ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গদ্রুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখের তন্তুপোষের উপর রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধান নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সমস্ত আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো-একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গিরিবালা বৃষ্টিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দ্রুহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পাড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার

বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরণ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মূখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদেবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাভনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বালিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃন্দ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃন্দই বালিকার এই সকাল-বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ-দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থহীন বালিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাটকের প্রধান পাঠ উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি, তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য ম্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুভূতের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। -

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিলেই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

### ম্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম-এ বি-এল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এক কালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দূরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি, সুতরাং তাহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম-এ পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেধা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও

তাহার স্ৱারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ব্রু কুণ্ঠিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔষ্ণ্যতা বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লী-গ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্ষে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল: শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন, যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ—বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্বেই আভাসে বলা গিয়াছে, মানুষের মধ্যে তাহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইন্সকুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভঙ্গীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিবুপ কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো—সে যখন ভুল বলিত তখন তাহাব প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত তবে তাহার ভাইরা তাহাকে স্ৱিগুণ উপেক্ষান্তরে করিত, “ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—”

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালার সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, স্ৱিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যিক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহস্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালার তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে-দেওয়া রাস্তার ধারের

ছোটো বসিবার ঘরটিতে বৃক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া এই নত-পৃষ্ঠ পাঠনিবন্ধিত অশ্লুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিম্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উল্টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবাধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্‌ঝকে বাধানো বই খুলিয়া বলিল, “গিরিবালা, ছাঁব দেখবি আর।” গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্বার ভূরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেশী দূলাইয়া উর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাধানো পুস্তকসমূহের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার সত্যমত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুদ্ধিত তাহা অন্তর্ভাগীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্যহৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্‌কি বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রশ্নোত্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্রম সমালোচকের নিম্না প্রশংসা টীকা ভাষা শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্ৰাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্-এ বি-এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম্-এ বি-এল তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যিক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটিদুইচারি কথা বলিলেন যাহা তাহার কিছুমাত্র মিস্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল, শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাহার খেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে— এমন কি সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাহার বসত-বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েন্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কনস্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চণ্ডল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আশ্রয় নিকটে শঙ্কিত কোত্‌হল-সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য-শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মর্নিং আন্ডা ঘৃত দৃশ্য জোগাইতে লাগিলেন। জয়েন্ট্ সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দর-গ্রহবশত সেটা তাহার সহ্য হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুন্তা যদিচ বেশ কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাদিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সম্বন্ধ লইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান সাহেব-লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাহার মেধরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে খৈৰ্ব রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, “বোলাও নায়েবকো।”

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দর্গানাং জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টুঁমি কী কারণ-বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?”

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেধরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাহার সম্ভবে না; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুস্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আর্পিত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মৃখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সম্বাদ করিতে অতি সঙ্কর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেধর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েন্ট সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেধরকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও।” মেধর আর কালবিলাস না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে বাস্তব হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মৃমৃবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষ্যে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল; তাহারা এই ঘটনার অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাহার সর্বাপেক্ষ রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাতি তাহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হরকুমার তাহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, “সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।”

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন; শশিভূষণ কিছতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে বাস্তব হইয়াছে এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, “বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় বাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছতেই হইতে পারিবে না। তোমার

মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নিজর্নতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার নালিশ শুনিয়া তাহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, “শশীবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।”

শশীবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাহার কুণ্ডিতদ্রু ক্ষীণ দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, “আমার মকেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।”

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বদ্বিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, “অল্‌রাইট্ বাবু, দেখা ষাউক কত দূর কী হয়।”

এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফঃস্বলভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েন্ট্ সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, “তোমার নায়েব আমার ভৃত্য-দিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।”

জমিদার শশবাস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “সাহেবের মেধর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কাড়ি লাগিত।”

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, “আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দূর্বদৃষ্টি ঘটিয়াছিল।”

জমিদার কহিলেন, “তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।”

হরকুমার কহিলেন, “ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ঐ আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকদ্দমা জোটে না, সে ছোড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।”

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। বদ্বিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছুতার একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টার আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট বৃগলকে ঠান্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন, সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজ্ঞাতশ্মশ্রু অপোগন্ড অর্বাচীন উকিল তাহাকে একপ্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, রাগের মাথায় নায়েব-বাবুকে 'ডাউনবিটান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন, কখনো বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েন্ট সাহেবের ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফঃস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েব-বাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুদ্ধিতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কনগ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অস্ফালনমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারিলেন, এ সমস্তই কনগ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্নমেন্টের সহিত খির্টামিটি করিবার জন্য কনগ্রেসের কদু কদু চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল কদু কন্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারত-বর্ষীয় গবর্নমেন্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্নমেন্ট বলিয়া মনে মনে বিক্রার দিলেন। কিন্তু কনগ্রেসওয়ালারা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত কদু শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিস্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পর্দাপত্র হইতে আইন উন্মার করিতেছেন, মনে মনে বহুতায় শাপ দিতেছেন, কল্পনার সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাশ্য আদালতের লোকারণ্যাদৃশ্য এবং যুদ্ধপর্বের ভাবী পর্বাধারগুলি মনে আনিয়া কণে কণে কল্পিত ও ঘর্ষিত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাহার কদু ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফুল, কখনো ফল, মাতৃভাষ্য হইতে কোনোদিন

আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতাল-মোড়া কেতকীকেশরসুগন্ধি গৃহনির্মিত খন্নের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাহার স্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অনামনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পাড়িতেন তাহার মধ্য হইতে কোনো না কোনো অংশ গিরিবালাকে বৃদ্ধাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দৃটো কথাও ছিল না। তা না থাক্, তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গুরুদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সদর করিয়া, বানান করিয়া, বৈশী-সমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দূর্বোধ পাতা দৃষ্ট মানুষের মূখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোর চুরি করিয়া লইয়া যাইত তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোনো আবশ্যিক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই-একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরুদগৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে-অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিম্বস্থিনীস সিসিরো বাক্, শেরিডন প্রভৃতি বাস্মীগণ বাক্যবলে যে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন—যেদ্রুপ শব্দভেদী শর-বর্ষণে অন্যান্যকে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্চিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বদর্শিত উন্মত্ত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লঙ্কিত ও অন্তস্ত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতে-ছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাহাদের দেবচক্র অপ্রদীপ্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সেদিন গিরিবালা তাহার দৃষ্টপথে পাড়িল না; সেদিন বালিকার অন্তরে জ্বালা ছিল না; পূর্বে একবার জ্বালায় আঁট ধরা পাড়িয়া অর্থাৎ ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, “গিরি, আজ জ্বালা নেই?” সে সেটাকে গুরু উপহাস জ্ঞান করিয়া সঙ্কোচে

“যাঃও” বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “স্বর্ণ ভাই, তুই যাস্ নে, আমি এখনি যাচ্ছি।”

পদ্রুপ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা-নামক কোনো দূরবার্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হার, অর্থ পদ্রুপের প্রতি সে লক্ষ্য দ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে শূন্যে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাহার অধ্যবসার ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর সম্বান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাঙ্ক্ষনিক হউক, তাহাকে “এখনি যাচ্ছি” আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেইরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভ্রুনাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারু-পাঠখানি খুন্ড খুন্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনোমতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভূষণের স্মারকের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, শ্বিতীয়বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জ্বল হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ ভীত অনুভূতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সাম্বনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভূষণের দোষে বিশ্বাস্তাশিকা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজেই প্রতি করুণরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন-সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরার ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মালিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেবদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নিবাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃত-ভাবে ধূলিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভূষণ যোদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বৃষ্টিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয়দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আদ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিন্দু একটা সূচসূতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া স্নানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্তী পথে মধ্য মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান হ্রা এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, হতবৃষ্টি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাহার পাঠাগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল, গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালার আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাঠ স্থির হইয়াছে।

গিরি যোদিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ড গ্রামের পাব্কেল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় শীঘ্র হওরাতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার

ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাচ্ছিস?” গিরি কহিল, “শশিদাদার বাড়ি।” হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, “শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা।” এই বলিয়া আসন্নশব্দর গৃহবাস-বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লঙ্কার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব কেয়াখয়ের এবং জারক নেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেল্লারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্থলিত পক্ষীচঞ্চুকত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাজ্জ্বল হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যোদিন সনাই বাজিতেছিল সেদিন অনির্মিত্ত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকম্মা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাম্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাহার অপমানবস্তান্ত ক্রমশ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলস্ক সংকোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্ৰোশের সঞ্চার হইল। শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দূরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিজ্ঞতায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাহার হৃদয়কে বেঁধে রাখিয়া ধরিয়ছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বাকছড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাপে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্মিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অভিশয় বেগে বাহিতেছিল, সেইজন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমনসময় নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি নতুন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ ভুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নতুন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্পসংখ্যক যাত্রী



ছিল। বাহাদুরদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতে কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অটুকলম্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়িয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহের ভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাত-দুয়েক ছাড়িয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মূহুর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দ্বিতীয় পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির স্ফোরক চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুলিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রাসিকতা-টুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং ধারণা ছিল, বাহাদুরের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পার্শ্ব ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লারঙ্গকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রক্ষণের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত গন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহস্তরের মতো, তোল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উদ্ভাস নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে বাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তি বিধান না করিলে অন্তর্ধানী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দণ্ড করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লক্ষ্য বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে

পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লাই রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাঝি বাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকার পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পদূলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, “নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না।” প্রথমত, পদূলিসকে দর্শনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারানন্দ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে ঘুরিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফললাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক বাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, “মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ-ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ ঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিলেও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।”

দেশের লোককে আন্তরিক দিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চলাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতোছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা হইয়াছিল। স্টিমার তখন পূর্ণবেগে চলিতোছিল এবং সেই মূহুর্তেই নদীর বাঁকের অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক ‘ডাউট’ রাগ’ অর্থাৎ মরিল বন্দুকের উপর সিকিৎসার দায়েরও ছিটানুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খল্লাস পাইয়া ম্যানেজার-সাহেব চুরট ফুকিতে ফুকিতে ক্লাবে হুইস্ট্ খেলিতে গেল, যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিন্তনহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে স্বন্দুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধু নর্তিশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মূখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র বিক্

ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আশ্রয়স্থানে একটা পাঁপিয়া উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে মদমদমদম গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানোকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শব্দরালয়যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মদুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! “শশীদাদা!”— কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না— তাহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া, তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উদ্ভাস যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্ভাস উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই-সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুলবতী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিহ্ন বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাসাময় ছিল, অনতি-বিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষন্ন এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবোঁচত মলিন পিঙ্কল সংকীর্ণ গোস্টপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া কব্জলনেত্র সহস্রভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মর্কবিষয়মুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ার বাসিয়া তামাক খাইতেছে, নিত্যন্ত কাজের দয় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জুতা হস্তে, ছাতি মাথায়, বাহির হইতেছে— অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাশ্লাবিত বাংলাদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে

লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়বার দিকে একটু বিশেষ ঝোক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মধ্যে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পার্শ্ব নৌকা-চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলের পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট-বাহাদুরের শূভাগমন হইয়াছে। তাহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যচিত্ত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়িয়া লইতে হইল।

পুলিস-সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর জাল কাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কনস্টেবল পলাতক জেলে চারিটির সম্মান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জেড়-হস্ত কাঁকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিশ-বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন-সময় চশমা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্ চট্ করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে পুলিশের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পতন্ত্রে কহিলেন, “সার, জেলের জাল ছিঁড়বার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করবার তোমার কোনো অধিকার নাই।”

পুলিসের বড়ো কর্তা তাহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পংগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি তাহা জানেন না। পুলিশের খানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, ষেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অপবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

## নবম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

ষে-সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুর্লিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সর্পনা ধরাইয়া এ কী মর্শকিল! সকলে বলিল, “ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিলে!”

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেণে কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুর্লিস-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, “নায়েববাবু, শুনিতোছি তোমার প্রজারা পুর্লিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।”

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, “হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্রজন্তু-জাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!”

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুর্লিস-সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম খাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাহার দেশস্থ গুঁড়িচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুর্লিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায় যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন, তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ—আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুর্লিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি সব কটাই তাহার বিরুদ্ধে পূরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাহার প্রিয় পাঠাগ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন। তাহার বাপ আপিল করিতে উদাত্ত হইলে শশিভূষণ যাক্সবার নিবেদন করিলেন: কহিলেন, “জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে

না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদেরকে প্রভাষণ করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সংস্কারের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি।”

### দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল। তাহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্ট্রাল প্রতিষ্টেস কাজ করিতেন, দেশে আসা তাহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কর্তনিকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাহার আর-কেহ অথবা আর-কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎসংসার অত্যন্ত টিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম শশিভূষণ বাবু?”

তিনি কহিলেন, “হাঁ।”

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাহার প্রবেশের প্রতীকার দাঁড়াইল।

তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে কোথায় বাইতে হইবে।”

সে কহিল, “আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।”

পাখিকদের কৌতূহলদৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাসনাবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে—নাহয় এমনি করিয়া জম দিরাই এই নতুন জীবনের ভূমিকার আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদ্রবর্তী মন্দির দোকানে একদল ঠিকক গুপিবন্দ ও খোল করতাল-বোনে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো!

আমার কুখিত ভূখিত ভূখিত চিত,

বৃন্দ হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্নসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এসো হে!

আমার করুণ কোমল, এসো!

ওগো সজলজলদাম্নিন্দুকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অক্ষুটতর হইয়া আসিল, আর বৃদ্ধা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শিশুভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গদগদ করিয়া, পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছতে যেন ধামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ, ফিরে এসো!

আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!

আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো!

আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো!

আমার চিতসঞ্চিত, এসো!

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন,

ভুজ -বন্ধনে ফিরে এসো!

আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!

আমার মূখের হাসিতে এসো হে

আমার চোখের সলিলে এসো!

আমার আদরে, আমার ছলনে,

আমার অভিমানে ফিরে এসো!

আমার সর্বস্মরণে এসো

আমার সর্বভরমে এসো—

আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শিশুভূষণের গান ধামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভূতোর নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন, সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাহার পুরাতন জীবন শ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহস্বারের মতো তাহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টোবলের উপরেও কী কতকগুলি ছিল। শিশুভূষণ তাহার ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া ঝড়িয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ স্লেট, তাহার উপরে গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

স্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শিশুভূষণের হস্তাকরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া

লেখা—গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বরাবরে পারিলেন। তাহার বন্ধের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মৃত্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন—সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই স্নেহের জীবন কিছই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র স্নেহে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাহার নিজের অধ্যয়ন-কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র স্নেহ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বাহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীত রূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কম্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষামলান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল। সেই জগলে বেষ্টিত, কদম্বাক্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যাখিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরাচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপূর্ব অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লী-বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বাহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূলসমিষ্টাংশ রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শব্দবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভ্রূনশরীর শশিভূষণের দিকে সক্রমণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া, দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না; নিরুদ্ভ অশ্রুবাম্প তাহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের স্ফারে বন্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের মল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—এসো এসো হে!



## প্রায়শ্চিত্ত

### প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। যাহারা মহৎ কাৰ্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাহারা ধন্য হইয়াছেন, যাহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কৰ্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাহারাও ধন্য; কিন্তু যাহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাহারা একটা-কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাহাদের পক্ষে কিছু-একটা হওয়া সৰ্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকাৰ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকাৰ্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্টমেন্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাহার কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিম্ব্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপ গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিম্ব্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্ভের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ভ পাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিম্ব্যবাসিনী সৰ্বদাই সর্গাঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অপ্রভেদী অটল ভক্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাহাকে মৃত মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিতচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে উর্ধ্ব তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এইজন্য বিম্ব্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার

সময় আসিল, পরীক্ষা দিলেন না, এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্বসাধারণের সমক্ষে বিশ্বাস্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।  
রায়ে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, “পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।”

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, “পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি।  
আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!”

বিশ্বাস্যবাসিনী সান্দ্রনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে পরীক্ষায় পাস  
করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কী আর বাড়বে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিশ্বাস্যবাসিনীকে আনন্দ-সহকারে খবর দিতে আসিল  
যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে। শুনিয়া  
বিশ্বাস্যবাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশ্বাস্যবাসিনীকে আনন্দ নহে, ইহার  
মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গৃঢ় শ্লেষ আছে। এইজন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস  
প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ বগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল যে, এল্-এ  
পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মতোই গণ্য নহে; এমন কি বিলাতের কোনো কালেজে বি-এর  
নীচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহুল্য, এ-সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিশ্বাস্যবাসিনীর নিকট  
হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরমপ্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে  
এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু, সেও নাকি স্ত্রীজাতীর  
মনুষ্য, এইজন্য মূহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বাস্যবাসিনীর মনের ভাব বদলিতে পারিল এবং  
ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীর বিষ সঞ্চারিত হইল; সে  
বলিল, “আমরা তো ভাই, বিলাতও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অত  
খবর কোথায় পাইব। মূর্খ মেয়েমানুষ মোটামুটি এই বদলি যে, বাঙালির ছেলেকে  
কালেজে এল্-এ দিতে হয়; তাও তো ভাই, সকলে পারে না।” অত্যন্ত নিরীহ সূক্ষ্ম  
এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল, কলহবিমুখ বিশ্বাস্যবাসিনী  
সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দ্রুত ধনী কুটুম্ব কয়েককালের  
জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বাস্যবাসিনীর পিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে  
তাহার পিতা রাজকুমারবাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাইবাবু  
শাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ  
সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে মামাবাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য  
আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্ত্রীর নিকটে  
গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া স্বশ্রুতের উপর প্রতিশোধ  
তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের  
উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বাস্যবাসিনী নিরীহায় লজ্জিত হইল। তাহার মনে  
যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বদলি, এরূপ স্থলে সর্বসমক্ষে  
অভিমান প্রকাশ করার মতো লজ্জাকর আত্মবিস্ময়না আর কিছুই নাই। হাতে পারে  
ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে কান্ত করিয়া রাখিল।

বিশ্বাস্যবাসিনীকে অবিবেচক ছিল না, এইজন্য সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ

করিল না; সে বদ্বিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, “আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চलो; আমি আর এখানে থাকিব না।”

অনাথবন্ধুর মনে অহংকার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাহার অভির্দা হইল না। তখন তাহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, “তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।”

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহাদের মন্দিরনির্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমারবাবু এবং তাহার স্ত্রী কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীরমুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাত-সারে বোধ করি কোনোরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমারবাবু ব্যথিত-চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে।”

বিন্দ্যবাসিনী তাহার পিতার মূখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, “এক মৃহুতের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।” বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুপূর্ণনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন অজন্মকালের স্নেহ-মন্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনী-গণকে ছাড়িয়া বিন্দ্যবাসিনী পালাকিতে আরোহণ করিল।

### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্দ্যবাসিনী এক দিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্দ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়ো-মানুষের ঘরের দাসী প্রতি মৃহুতের মনে মনে নাসাগ্র আকৃষ্ট করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ি স্নেহবশত বিন্দ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিন্দ্য নিরলস-অশ্রান্ত-ভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশুড়ির হৃদয়

অধিকার করিয়া লইল, এবং পঞ্জীরমণীগণ তাহার গুণে মদুন্দ হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ-প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদুর্পাপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিত-মত বিশুদ্ধ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপণ্যশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুইটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব, কিন্তু বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন, যেন তিনি কেবলমাত্র তাহার উপার্জনকর্ম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিশ্বাবাসিনী যখন স্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশ ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সংকীর্ণ অন্তঃকরণটুকু কে যেন কবিতা আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজোবউ বড়ো ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাহাকে লোকের চক্ষু অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এ দিকে অনাথবন্ধু পঞ্জীতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দর্শনবিজ্ঞান স্কুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া স্বরের কাগজে টোলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে এক পরমা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিশ্বাবাসিনী তাহাকে সর্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে, কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্নমেন্ট সে-সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাহার দেবর এবং মেঝো জার প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আশ্ফলন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমরা গরিব মানুষ, বড়ো মানুষের মেয়ে এবং বড়ো মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে।”

শাশুড়ি বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত

এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছুটিতে কিছু দিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাতেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, “তোমার একটা চাকরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।”

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মৃষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের 'পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে, কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড়ো লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্ষাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমনসময় গ্রামের এন্ট্রেন্স-স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্মপত্নী 'ষে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের সমস্ত কলকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠান্ডা করিলেন। সকলেই মনে কবিলেন, ইহাকে আর কোনো কথ' বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টিকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী বৃদ্ধ আক্রোশে মূর্খখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ করিয়া রাখিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, “আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।”

এক তো বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহংকারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বদ্বিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমন করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল; অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাবু বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার

অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিশ্বাসিনীও অনেক কাল পরে মাথার অবগুষ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশ স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সন্তমীপূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজননে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাতে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিশ্বাসিনী শয়ন করিল। পূর্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিশ্বাসিনী জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে সানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্রান্তদেহ বিশ্বাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিশ্বাসিনীর শয়নস্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈশ্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিশ্বাসিনী এড় এড় জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার স্নানার্থে সিঁদুক খোলা এবং তাহার বাপের যে ক্যান্ডিবার্টি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো-একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনো-রূপ আঘাত করিয়া থাকে। বুকটা ধড়াস করিয়া ভীতিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পারের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোছার নীচে একটি চিঠি চাপা রাখিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো-এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার জন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গত রাত্রে স্বপ্নের অর্থ অপহরণ করিয়া, বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের গালাগানে নামিয়া, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদাই প্রতীক্বে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিশ্বাসিনীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুঁড়ি ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কণকুহরের মধ্যে নিস্তম্ভ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে, বহুতর সানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

শরভের উৎসবহাসারাজিত রৌদ্র সকোড়কে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে স্নান রন্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞ্চৎ ভীত হইয়া উর্ধ্বকণ্ঠে “বিদ্দি” “বিদ্দি” করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিশ্বাসিনী ভয়ঙ্করকণ্ঠে কহিল, “বাজি; তোরা এখন যা।”

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, “বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনও ম্বার বন্ধ কেন!”

বিন্দু উচ্ছ্বাসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, “একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।”

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারবাবুকে সঙ্গে করিয়া ম্বারে আসিলেন। বিন্দু ম্বার খুলিয়া তাহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্দু ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বন্ধ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিঁদুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।”

তাহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্দু বলিল, তাহার ম্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।”

বিন্দুবাসিনী কহিল, “পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।”

রাজকুমারবাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্দু বাপের কাছে কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী ম্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীর নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃ-সম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধুলির মতো লুপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্বক চাঁবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ-অপহরণ-পূর্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কূটম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। ম্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন কমল এবং আরও অনেক ম্বজন প্রতিবেশী দাসদাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুম্বম্বাব জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহীণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কোতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্দুবাসিনী কাহাকেও মৃখ দেখাইল না। ম্বার রুম্ব করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্টবৃন্দিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্দুর চরিত্র এতদিন অবসরা-ভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিম্বা শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পার্তিবিরহবিধুরা বধুরে ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সাহসুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্যগুলা পৰ্বন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিম্বা মনে মনে অনুভব করিল, “শাশুড়ি দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বন্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যশালী, তাহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে।” একে দরিদ্র বলিয়া বিম্বা তাহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্তী, তাহাতে আবার চূরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে।

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু, ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবৃদ্ধি রূপগুণ সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য সুবৃদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত। এমন অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্র-পরিহিতা অবগুষ্ঠনবর্তী অগোরবর্ণা স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু তথাপি, যখন অর্থের অনটন হইল তখন এই নিরুপায় বাঙালির মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চূড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেঁচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগায়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্ৰণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষ্যে বিম্বাবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চূড়ি, বেনারাসি শাড়ি এবং শাল পৰ্বন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্বক মাথার দিয়া দিয়া অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষরপংক্তি বিকৃত করিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া, কোট্‌প্যান্ট্‌লুন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব—প্রথমত উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়ত পঞ্জীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু, তাহারাও জাতি-চাতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেলে বাসার নামিতে হইল। সে বাসার তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন-দুই-তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকাতর্গা রমণীর কেবল এক সাল্কনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়-



বর্গের নিকটবর্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্দ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া খিকার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিত হইল। স্নেহ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, “আজকাল ডের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না— একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!”

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল—যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিযন্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষা-বশত তাহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে—যখন তাহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভিজ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্ণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মূখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল—যখন সূতীর নিখাদে-বাধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সক্রমণ করিডুমধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল—এমন সময় রাজকুমারবাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমারবাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার স্টিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র -সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্দ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কর্থাণ্ড উপশম হইলে পর রাজকুমারবাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, “বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।”

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে-সকল বার-লাইব্রেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাহাকে ঈর্ষা করে এবং তাহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমারবাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাহা বা বাঁচিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র ম্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয়বন্ধুদের নিকট কহিলেন, “সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মূখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। সে রসনা গোব্দ খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা -নামক দুটো কদর্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাই না।”

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শর্তদিন নির্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধর্মত্যাগের পরিচয় তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দুসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন।

যে শুনিল সকলেই খুশি হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্বে বিশ্বাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্বত্র উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, “বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতি সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো থাকে না। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন, বরণ তাহার হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।”

যথানির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণপাণ্ডিতে রাজকুমারবাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র শ্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নির্মালিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংকুশ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিশ্বাসিনী প্রফুল্লমুখে শারদরৌদ্ররাজিত প্রভাত-বায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেন। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটীমাত্র বঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা-উদ্ঘাটন-পূর্বক একমাত্র অনাথবন্দুকে বিস্মিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রারম্ভ যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিশ্বাসিনীর প্রেমপ্রদীত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাভ্যাসিত বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্রুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে উন্নতমস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্দু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণ-গণ তাহার সহিত একাসনে বসিয়া ভূমিতপূর্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্বাচিন্তে তাম্বুল চর্চন করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলসাম্পন্নগমনে ভূমি-নুষ্ঠানমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইতাবসরে তাহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহ-সহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্তা রাজকুমারবাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষ্যে সেই কোলাহলাকুল পাণ্ডিত্যসভায় বসিয়া শ্রুতির তর্ক শুনিতেন, এমনসময় স্মারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া থক দিল, “এক সাহেবলোগ্কা মেম আয়া।”

রাজকুমারবাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্দু সরকার। অর্থাৎ, অনাথবন্দু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমারবাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদাঃপ্রত্যাগতা আরক্ত-কপালা আভাঙ্কুলতা আনীললোচনা দৃশ্যফেনশূভ্রা হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা

স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক খামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুষ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্তরগামী অনাথবন্দু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মদহুতের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মর্দিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

## বিচারক

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা কীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন অন্নমর্দার জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত দিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শূদ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পার্শ্বের সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাধা একপ্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালো-মন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুর্হাকনী দুরাশার কম্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মূর্খদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিসর্জন হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মূর্খে চক্রে যেন ক্ষুদ্রতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বণ্ডনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া— যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাড়া শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রাখিয়াছে, তাহাদিগকে বৃকের কাছে টানিয়া লইয়া— সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত চির-পরিচরিতগণের প্রতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিভূত লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়ান্ধ জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঙ্গ, নূতন পরিচর, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়— তখনও যাহার বিশ্বাসের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সম্মাদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় নাই— সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

কীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রি তাহার সমস্ত অসংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঙ্গ হয় নাই— তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুঃখ মানিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই— যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আর্টগিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই— যখন তাহার মনে পড়িল, আমার আজ অশ্রুজল মর্ছিয়া দুই চক্রে অজ্ঞান পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অশঙ্করাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনার আচ্ছন্ন করিয়া অসামুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নূতন হৃদয়-হরণের জন্য নূতন মারাপাশ বিস্তার

করিতে হইবে—তখন সে ঘরের স্কার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল—সমস্ত দিন অনাহারে মদুম্বুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া “ক্ষীরো” “ক্ষীরো” শব্দে স্কারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ স্কার খুলিয়া ঝাটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসা যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভ্রুকাতর কণ্ঠে “মা” “মা” করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাটুটরি সার্ভিলিয়ান। তাহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দুনাহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপর দিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার আন্তরিক অ বিশ্বাস। তাহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মূন্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষরধারে গুম্ফমশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায়, গোফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনিবিংশ শতাব্দীর নতুনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষ্ঠানিক আরও দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা

ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চোন্দ্র হইতে পনেরোর পাঁড়বে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীর ম্বন্দবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেটন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পাঁড়িয়াছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবতী পরমরহস্যময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারবাঠা কলনাদিনী নিৰ্ঝরিতরীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবতী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং ভূমিতহীন আকাশকা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবতী স্পন্দিত পরিতস্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বাসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হৃদয়হিম্মোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপঙ্খের কোমল পাপাড়-গুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল-সকাল খাইয়া ইন্ধুলে ঘাইত, আবার ইন্ধুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইন্ধুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাছের অবসরে হেম তাহার নিৰ্জন ঘরে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালার করুণ উচ্ছ্বরে হাঁকিয়া ঘাইত, তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষকেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওয়ালারা বে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের সুখরঞ্জিতভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোন্মত্ত স্ফীতবক্ষ মহাহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশসুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া ঘাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুস করিয়া খেলা করে, বিধবা তের্মনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমার মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গাড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নৃপদূরনিরূপ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মূর্ছরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চম্পল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিন্দু সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পাঁড়িত হৃদপিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্রম প্রমোদমদিরোচ্ছ্বাসিত

কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাতে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গাড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপদতলিকাকে সেই মায়াপদুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেই নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তম্ভ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না, তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্ত, শ্লানি, পীড়িত, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিষবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াম্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গাড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মৃগ্ম বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকীর্ণিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বাসিত হৃদয়বেগ-পূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পবে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিষবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাতে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্ব আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল; বলিল, “ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমাব বাড়ি রেখে এসো।” মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মূখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মূহুর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইক্ষুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের

সহিত পান সাজিতে বাসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাধা, পিতার আহার-স্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাখ্যা সহ্য করা—এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বৃষ্টিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুস্থিত্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্ততঃ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বৃষ্টিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে, তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; সক্রম অনুনয়-সহকারে বলিতে লাগিল, “এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।” কিন্তু, তাহার দেবতা কণপাত করিল না, এক ম্বিতীয় শ্রেণীর চক্ৰশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি ম্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়াইয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমগ্নিত হইয়া রহিল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একঘেয়ে হইয়া উঠে এইজন্য অনাগর্ভ বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখি, এমন কোনো লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শূন্যচারী হইয়াছেন, তিনি আত্মকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলোদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্গণের দৃশ্যপ্রবেশা অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।



ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তিরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অন্ততঃ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহার কোতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্মিকট, তবু ঝগড়া করিতে ছাড়বে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভৎসনা ও উপদেশ দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অন্ততাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সক্রোধস্বরে করজোড়ে কহিল, “ওগো জজ্বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।”

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাণ্ডে আরোহণ করিলে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

প্রহরীকে কহিলেন, “কই, আংটি দেখি।”—প্রহরী তাহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতের দাঁতের উপর তেলের রঙে অঁকা একটি গম্ফস্মপ্রদর্শিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ের খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চম্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজ্জল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশীর্ণিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাহার সম্মুখে কলম্বিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীরকের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উজ্জাসিত হইয়া উঠিল।

## নিশীথে

“ডাক্তার! ডাক্তার!”

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাতে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিশ্বাসভাবে তাঁহার মূখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, “আজ রাতে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।”

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, “আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।”

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।”

কুলদীপার মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় স্থানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাল্লের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাতিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দুর ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মূহূর্তের মধ্যে অপদম্ব হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠরূপ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জ্বাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টকমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহনির্নিশ এক মূহূর্তের জন্য বিপ্রায় করেন নাই।

সেই কটা দিন একাট অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, স্মারে সমাগত যমদুতগদুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বন্ধের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল ধাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অন্যতকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, “আঃ করো কী! লোকে বলবে কী! অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ে না।”

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাতে যদি তাহাকে তাহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাহার শূশ্রূষা-উপলক্ষ্যে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, “পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।”

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অর্কিগণ্ডকর উদ্ভিদের পার্শ্ব কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকান্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাহার বসবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পার্শ্ব বাবুদা তাহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, “ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।”

আমি তাহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রক্ষুদ্র বকুল ফুল ঝাঁপিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে

ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাহার শীর্ণ মূখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তত্শ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়াঙ্ককারে এক পার্শ্ব নীরবে বসিয়া তাহার মূখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছে গাড়া আসিয়া দুই হস্তে তাহার একটা উত্তম শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চূপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, “তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।”

তখন বুকিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাহার সেই হাসির স্ফারা জানাইলেন, “কোনো কালে ভুলিব না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।”

ঐ সন্মিষ্টে সন্তীক্ষ্ম হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসংক্ষেপে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাহার সম্মুখে গেলেই সেগুলোকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলো মূখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্বেক করে, এ পর্যন্ত বুকিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চূপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্না-রাত্রিও কি পিকবধ্ বধিব হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, “একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।” আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাদ হঠাৎ থমকিয়া চূপ করিলেন। সন্দেহভাবে আমার মূখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতেব মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চূপ করিয়া রহিলাম। কুলদীপ্তিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তত্শ ঘরে মশার ডন্ ডন্ শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুকিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুকিলেন যে, তাহার ব্যামো সারিবার নহে। তাহাকে চিররুগ্ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, “যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবনমৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।”

এটা যেন কেবল একটা স্দৃষ্টি এবং স্দর্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছ্ আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, “যতদিন এই দেহে জীবন আছে—”

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, “নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!”

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, “এ জীবনে আর কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।”

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্রান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বদ্বিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্ষে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্ষে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্গকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়া-ছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, স্দুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন স্দর্দীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাকরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বদ্বিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন স্দগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্ধামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন স্দরূপ তেমন স্দশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ এক-দিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তুফা যখন বৃক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে ক্লপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে ম্বিগদুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শব্দপ্রবাহ করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, “ডাক্তার, কতকগুলো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ঔষধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।”

ডাক্তার বলিলেন, “ছি, এমন কথা বলিবেন না।”

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, “এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাতে তোমার ক্ষুধা হইবে না।”

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসন্তোরের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যিক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, “আমাকে একপ্লাস জল আনিয়া দাও।” জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলার আমাদের বাসার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তত্ব হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মৃগ্ণি বন্ধ হইতে থাকে এবং মূর্খ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাহার ছিল না, কিম্বা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা ম্বায়ের পার্শ্বে ছিল। ঘর

অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিণ্ণ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শূন্যে বাইতৈছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কে!”—তাহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অক্ষুণ্ণভাবে প্রশ্ন করিলেন, “ও কে! ও কে গো!”

আমার কেমন দুর্বল হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেললাম, “আমি চিনি না।” বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বললাম, “ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!”

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, “আপনি আসুন।” আমাকে বলিলেন, “আলোটা ধরো।”

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমনসময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, “এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।”

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ওষুধ দুটি শযাপাশবর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, “বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে।”

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, “না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, “উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।”

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্বেগ করিতেছেন এমনসময় আমার স্ত্রী বলিলেন, “ডাক্তারবাবু, ইনি এই বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?”

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, “আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।”

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ওষুধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছটফট করিতেছেন। অনুতাপে বিম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

“তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।”

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মূখের দিকে চাহিলেন। তখন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাতেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?”

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি ভুল করিয়া এই ঔষধটা খাইয়াছেন।”

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, “হাঁ।”

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমুছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ধনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “শোক করয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।”

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

নিষ্কাশন আর-একবার জ্বল খাইয়া বলিলেন, “উঃ, বড়ো গরম!” বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দার পায়েচারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোকা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি কেন জ্বালা করিয়া তাহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আমার কথায় বলিতাম, প্রেমালোপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। হুম্‌হুমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসার ডানা কাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনহারাভূত কাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শূন্য পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।



সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষ্যুত নিঃশব্দতার নিম্ন-প্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়ে দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সাহিয়া আসিল তখন বনছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অশ্চিত সেই শিথিল-অণ্ডল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমনসময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপঙ্কের জ্বীর্ণপ্রান্ত হলদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, “মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।”

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মনুহুতেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপঙ্কের পীতবর্ণ ভঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সূদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হা-হা-হা-হা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তন্দ্রেন্দেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।”

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, “শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হা-হা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?”

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, “সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অস্পষ্ট ভয় পাও?”

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির কাঁক উড়বার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহারণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের বৃন্দ্র স্বপ্ন অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মার আসিয়া পৌঁছলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভূজাঙ্গনীর মতো কৃশনিজীবভাবে সুদীর্ঘ শীত-নিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য ভূগশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধু ধু করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘূমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি বদ্প্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপঙ্কের নির্মল চন্দ্রলোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুদ্ধ বালির চরের উপর যখন অজস্র অব্যাহত উচ্ছ্বাসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টিত করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুদ্ধতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অন্তিম কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পূর্লকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যার। এইরূপ অনাবৃত অব্যাহত অনন্ত আকাশ নাহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, স্মার নাই, কোথাও ফিরবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেই-খানে জল বাঁধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গা নিষ্প্রান্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, “ও কে। ও কে। ও কে।”

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বদ্বিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাতে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই ভাড়াভাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাতে

বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সদৃশ মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চূপিচূপি অক্ষুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “ও কে। ও কে। ও কে গো।”

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বলাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মূহুর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাণ শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হা—হা—হা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সদৃশ দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমূর্ত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল; ক্রমে তাহা যেন সুচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল; এত ক্ষীণ শব্দ কখনও শ্রুতি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিস্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অর্থাৎ আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অপরূপ স্বর বলিয়া উঠিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো।” আমার বৃকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।” সেই গভীর রাতে নিস্তম্ভ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘাড়টাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।”

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাদ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, “একটু জল খান।”

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোরেল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মাহিষের গাড়ির কাঁচ্ কাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাদের মূখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কার্পনিক শব্দের মস্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাতে আবার আমার ম্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, “ডাক্তার! ডাক্তার!”

## আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ঝমণ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌ঝিক্‌তে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এ পারে ও পারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝটপট্ করিয়া হাহুতাশসহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রী-পুত্রদ্বয়ে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরৎবাবু বলিতেছিলেন, “আর কিছুদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।”

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, “আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।”

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বৃষ্টিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দ্রুত নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, “ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।”

কিরণ কহিলেন, “তোমার ডাক্তার তো সব জানে!”

শরৎ কহিলেন, “জান তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।”

কিরণ কহিলেন, “এখানে এখন বৃষ্টি কোথাও কাহারও কোনো ব্যামো হয় না!”

পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল, এবং ডাক্তার যখন বার্দপরিবর্তনের প্রস্তাব করিল তখন গৃহ এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে বাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোনো আশঙ্কি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বার্দপরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ট্রেশনার একটা নির্লক্ষ্য আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুসরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানে অদ্ভুতের লিপি সফল হয় নাই—তথাপি শরৎ এবং তাহার মা সে-সকল কথা কণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়বক্তির বিপদে মানুসের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত

হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাহার মূখে চক্ষে একটি সক্রম কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সর্গাপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ণ শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘন্টায় ঘন্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্যপালন করো—ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুম্মগৃহে স্বামীস্বীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে সন্দেহযুগ্ম চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া ম্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকাডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণবালক সাতার দিয়া তাহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান-অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শঙ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবারিট দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্তী সিংহবাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহৃত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা নতুন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে পুণ্যসম্বরের প্রত্যাশায় শাস্তিও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও সমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাহার মাতার মত-পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যিক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড় ফড় শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাহার শখের সিলেকের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্দুসম্বরচেষ্টার পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য

কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহৃত শরতের সুসম্ভ্রত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শূভগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মৃদিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তিশিল্প-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আশ্রয়কাননে কাঁচ আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলোটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মেজা এবং নতুন ধূতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাদু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন-তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাহার স্নেহ এবং কোতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাহার ভিজে এলো চুল চিরিয়া-চিরিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পলা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অন্ত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অন্ত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক-একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন, কিন্তু অবিলম্বে তাহার চিরন্তন মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাহাকে শয্যাশয়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থলবিভাগেব ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চৌদ্দ-পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মূখ্য অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পক ধরে নাই। হয় সে অকালপক, নয় সে অকাল-অপক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা দময়ন্তী সীতা এবং বিদ্যার সখী সম্ভ্রিত। অধিকারীর অবশ্যক-মত বিধাতার বরে খানিক দূর পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড়ি থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকে সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বভাবিক এবং অস্বভাবিক কারণপ্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক সতেরোর অপেক্ষা অতি-পরিপক চৌদ্দর মতো দেখাইত। গোফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ভামাকের খোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সানুচিত ভাষা-প্রয়োগ-বশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছ্র বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তরলবিশিষ্ট দুইটি চক্কুর মধ্যে একটা সারলা এবং তারুণ্য ছিল। অনমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পকতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়োই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকরুনের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোনো কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যান্যনস্ক পাখি কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ 'বই পড়িতেছি' মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগোরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্‌ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত

ওরে রাজহংস, জন্মি ম্বিজবংশে

এমন নৃশংস কেন হাঁল রে—

বল্‌ কী জনো, এ অরণ্যে,

রাজকন্যার প্রাণসংশয় করিল রে—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারি দিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপূর্ণ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া তুলিয়া যাইত। নিতান্ত

অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মালিন শিশু যখন সম্মাণস্যার শইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাত-রাজার-ধন মানিকের কথা শোনে তখন সেই কীর্ণদীপালোকিত জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলোট আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত—জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পদ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী-এক মায়ামন্তবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কষাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা-কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুশি হইলেন, তাহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাদির লিখিয়া রাখেন, কখনও কনাৎ করিয়া বাহির হইতে স্ফার রুদ্ধ করিয়া সুদলিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাঠ নহে; সে তাহার চাবি চুরি করিয়া, তাহার পানের মধ্যে লস্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পার না, অথচ তাহার মন তীর তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছাড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাজেঁদন করিয়া চলিতে লাগিল।

বাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ বাধ হইত না। এইজন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণবালকের তৃপ্তি-পূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্বে এরূপ ঘটনার তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুস্থ খাইয়া তবে উঠিত। কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে



ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মূখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাস্পরম্বকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত “আমার ক্ষুধা নাই”। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অন্ততঃচিন্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে “আমার ক্ষুধা নাই”। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাঁপিয়া-ফাঁপিয়া মূখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সাহায্য করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, “আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।” সে জানিত, ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখনও নিষ্ফল হয় না, এইজন্য সে মনে মনে সতীশকে বহুতেজে দম্ব করিতে গিয়া নিজের দম্ব হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বাসিত উচ্ছ্বাসমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যথাকালে সাবানের সম্বন্ধে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শখের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ার উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন; নীলকান্ত নিরন্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আবার কী হল রে।” নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, “সেই গানটা গা-না।” “সে আমি ভুলে গেছি” বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণ তাহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে

স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কর্যদিন অবহেলার পর মিস্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়ী বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অত বড়ো ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আরে মোলো! কথা নাই, বাতী নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!”

কিরণ এই কঠোর উক্তি জ্ঞান সতীশকে ভৎসনা করিলেন। সতীশ কহিল, “তুমি বোঝ না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশ বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিবা রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মুখিক হইবার আশঙ্কায় অজ্ঞ মায়াকান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।”

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত সতীশের গারে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কালকাতা হইতে সতীশ একটি শোখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহাতে দুই পাশে দুই কিন্নকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্ম্ন রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চন্দ্রপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল, প্রায় সে মাঝে মাঝে সিন্ধের রুমাল নিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহাঁসের চন্দ্র-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন “ওরে রাজহাঁস, জর্মন স্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হাঁস রে” এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশবৃত্তার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিসটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, “ঠাকুরপো, তোমার রাজহাঁস তোমার দময়ন্তীর অশেষণে উড়িয়াছে।”

কিন্তু সতীশ অশ্রুশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকাল সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘূর্ ঘূর্ করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, “তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস, এনে দে।”

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে বখন তাহার নামে দোয়াত-চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগুনের মতো জ্বালাতে লাগিল; তাহার বকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল:

সতীশ আর একটা কথা বললেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রম্ব বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন, “নীল, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।”

নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মৃদু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।”

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, “নিশ্চয় নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।”

কিরণ সবলে বলিলেন, “কখনোই না।”

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, “না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।”

সতীশ কহিলেন, “উহার ঘর এবং বাস্তু খুঁজিয়া দেখা উচিত।”

কিরণ বলিলেন, “তাহা যদি কর তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।”

বলিতে বলিতে তাহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দুইজোড়া ফরাশডাঙার ধূতিচাদর, দুইটি জামা, একজোড়া নতুন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহার-গর্দল আস্তে আস্তে তাহার বাস্তুর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাস্তুটিও তাহার দস্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাস্তু খুলিলেন। কিন্তু তাহার উপহারগর্দল ধরাইতে পারিলেন না। বাস্তুর মধ্যে লাটাই, কাঁচ, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা কিন্দুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানাজাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাস্তুটি ভালো করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে বাস্তুটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছুরি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুবয়স্কের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরতিমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে কেবল

সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মদহুতের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাকের মধ্যে পুঁরিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাকের ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণবালকের কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুঁলিস বলিল, তাহার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, “এইবার নীলকান্তের বাস্তুটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।”

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, “সে কিছতেই হইবে না।” বলিয়া বাস্তুটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান এক দিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

## দিদি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বস্বত্বের বর্ণনাপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মূখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপালবাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিল—স্বামী-জ্ঞাতির মূখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা ম্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাত-জন্ম বিধবা হওয়া ভালো। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, “স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।” এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমূখে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং স্বর রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তত্ব মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়া, নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোলো বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের স্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটয়া ধরিল; টিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্ টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এত দিন পরে এত বয়সে, ছেলের মা হইয়া, শশী বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জন ঘরে বিরহশয্যার উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, “এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল

হইতে দিব না।” কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে; আজ অন্ততঃচিন্তে একান্তমনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে— কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেক দিন পর্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেইজন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিত্যন্ত অকালে, প্রায় বৃন্দবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসংগত অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল; জয়গোপালও সর্বিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলোটের প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বৃন্দমূর্ছির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা বখন অপহরণ করিয়া বাসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কণপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতৃটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ বৃন্দ ফুটিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আকোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তন্যপান করিতে ও চক্ষু মৃদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভাগিনীটি— দুধ গরম, ভাত ঠান্ডা, ছেলের স্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নিশিদিন যান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলোটের মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্বে জননী তাহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলোটি অনারাসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হৃৎকারণশব্দপূর্বক সে বখন তাহার উপর কাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মূর্ছের মধ্যে তাহার মূখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মূর্ছ-মধ্যে তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত— বখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিযত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিত— তখন শশী

আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলোটের মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্যের বেশি হইল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলোটের নাম হইল নীলমাণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসরের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলোটের তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শরীর পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাত্যাসবশত যে-এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, “যেমন দিনই আসুক, যত দিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই ম্লান হইতে দিব না।”

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্বে যখন উভয়ে আবিচ্ছেদে একত্র ছিল, যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্যসত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম-প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চল ভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার ভুলনার তাহার পূর্বজীবন বস্তুরহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পূর্ববৎসর ঘটায় দুঃশেষটা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃন্দিত করিয়াছে।

এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিত। তাহার কাঁধে মূখ লুকাইত, কোনোপ্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃটির যতপ্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগদাল জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বৃদ্ধিতে পারিত না, এই কৃশকার্য হিংস্রমস্তক গম্ভীরমূখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বৃদ্ধি, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন বস্তুর ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, এইজন্য শশী তাহাকে ওড়াভাড়ি বৃকের মধ্যে চাপিয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত—বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রি তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণাপ্রকাশ-পূর্বক জর্জরচিত্তে গর্জন করিয়া উঠিত, তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশবাস্ত হইয়া পড়িত; তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানন্দে স্নেহের স্বরে “সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার” বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষ্যে কগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্বে এরূপ স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধ এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায়ে শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্ট দিয়া, খেলনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া, শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্থনাবিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।



এইরূপ নীরব স্বপ্নের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো বদ্বদ্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেরি এইরূপ বদ্বদ্বদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষন্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নতুন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধূতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সাহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের অপানে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শুনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শূন্য হইল, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া, তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এত বড়ো মিথ্যাকথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, “আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম—সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হারিসলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।”

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “নালিশ করিবে না?”

জয়গোপাল কহিল, “ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।”

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সৃষ্টির সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর ফাদ— তাহাদের দুটি

ভাই-বোনকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিরাহে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপারিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শত আটাল টাকা মুনফার হাসিলপদুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জন্ম করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূর্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করিতে জয়গোপাল কহিল, “কেন, মর্তীলাল মন্দ ডাক্তার কি।”

শশী তখন তাহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, “আচ্ছা, শহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।”

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া, বুকুে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, শহরে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, “মকন্দমা-উপলক্ষ্যে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মর্তীলালকে বলিয়া গেলাম, সে নিষামিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।”

রাত্রি নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চাড়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। উদ্-স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীন বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলোটের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুরোধ করিল।

স্ত্রী কহিল, “আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।”

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, “তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ে না।”

শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, “ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়ের তো ঘর।”

জয়গোপাল কহিল, “আচ্ছা, সে দেখা যাইবে।”

পাড়ার লোকে এই ঘটনার কিছু দিন ধুব আন্দোলন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশিনী তারা কাহিল, “স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বাসিয়া কর-না, বাপু; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক করি। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।”

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, ন্যারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটা জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, “দিদি, বাড়ি চলো।” সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, “দিদি আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি!” শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল—“আমাদের ঘর আর কোথায়।”

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মর্দুছিয়া শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালক-সহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী-স্ত্রীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নিবন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব মফঃস্বল-পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকার-সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাহাকে দেখিয়া চাণক্যশেল্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দস্তী সঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু, সুগম্ভীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পাঠশালায় পড়?”

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, “হাঁ।”

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?”

নীলমণি পদন্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যান্টলুন পাগাড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যর্থাৎ চাপরাশি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ার ক্যাম্প্ টেবিল পার্শ্বায় বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে সফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, “এই সময়ে চক্রবর্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়।”

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, “সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।”

সাহেব তাহার সেই পূর্বপরিচিত বৃহৎমন্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, “আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।”

স্ত্রীলোকটি কহিল, “আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।” জয়গোপাল নিবর্ণমুখে ছটফট করিতে লাগিল। কোত্‌হলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারি দিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইয়া মাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশী তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যো মধ্যো বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্ট্রেট রক্তবর্ণমুখে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন “চূপ রও” এবং বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেক ক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, “বাছা, এ মকদ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—এ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।”

শশী কহিল, “সাহেব, যত দিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় তত দিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।”

সাহেব কহিলেন, “তুমি কোথায় যাইবে।”

শশী কহিল, “আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।”

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলার-মাদুলি-পরা কৃশকার শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলোটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, “বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই—এসো।”

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, “লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।”

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া, কোনোমতে আপন অণ্ডল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অর্মান সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেঞ্চন করিয়া ধরিলেন, সে “দিদি গো দিদি” করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল—শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণহস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ধনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণহৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে “চুপ চুপ” করিয়া তাহার মূখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

## মানভঞ্জন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহিদৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইঁট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাধানো এনগ্রোভিং টাঙানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঞ্জে চেতনার ন্যায়, একেবারে চাঁকতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, “ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারি দিকে এবং চিরকাল যে রূপ দেখিয়া আসিতোঁছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।”

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মনের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে—তাহার বসনে ভূষণে, গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উন্দাম ভ্রমে, নৃপদূরনিরূপে, কক্ষণেব কিঞ্চিৎকণীতে, তরল হাসো, ক্ষিপ্ত ভাষায়, উচ্ছ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছ্বলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছ্বলিত মন্দির রূপে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা মাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাত্তের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন্-এক অশ্রুত অবাঞ্ছিত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ বিকীর্ণ প্রকীর্ণ করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী-এক আনন্দ আছে; সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উত্তম রক্তস্রোতে অপূর্ব পূলক-সহকায়ে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণবাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্মৃত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশে মেঘরাজের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোছা কিন্ কিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হঠাৎ আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল

বেশ্টন করিয়া সেই দাঁড় কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগর্দালিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুন্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পছন্দরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গরিবাবলা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরণ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইন্স্কুল পালাইয়া, তাহার সুস্ত অভিব্যক্তিগকে বর্ণনা করিয়া, নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়লাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র-লেখালেখি করিত। ইন্স্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই-সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কম্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিমানেরও অসম্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উদ্ভেজনা আছে: মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিদ্যুত ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে-একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠক-খানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কি-বন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীহাড়া ইয়ারমন্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উদ্ভেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, সেজন্য অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক, সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধক্ষ হইয়া তারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অস্বীকৃতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে, সেই উদ্ভেজনায় অন্যান্য সমস্ত সখ দুঃখ কর্তবীর প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া-খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গরিবাবলা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বহু জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্ব-সংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালায় একটি সুরাসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত; এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালায় যখন-তখন এই সুধোকে নাহলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরমপুলকিতচিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিনী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না—সুধো তখন শত শত শপথ-সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বাসিত, গিরিবালায় পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—‘দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে’; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলঙ্কারিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিত পাইত এবং একটি পদলুপ্তিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদ্ভিত হইত। কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা ঘাইতে পারে—সে যখন সান্দর্শনিক কৃত্রিম কাদুনির স্বরে হাঁপাইয়া-হাঁপাইয়া টানিয়া-টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে “প্রাণনাথ” “প্রাণেশ্বর” করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাংলা ধূতর উপর ওয়েস্টকোট-পর্যায় ফুল্মোজামন্ডিত দর্শকমন্ডলী “এল্লেলেট্” “এল্লেলেট্” করিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসুয়া অনুভব করিত। আর কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসুর কৌতুহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রু কুণ্ঠিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদের ললাটদেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদম্ব মূর্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে, তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুইয়া বারম্বার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দম্বকাস্তের মতো তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জর্দালিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন



উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদ্যসংগীতমুখরিত দৃশ্যপটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্-এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মূহূর্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমণ্ডলের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী বজ্রাঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া-থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল—তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুখো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্ববে কানে কানে বলে, “বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো। দাদাবাবু জানিতে পারিলে বক্ষা থাকিবে না।” গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্ভাগ্য মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অনুমানবিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্ভভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজেব অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনও এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেমন দৌর্দণ্ড-প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমণ্ডলের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিস্ক ভারিয়া উঠিল।

অবশেষে ষড়ানিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মস্তমুণ্ডের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বৃষ্টি ফুরাইবে না। ষড়ানিকা আবার উঠিবে; রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুখো কহিল, “বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনই সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।”

গিরিবালা গভীর রাতে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্ মিট্ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জন শব্দ্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিস্তী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য—যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ

করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে, যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মূখের রঙচঙ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রঙ্গসংগীত শুনিলে যোন্মহার হৃদয় বেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমণ্ডের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ-যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমৃদ্ধ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামন্ডিত, অসংখ্য মূন্দ্রদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোক-মালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যরাজ্যীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথমে যোদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জরিতচিত্তে মনে করিল, যদি কখনও এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণদ্বয়ের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শূভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মধ্যে ধূলিধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণবাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্টিয়া পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নতন নতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীবামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝলমল করিয়া রন্বন্বন্ব বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চূনি ও মস্তুর কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তাংগল-পদপদ্মে হাত বুলাইতেছিল এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, “আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বৃকে লইয়া মরিতাম।” গিরিবালা সর্গবে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, “বোধ করি বৃকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।”

সুধো সেই জ্যোৎস্নাশ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,  
সকলে সাক্ষী থাকুক বন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর-সকলে আহালাদি সমাধা করিয়া ঘুমাতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল—সুধো অনেকখানি জ্বিত কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মূখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না, শিখিপদুচ্ছড়া পায়ের কাছে লুটাইল না, কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না “কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী”। সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, “একবার চাবিটা দাও দেখি।”

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এত দিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মণ্ডেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনির্মাণে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনূপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে “ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি”। তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই—তাহা অত্যন্ত অর্কিণ্ডকর।

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিদের মর্মান্তিক দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টব-ভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল, গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তী রঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে-সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামী হাত ধরিয়া বলিল, “চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলে।” আজ সে কাঁদবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, “আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।”

গিরিবালা কহিল, “আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে সাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাতে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।”

গোপীনাথ বলিল, “সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।”

গিরিবালা বলিল, “তবে আমি চাবি দিব না।”

গোপী বলিল, “দিবে না বই কি! কেমন না দাও দেখি।” —বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাজর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধবার বাজর জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল; তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কোটা, চুলের দাড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া, নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, “চাবি দাও বলিতেছি, নাহলে ভালো হইবে না।”

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার

হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমন নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অস্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শূন্যে যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুস্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আত্মস্বরে দীর্ঘ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান, গিরিবালা সুখের কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, “আমি বাপের বাড়ি চললাম।” তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কণ্ঠী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গোও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে ‘মনোরমা’ নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈশ্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনও নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মস্তাবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী-এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুঁজিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পুঁজার এক মাস পূর্ব হইতে নতুন নাটক ‘মনোরমা’র অভিনয় খুব আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মূড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সম্ভান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অক্ল পাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য

অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নতুন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল— তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক ম্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিম্বেষে এবং কোতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে— প্রচ্ছন্ন বিনয় সংকুচিত-ভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো-এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই— আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে, তাহার নিরুপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মন্দিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহাব স্বামীর সহিত পুনরায় নতুন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জন পলা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমন্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মালিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গোরবে গ্রীবা বাক্ষম করিয়া সমস্ত দর্শকমন্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্রুতের ন্যায় অবজ্ঞাবহুপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকমন্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসার কর-তালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া “গিরিবালা” “গিরিবালা” করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঞ্জে মর্মান্তিক ক্রোধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলার “দূর করে দাও” “বের করে দাও” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভঙ্গকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, “আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।”

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কালিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

## ঠাকুরদা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এক কালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা-রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম-সুপারিশের শ্রাম্ব করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিভেন, কারণ পাড়ের ককশতায় তাহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যাধিত হইত। তাহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাহারা সীঁচা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন, সকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবর্তিকাৰ্বিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অল্প কালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায়চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্বাচিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠিকিয়াছিল; ইহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাম্বশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয়-আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল; যে অল্প অবশিষ্ট বাঁহল তাহাতে পূর্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন--পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাটুর নিম্নে কাপড় পরিভেন না, কড়াকান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি-লাভের জন্য তাহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাহার একমাত্র পুত্র তাহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান-রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্যভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা সোহার সিদ্ধকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাহাদের পূর্বগৌরবের ফেল-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচোড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাস-

বাবু বৃদ্ধি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম, অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বৃদ্ধি-কৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমৃদ্ধ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিভেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল, সেইজন্য এইরূপ তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম। এখন বয়স বেশি হইয়াছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছু নাই, সে যদি অহংকার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্দ্রনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে, আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারও সহিত তাহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত—“ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়োবাবু ভালো আছেন? মধুর ছেলোটর জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাবুকে অনেককাল দেখি নি, তাঁর অসুখবিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এঁয়াকা সকলে ভালো আছেন?” ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরুজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন রূপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরণ, সমস্ত স্বহস্তে রোদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে ঝাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্বাবেও তাহার ঘরম্বার সমৃদ্ধকূল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যভাবে অনেক সময় ঘরের ম্বার বৃদ্ধি করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধূতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিতন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাহার বড়ো বড়ো জমিদারি ও বহুমূল্যের বিষয়-সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আন্তরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রূপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকলে জামাজোড়া ও পাগড়ি দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহু চেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো-একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রভর দিত

এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থার পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, “ঠাকুরদামশায়, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গরার তামাক পাওয়া গেছে।”

ঠাকুরদামশায় দুই-এক টান টানিয়া বলিতেন, “বেশ ভাই, বেশ তামাক!” অর্নি সেই উপলক্ষ্যে ষাট-পঁয়ষাট টাকা ভাঁরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারও আশ্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাঁবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অব্যয়নের পর প্রকাশ পাইবে যে, পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজন্যই সকলেই এক বাক্যে বলিত, “ঠাকুরদামশায়, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।”

শুনিয়া ঠাকুরদা স্মিরুতি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, “সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি, ভাই।”

অর্নি সকলে বলিত, “সে একটা দিন ঠিক করে, দেখা যাবে।”

ঠাকুরদামশায় বলিতেন, “সেই ভালো, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠান্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরুভোজনটা কিছ্ নয়।”

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না, বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, “এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্ছে না।”

কদু বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন কি, আজ ছয়-সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, “তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ। নয়নজোড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেকে।”

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দবশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নিবৃদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরবপ্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে জ্বালোবাসিয়া এবং আমোদ



করিয়া তাহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অভ্যক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃন্দ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সর্বিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গর্দাল বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গারে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিসটা প্রতি মূহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে, অথচ কোনো একটা-কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা-সাধন এবং দর্শকের মনে তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগর্দাল এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লঙ্কের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মূহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

### শ্বিতীর পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিশ্বেষের আর-একটি গুঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যিক।

আমি বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম. এ. পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজস্ব স্ত্রী বলিলে অহংকার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাতে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাতে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কম্পনার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিষ্কি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,

কী জ্ঞান জন্মিতে পারে মম সমতুল—  
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং কদু বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রন্থগণ প্রতিনিরত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিত প্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নির্যমিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুরদামশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদ্ভিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাবু লোক-মারফত অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুদে কখনও কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বন্ধুকে শৃঙ্খলিত নিপীড়ন করা আমার স্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকবহু প্ল্যান মাথার উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রয়োজন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথা সজ্ঞন করিত। পাড়ার একজন পেন্সন-ভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বলিতেন, “ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাংলাদেশে বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুইটি মাত্র যথার্থ বনোদি বংশ আছে।”

ঠাকুরদাদা ভারী শূন্য হইতেন, এবং ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, “ছোটোলাট-সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভালো আছেন?” সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব ডেপুটি নিশ্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি বলিলাম, “ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নরের লেভিতে গিরোঁছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বললুম, নয়নজোড়ের কৈলাসবাবু কলকাতাতেই আছেন; শুনুন, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে তাঁরি দুঃখিত হলেন—

বলে দিলেন, আজই দুপুরবেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।”

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধায় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুশি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কী উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চলাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, “সেজন্য ভাবনা নাই, তাহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।”

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাসবাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল, “ছোটোলাট-সাহেব আয়া।” ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শূদ্র জামাজোড়া এবং পাগাড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাহার নিজের ধূতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের অগমন-সংবাদ শুনিয় ই হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কাঁপিতে-কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সমস্তদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়সকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উর্দুভাষায় এক আতিথিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণরেকাবিত্তে তাহাদের বহুকণ্ঠরক্ষিত কুলকুমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুর-বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাহাদের ষষ্ঠাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট-সমেত অভ্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কারদা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকবার কথা, কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে ষষ্ঠাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাহার গর্বাঙ্ঘ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মূহূর্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোথান করিলেন এবং পূর্বশিক্ষামত চাপরাশিগণ সোনার রেকাবিসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাসবাবু বুঝিলেন, ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পশুর

বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চৎ দূরবর্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উদ্ভূত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তত্তপোষের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তত্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্রুদ্রব্দ কণ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার মূর্ধের উপর সজল বিপুল কৃকচক্ষের সূতীক বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কাঁহল, “আমার দাদামশার তোমাদের কী করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ—কেন এসেছ তোমরা”—অবশেষে আর কোনো কথা জুটিল না, বাক্দ্ৰব্দ হইয়া মূর্ধে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথার আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম, অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপমান হইয়া উঠিল, লজ্জার এবং অনুতাপে পদাহত কুকুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃন্দ আমার কাছে কী দোষ করিয়াছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনও কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি ঝুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্নদৃষ্টিপাতের প্রতীকার সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মতো দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ বাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকামূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখদুঃখ অনুরাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অস্ত্রের অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ-নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।

সমস্ত রাগি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে বৃন্দ্রের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছ না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় অদূরবর্তী ঘরে বৃন্দ্রের সহিত বালিকার কথোপকথন শ্রুতিতে পাইলাম। বালিকা সূক্ষ্মস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, “দাদামশার, কাল লাট-সাহেব তোমাকে কী বললেন।” ঠাকুরদা অত্যন্ত হর্ষিতাচন্ডে লাট-সাহেবের মূর্ধে প্রাচীন নয়নজোড়-বংশের বিস্তর কাম্পনিক গদগদবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শ্রুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃন্দ্র অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সক্রন্দন ছলনার আমার দুই চক্ষে জল জল্ জল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুরদা তাহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রত্যক্ষদর্শন

বম্বালগর্দল লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রধানদ্বারা অন্য দিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাহাকে প্রশ্ন করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি প্ৰলোকিত হইয়া শতমুখে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকোতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জমুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, “আমি গরিব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না, ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাহার মহিমাম্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়-বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাঠ জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

## প্রতিহিংসা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মুকুন্দবাবুদের ভূতপূর্ব দেওয়ানের পোঠী, বর্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্রমে বাবুদের বাড়িতে তাহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দবাবুও ভূতপূর্ব, তাহার দেওয়ান গোরীকান্তও ভূতপূর্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গোরীকান্তের যখন কোনো জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তি পর্ববেষ্ণনের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বন্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, গোরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার-শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূতোরও উন্নতি হইল; অল্পে অল্পে তাহার কেঠাবাড়ি জোতজমা এবং পূজার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহশিলদার-শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষাপুত্র আছেন, তাহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গোরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকচরণ তাহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেইজন্য বার্ষিক্যবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম বেশ চলিতেছে; পূর্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলই প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে—এখন প্রভু-ভূতোর সম্পর্ক কেবল কাজকর্মের সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্বকালে টাকা সম্ভা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছুর সুলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পাড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পোঠী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপূর্ববধের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কড়কগদা বিচিত্রচরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে নিরন্তর কত চিত্রবিচিত্র

অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল, এবং দেখিতে-দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানির মধ্যে একটা নতুন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নতুন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহাৰাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বৃষ্টিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই—মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্ষাদার গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বৃষ্টি তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষু এবং সর্বাপেক্ষে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দবাবু তাহার পোষাপত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কতটা তাহার প্রতি বন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহার যতই প্রশয় দিন, তিনি কখনও ভ্রমেও, স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সমস্ত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গন্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্ষাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পত্রের সহিত তিনি তাহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভূতের এই কুলগর্ব মুকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবের দ্বারা তাহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বন্ধে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে

ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহর করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে স্বেচ্ছায় প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্ধা নয়নতারার বিম্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বৰ্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যিক ছিল।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা, চলিত ভাষায় বাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীৰ্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাথামাথি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পাড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে “আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী” “আমাদের দেওয়ানের নার্তিন” বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মূষরা দাসীকে লিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গারের উপর পাড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল—কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ ভাই এ কি গিল্টি-করা।”

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরমুখে কহিল, “না, এ পিতলের।”

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিবে এসো-না।” অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মূহূর্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্যচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরকণ্ঠেই নীরবে মিস্টারপূর্ণ সরা ধরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উল্লেখে নীচে চলিল।

যিনি এই মিস্টার উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশবাস্ত হইয়া কহিলেন, “তুমি কেন ভাই কষ্ট করছ, দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।”

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল, “এতে আর কষ্ট কিসের।”

অপরা কহিলেন, “তবে ভাই, আমার হাতে দাও।”

ইন্দ্রাণী কহিল, “না, আমিই নিরে যাচ্ছি।”

বলিয়া, অসম্পূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সম্ভ্রুত হনহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমন অটল স্নিগ্ধ ভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিস্টার রাখিয়া



আসিল—এবং সেই দুই-মিনিট-কালের সংশ্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনীগৃহবধু এই স্বপ্নভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের সখী স্বপ্ন স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্বীজনসদুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগদূলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনোটাকেই গায়ে বিধিতে দিল না—সকলগদূলিই তাহার অকলঙ্ক সমদুঃখদল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বদ্বিকিতে পারিয়া এক সময় অলঙ্ক্য কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞা-ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমন এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূরসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়; সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনও মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপদরে সকলেই আশ্চর্য এবং কোতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপকতায় নিকট মূখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনাভিজ্ঞা স্বান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহায়ায় বড়োই খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের ষড়্‌কিণ্ণে ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাহারই পছন্দে এবং তাহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোনো সান্দ্রনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে-বর্ণিত শক্রাচার্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শক্রাচার্যের ন্যায় মদুকুন্দবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মদুকুন্দবাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মদুকুন্দলালের বিষয়সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমার উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শুল্কলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যিকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি

পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে। “আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্বে তোমরা আমাদেরকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ” ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভুতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে আমরা আশা করি, এই নিয়ম বৃদ্ধি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সাহিত ইন্দ্রাণীর দুই-একটা বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাস্বীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাহার সমস্ত জীবন পর্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিল তখন অম্বিকাচরণ তাহাকে পরিহাস করিয়া কী-একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্রান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কী হয়েছে।”

ইন্দ্রাণী তাহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়ইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কী আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামীরকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।”

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, “সে তো আমার অগোচর নেই। তৎপূর্বে?”

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিল, “তৎপূর্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।”

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমাদরটা কী রকমের।”

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া, তাহার গ্রীবা বেস্তন করিয়া উত্তর করিল, “তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।”

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।” তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদবাবুকে এক কড়া চিঠি

লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চোঁকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুর-পাতা মেজের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল, “এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।”

অম্বিকা উত্তোজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।”

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মংগলে একটিমাত্র পশ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিন্তাসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মদুকুম্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে-একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বশ্মমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সূর্শিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টিচিন্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদবিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে, এ তাহার কিছতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিশ্র স্বরে কহিল, “বিনোদবন্দর তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না— তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন।”

শুনিয়া অম্বিকাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিজের সংকল্প তাহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, “সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনও তোমাকে পঠাচ্ছি নে।”

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্তনির্ভর ও অর্তিনিশ্চয়তা-বশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যে রূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আর এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আর বলিয়া বোধ হয় না— তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সূড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগাবি ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করাইবেন; কখনও পরামর্শ হইত, সুন্দরবনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন; কখনও লোক পাঠাইয়া

পশ্চিম-প্রদেশের বনগর্দাল বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসার একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লক্ষ্য করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন, তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বাসিয়াছেন, সেইজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বাসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন—  
“তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া বাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী বা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পার কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে” ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে বেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মূহূর্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনার সে নানাপ্রকার বিস্তীর্ণিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মূর্খকল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্মচারীগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষত গোরীকান্ত তাহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনের বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিশ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আর্পনি জোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধনুজা থাকিত, আজকাল আর্পিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়া বেটা খাটিয়া মরে আর ধনুজা-মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্বে কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাণ্ডিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে। খাজাণ্ডি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাণ্ডি তাহার নিকট সেই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকাবাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া, তহবিলে প্রায় আমানতি সদর-খাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না; পঠ লিখিলেও কোনো ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষু লজ্জা ছিল, আর কোনো লজ্জা ছিল না, এইজন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্দূকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা। অলক্ষ্যে সাহায্য লোহার সিন্দূকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুঁশি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্মচারীদের ডাকিয়া সম্মান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্বক পশ্চিমবর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপসের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘৃষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—সাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘৃষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মূখ হইতে ফৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষু লজ্জা; মিতীয়ত আশঙ্কা, পাছে সমস্ত-অবস্থাভিঙ্গ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতর জ্বলিয়া পড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাত-সারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, “তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বঝিয়ে দিয় চলে যাও।”

তাহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন সেজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?”

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, “না, কখনই না।”

অম্বিকাচরণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার উপর কি আপনার কোনো

সন্দেহের কারণ ঘটেছে।”

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “কিছুমাত্র না।”

অম্বিকাচরণ নরনতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন, বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছু দিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্বলতা-বশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, “আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।”

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্ক গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকাচরণ ডেস্ক খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কী”; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, “আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।”

অম্বিকা রুদ্ধ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন।”

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, “সে আমরা কেমন করে বলব।”

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতিসূযোগে বামাচরণের মন্ত্রশাস্ত্রে নতুন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না—অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্ক চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সম্মানে গেলেন—বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিতাছে। সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্বল-দেহে বিছানায় শইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থিরসৌদামিনী আজ স্থির রহিল না—তাহার বুক ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ৰপ্রাপ্ত হইতে উন্মত্ত বক্তৃতা সন্তীর উগ্র জ্বালা বিক্ষিপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অভূতীয় নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ ধামিরা গেল—তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, “বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগড়ে গেছে।”

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্ঠন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ৰ রোষদীপ্ত ম্লান করিয়া দিয়া বর্ বর্ করিয়া অশ্রুজল করিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যান্য হইতে, সমস্ত অপমান হইতে, দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া

সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ধনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ ধামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিগ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

### পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুদের বাড়ির খাজাণ্ডা আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুদলজ্জবশত খাজাণ্ডার মুখ দিয়া তাহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাণ্ডার হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাণ্ডা তৎসম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, “সর্বনাশ হইয়াছে।”

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে।”

তদন্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাজাণ্ডাখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর-একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারণিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চাড়িয়া যাইতেছিল—ততই নতুন নতুন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেক কাল হইতেই পার্শ্ববর্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ-পর্ষন্ত টাকার জন্য কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বৃদ্ধিয়া হঠাৎ ডিক্রি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, “আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারছি নে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।”

খাজাণ্ডা যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন, “বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।”

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধস্বন্দ্ব সবলে দমন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “না, এখন ছাড়তে পার না।”

তাহার পর ‘কোথায় টাকা’ ‘কোথায় টাকা’ করিয়া সম্বান পাড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপরে হইতে গহনাগর্ভি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্বে ব্যবসা উপলক্ষ্যে বিনোদ সে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাঁটয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুঁলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন, তাহার চারি দিক হইতে সকলই খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এখন এই গহনাগুঁলি তাহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অস্তিম আগ্রহ-সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-প্রকৃতির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তো করিয়াছ, এখন তুমি কান্ত হও; যাহা হইবার তা হউক।”

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত, সতীর রোষানল এখনও নির্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাহার নিজের বিষয় আবশ্য রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহাকে মাথার দিয়া দিয়া বলিল, “ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।”

অম্বিকাচরণ বড়ো ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বৃথাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া, গম্ভীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিঁদুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বহুৎ খালার পত্ৰপাকার করিল এবং সেই গুরুভার খালাটি বহু কষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ইংগ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ে কাছ রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সময় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলংকাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণমাণিকা স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, “আমার এই গহনাগুঁলি দিয়া আমার পিতামহের দস্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্বার তাহার প্রভুবংশকে দান করিব।”

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মূদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুদ্ধকেশধারী, সরলসুন্দরমুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যায়, ধীপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল-গৌরবাসিত বৃদ্ধ পিতামহ এই মূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা পুনশ্চ ত্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল; আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।



## ক্ষুধিত পাষণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পুজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতোঁছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতোঁছিল, রশিয়ানরা যে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছাই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নব-পরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন . There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনো-রূপ অধিকার না থাকতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিস্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো-এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছ, একটা যোগ আছে—কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সুক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছ। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহবল মন্থভাবে শুনিতোঁছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতোঁছিলেন। আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছ, খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আব ঘুম হইল না।--

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাসুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নিজাম পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শূস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলম্বুর্ধারিত পথে নিপুণ নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড় শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত-

প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে শ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎস্কিস্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নসন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মূক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শূন্য চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঞ্জিনীহীন মাসুল-কালেঙ্করের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আঁপসের বৃক্ষ কেয়ানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, “ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাতিব্যাপন করিবেন না।” আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সম্ব্য পর্বন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাতে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, “তথাস্তু।” এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাতে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আঁসিয়া এই পরিত্যক্ত পাবাগপ্রাসাদের বিজনতা আমার বৃকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাতে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সস্তাহখানেক না যাইতেই বাড়টার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্ৰমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়টা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদাৰ্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শূন্য নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহুর আভার রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুঁড়ি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনভুলসী পূর্দিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালার একটা দীর্ঘ ছায়াবনিকা পড়িয়া গেল—এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সন্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ার চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বাসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ইংগিতের সহিত এক অপরূপ পদলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শব্দস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্ততঃ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শব্দনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাসোর সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মূক্তামৃষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বাসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গম্ভীর ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শব্দস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপরূপ কেশদামের মতো কুণ্ডিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়ায় সমস্ত বনভূমি এক মূহুর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলা আর সত্যই বলা, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চাঁকতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শব্দস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিন্ধু অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বৃষ্টি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বৃষ্টি আমার মূণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহাৰ করিতে হইবে; শন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক মসলা-সুগন্ধি রীতিমত যোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-টুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড়্ গড়্ শব্দে আপন ভদ্রান্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বাসিয়া আছে। রিপোর্ট, অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধুসর তরুছায়ায় নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সর্চকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতিবৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো খামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুলশূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনও প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল-- যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তা-বশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন পুস্তকশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শূন্যতে পাইলাম-- ঝড়ের শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতारे কী সুর বাজিতেছে বৃষ্টিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নুপুরের নিঙ্কণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুলমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগর্দীর ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, 'অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্ টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তম্ভ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি 'অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমৃত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মাসা-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকাবি ও কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ

কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অশুভ মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্পটোবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্বতের উর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেঙ্করকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম—ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেঘ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অর্নাধিকারসংকুচিত স্থান-ভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চূপিচূপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময়, প্রকাণ্ড-শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধর্মান এবং সজাগ প্রতিধর্মান-ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনও যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তম্ভ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, খোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপি প্রাপ্ত হইতে মূখের উপরে একটি সুক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কঠিনমুখে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সূপ্তমন্দ যোগ্যদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি!

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা ধমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছই ছিল না, কিন্তু ভয়ে

আমার বন্ধের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া ঢুলিতেছে। দুতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশে তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চাঁট-পরা দুইখানি সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতি, নারারিঙ্গ এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়লা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদম্বল যেমন লক্ষ্যন করিতে গেলাম, ভ্রমনি সে চমকিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজের শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ঘর্ষিতকালেবরে বসিয়া আছি—ভেতরের আলোয় কৃকপক্ষের খন্ডচাঁদ জাগরণক্রমিত বেগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রতীক্ষিত প্রণয় অনুসারে প্রত্যাহার জনশূন্য পথে “তফাত যাও” “তফাত যাও” করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরবা উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনও এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাতের ভাঙ্গি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় প্রান্তপ্রান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম। অধর সম্ভার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবন্ধ অস্তিত্বকে প্রান্তে তুলি মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সম্ভার পরে আমি একটা নেশার জ্বালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পার্শ্বকাব কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁঠি প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া—ঢিলা পায়জামা, ফুল-কাটা কাবা এবং বেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আভর রাখিয়া বহু ঘরে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহু-কুন্ডলীয়িত বহু আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাতে কোনো-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রেহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার মতই ঘনীভূত হইত ততই কী-ষে এক অশুভ ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বহু প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ

দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খন্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে, এই কঁচিং হেনার গন্ধ, কঁচিং সেতারের শব্দ, কঁচিং সুর্ভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রুংশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্রান রঙের পায়জামা, এবং দুটি শূভ্রাঙ্গিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চাঁট পরা, বক্ষে অতিপিনন্দ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শূভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টিত করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাতে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া ষড়পূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিশ্বের পার্শ্ব ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগতীর্ণ বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিস্বাধরে একটি অক্ষুণ্ট ভষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপূর্ণিত দেহলতাটিকে দ্রুত বেগে উর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া—মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিদ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির ক্ষুদ্রলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্ভাস বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতে পলকিতদেহে মৃদুতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল কবচ্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জ শুনিত পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাপা বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্ৰম করিতেছি, এমন সময় শূভ্রা নদীর বাঁক এবং অরালী পর্বতের শূক্ষ পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সন্তকে উঠিয়া সুর্ষাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ

খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাতে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষণভিত্তির তলবতী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বৃকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মঞ্জুমানা কামনাসুন্দরীকে তাঁরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিনী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তাঁরে খজুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদ্যুনি দসু, বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোধ হইতে ছিন্ন করিয়া বিন্দুংগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুত্রীর দাসীহাতে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নবনিকশিত সলঙ্ককাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নৃপতির নিরুপদ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাঙ্কের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শূদ্র চবণের তলে মণিমুস্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাব্শি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষানিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎকীর্ণ হইয়াছিলে!

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুটে হায়, সব ঝুটে হায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে: চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃক্ষ কেয়ানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অনমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় বাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না—



যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুঁটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্‌ ঠিক গোখলিমহুর্তে আপনিই সেই পাষণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনূতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া গান গাহি; বলি, 'হে বহি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দংশ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আনিয়াছিল। অন্ধকার অণ্য এবং শূন্যতার মর্সাবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্ভক্তবিকশিত বড় শব্দলিখিত উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আতঁ চীৎকার করিতে করিতে ছুঁটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলো সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীর বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভূভাগণ সকলেই আপিসঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাতে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়মুষ্টিতে আপনার আলুলাসিত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শব্দ তীর অটুহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া-ফুলিয়া ফাটিয়া-ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্ত বক্ষের কাঁচালি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষ আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতাস দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মূষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি বড়ো থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ধনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষিপ কোথা হইতে উথিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও তফাত যাও! সব কাঁটে হয়, সব কাঁটে হয়।"

দেখিলাম, ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘরে দুর্সাগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যন্তর চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল,

এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষণ-রাঙ্কসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যাষে প্রদাক্ষণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?”

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অঙ্গরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল, “তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।”

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, “ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।”

বৃন্দ্র যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভাগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিন্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখন্ড কর্ণাভ হইয়া আছে, সম্ভব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা তির্য্যি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।”

বৃন্দ্র কহিল, “একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দূরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যিক। তেমন আশ্চর্য্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।”

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বসিতে বসিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে একজন সুশ্রীকৃত ইংরাজ জনলা হইতে মৃদু বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বৃন্দ্রটিকে দেখিয়াই ‘হ্যালো’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদেরকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

## অতিথি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া থাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়।” প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিলালবাবু উত্তর করিলেন, “কাঁঠালে।”

ব্রাহ্মণবালক কহিল, “আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগায়ে নাবিয়ে দিতে পার?”

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী।”

ব্রাহ্মণবালক কহিল, “আমার নাম তারাপদ।”

গৌরবর্ণ ছেলোটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাসাময় ওষ্ঠাধরে একটি সুন্দরিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মালিন ধূতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহ্যল্যাজিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তাপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাত্মক বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, “বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।”

তারাপদ বলিল, “বসুন।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বৌচকা খুলিয়া একটি শূদ্র বস্ত্র পরিণত; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকার মতিলালবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিলালবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিলালবাবুর স্ত্রী এবং তাহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিলালবাবুর স্ত্রী অল্পপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

ষথাসময়ে মতিলালবাবু এবং এই ছেলোটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলোটি তেমন ভোজনপটু নহে; অল্পপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলোটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে,

তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহাঙ্গারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলোট সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, “তোমার মা নাই?”

তারাপদ কহিল, “আছেন।”

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?”

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্চুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “কেন ভালোবাসবেন না।”

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, “তবে তুমি তাকে ছেড়ে এলে যে?”

তারাপদ কহিল, “তীর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।”

অন্নপূর্ণা বালকের এই অশ্চুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, “ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।”

তারাপদের বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ছেলোট সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন কি, গুরুমহুশরও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণে প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী বাস্তার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষ্যে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অন্ততঃচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনকষ্ট তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে বখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বখগাছের তলে কোন দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁধারি ছালিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গে লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্র-নির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুত্রমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিগণিশির মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সংগীতসভায় সে বেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্ক-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছ্বল হইয়া উঠিত। নিস্ততঃ নিব্বপ্রহরে বহু দূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুগ্ধস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যাষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষ্যে দুই-তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাস্টিকের দল এই পর্বটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিথিয়া মেলায় পানের খিল বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্ন্যাস্টিকের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল—জিম্ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্যে ঠুংরি সুরের বাঁশি বাজাইতে হইত—এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শূন্যিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শাখের যাত্রা খুলিতেছেন—শূন্যিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বৌচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কম্পনাপ্রবণ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুগ্ধ ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শূন্যিয়াছে এবং

অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলোটর কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধা করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শূদ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলোটর মধ্যে একটি শূদ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মৃদুখশী দেখিয়া প্রবীণ বিদগ্ধী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অঙ্গপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিচালন লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্ভাস চাঞ্চল্য প্রকৃতিমাত্রাকে যেন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মূল রৌদ্রে নদী-তীরের অধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার উর্ধ্ব সরস সঘন ইক্ষুশ্রেণী এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঙ্গনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মৃদু-দৃষ্টির সম্মুখে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতার সূচিকণ, প্রচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, স্ফাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবোঁধিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকে সচলতা সজীবতা মৃদুরতা, এই উর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সূন্দরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মূহুর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিত্তা রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুবেড়া সম্মুখের দুই দাঁড়-বাধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের ভাল বাঁধবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবগে জলের মধ্যে কাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাধা মেছনিয়া চূপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরন্তন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বাসিয়া বাসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাদের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়-মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যিকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লাগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে

প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যিক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যিক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রে তুমি কী খাও।”

তারাপদ কহিল, “যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।”

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীনা অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পাশ্চ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সম্ভান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, “আমার ভালো লাগে না।”

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকা-চালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে, কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহেব একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ—ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মৃদু হইয়া যায়। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খন্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহার স্ত্রী-কন্যাকে রামায়ণ পাড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, “বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনেনে যান।”

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্ৰবেগে বর্ণন করিয়া চলিল; দাঁড়-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া কণ্ঠিকা পাড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসম্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিম্নতম্ব তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া বেসকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিন্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজ্জনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলোটিকে কোলে বসাইয়া বন্ধে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ছেলোটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।' কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশর্মা অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিম্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশর্মা তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেলাল এবং জেদের অস্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কাপাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে প্রতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধা হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীর্ন বিম্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের নোদরঙ্গন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদের যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কেশবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বল হয়, মজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, কেমন লাগল?" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুদ্ধিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল-সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকঙ্কের ম্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিলাল ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামস্ট্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মগ্ন নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্য্যরসে



উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, “মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।” পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত।

এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক স্দুতীরতা তারাপদের নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাইয়া, বাঁশ বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি নানা সন্তরণভাঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতুহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদের সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমৃদু গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনও পাল তুলিয়া, কখনও গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগূলিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনো রূপ তাড়া ছিল না মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, কিঞ্জির্মন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পাশে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জামদারের আগমনে বাড়ি হইতে পার্লিক এবং টাটুঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকীর্ণত কাকসমাজকে ষৎপরোনাস্তি মূখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সঙ্ঘর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের

স্বারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যন্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, “দাদাঠাকুর, একটু বসো তো ভাই, আমি আসছি”—তারাপদ অস্ফালনবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিমান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্ৰচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার দৃষ্টি সে এখনও জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সূদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকুরনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেরূপ দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবাজিত পরমরজাটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সন্তোষে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকুরনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশ বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক-শাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তন্তুশেল বিধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুপে নুশ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুলভ দৈবলক্ষ্য ব্রাহ্মণবালিকাটি সোনামণির কাছে কেন সহজগমা হইল। আমরা যদি এত স্বল্প করিয়া না আনিতাম, এত স্বল্প করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিশ্বেষণরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উন্মেষণ কেন।—বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটা তুচ্ছ সূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদের ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার

উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশধরসংস্কারে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, “চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছে কেন?” চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে “বেশ করছি, খুব করছি” বলিয়া আরও বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কম্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্ত মানিত না।

ছবির বাহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, “ইংরাজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।” তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, “শিখব।”

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথম স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নতুন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নিজের নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মদুস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে কাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষ্যে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নতুন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জিদ ধরিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। তাহার পিতামাতা তাহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য-

অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে খোঁত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকস্বর্য বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মধুস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাম্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি কাম্বাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মধুস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাণ্ড্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিদ্যুস্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষন্নমুখে বসিয়া ছিল; চারু স্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কাহিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘূর্ঘূর্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মর্শকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্রমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অন্তস্ত কদু হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্রমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, “আমি আর কখনও খাতায় কালি মাখাব না।” লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্রান্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্রোধ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উর্শকিকুণ্ডি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর স্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মধু তুলিয়া সন্দেহে বলিত, “কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।”

সোনামণি কাহিত, “অনেকদিন ষাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার

কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।”

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পর্কিত চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সন্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, “আঁ সোমা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।” যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিব্যক্তি; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্ধামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লম্বিত শঙ্কিত পরাক্রান্ত হইয়া বাধিতাচিতে ফিরিয়া যাইত। দয়ালু তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত “সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।” চারু সর্পিণীর মতো ফোস করিয়া উঠিয়া বলিত, “যাবে বইকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?”

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামনঠাকরুরনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মাঝ মসলার বাস্তুর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহাৰেব সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অন্তত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সান্দ্রনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।” তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সম্বাবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মূহুর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিয়ৎ মেজাজ হইয়া যায়, কিছুতেই আশ্বসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষ্যে কোন দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনায় মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ

হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিম্নতদৌরাশ্রাচঞ্চল সৌন্দর্য অলঙ্কিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারু'র বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, “পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেরি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।”

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “সেও কি কখনও হয়। তারাপদের কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।”

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল— কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দত্তবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আব দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেরি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাহার অশান্ত অনাথা মেয়েটির দুরন্তপনা তাহাদের স্নেহের চক্ষে বতই মার্জনীয় বোধ হউক স্বশরুবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদের দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো কিন্তু পরিষ্ক। তখন মতিবাবু জেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হইয়া সম্মতি দিতে মূহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনকণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদের পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনও রাগ, কখনও অনুরাগ, কখনও বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্চার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মনুস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিন্তে মাঝে মাঝে কণকালের জন্য বিদ্রোহপন্দনের দ্বারা এক অপূর্ব চাঞ্চলা-সম্ভার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিন্তা চিরকাল অক্ষুণ্ণ

অব্যাহত -ভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাম্বনজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কম্পনালোক সৃষ্টি হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রিঙন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দৃষ্টান্ত করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গঢ় পরিবর্তন, এই আবস্থ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোস্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পিঙ্কল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি -চলাচলের সুগভীর চক্রাচিহ্ন ক্ষোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ-প্রত্যগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধ্বিত্তে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সিঙ্গনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল—শুষ্ক নিজীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চাড়িয়া এই গ্রামকনাকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তত্ব দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলাপাধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যেষ্ঠনা-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা-অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সটের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বাগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকান্ড কালো পাল ভুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—

পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মৃষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্ব কাঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরম্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কালিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চৎ আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহম্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধনের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চূরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘাঙ্ধকার রাতে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তি-বিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।



## ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলোটর নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলোটি পাড়াসমূহ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলোটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেন না। তাহার অনেকগুলো কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?”

সুশীল বলিল, “আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।”

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোসো, একে আজ জ্বদ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, “পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজ্জাস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাচন তৈরি করে নিয়ে আসি।”

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মর্শকিলে পড়িয়া গেল। লজ্জাস সে যেমন ভালোবাসিত পাচন খাইতে হইলে তাহার তের্মনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্যে কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, “আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।”

বাবা বলিলেন, “না না, সে কাজ নেই, তুই পাচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।” এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্তদিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছা তাই

করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো কিছু হইল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া বাইতৌছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।” ছেলেকে গিয়া বলিলেন, “কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।” শুনিয়া দুইজনে ভাবি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বন্ধ সুবলচন্দ্র রাতে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটার ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মূখের গোফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাতে যে ধূতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত টিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আঙ্গুল প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধূতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাডা করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেঁচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চাপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে। শরীরটা সমস্ত বাঁড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোফ-দাড়িতে অর্ধেকটা মূখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টোক তক্ তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভাবি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভাবি মশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চাড়িয়া, জলে কাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চাড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে কাঁপ দিলেই আমার কাঁপনি দিয়া জ্বর আসিবে। চূপচাপ করিয়া দাওয়ার একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির

মতো তর্ তর্ করিয়া চাঁড়িতে পারিত, আজ বড় শরীর লইয়া সে গাছে কিছতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কঁচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বড় সূশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চাঁড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সূশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, “ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজ্জাস কিনে আন।”

লজ্জাসের প্রতি সূশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজ্জাস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা বাহা পাইত, তাহাতেই লজ্জাস কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজ্জাস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজ্জাস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজ্জাস কিছতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজ্জাস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সূশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সূশীলের সম্মানে আসিয়া বড়ো সূশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সূশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বন্ধ ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুটামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছতেই স্কুলমুখে হইতে চাহেন না। সূশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, “বাবা, ইস্কুলে যাবে না?” সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, “আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।” সূশীল রাগ করিয়া বলিত, “পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।”

বাস্তবিক সূশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সূশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃষ্ণ সূশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কুস্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সদর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি-গোলমালে তাহার পড়ার

ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক করিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাঁছিয়া দিত যে, তাহার একটা করিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলার বৃদ্ধা সুশীলের ঘরে অনেক বৃড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠান্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাতি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অস্বল হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে; সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাহার সর্বাপেক্ষ হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত বাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজকাল বৃদ্ধা সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হস্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাট, পায়ের গাট ফুলিয়া বিষম ব্যত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বকাল অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্টন্ বন্বন্ করিয়া উঠে। মূত্থের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বৃদ্ধা হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দৃষ্টান্তি করিয়া পাড়ার বৃড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুড়িয়া মারিত—বৃড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দৃষ্টান্তি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়ইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বৃদ্ধা মনে করিয়া, যেখানে বৃড়ামানুষেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বৃড়ার মতো কথা বলিত; শুনিয়া সকলেই তাহাকে “যা যা, খেলা কর্ গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না” বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, “দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।” শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেণের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, “ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।” নাপিত ভাবিত, ছেলেরিট খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, “আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।” আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে

সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, “পড়াশুনো করে তোমার এই বদ্বিষ্ণু হচ্ছে? একরকম ছেলে হয়ে বড়োমানুষের গায়ে হাত তোল।” অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, “আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।”

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, “হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।”

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, “কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?”

তাহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কাহিলেন, “দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদেরিগকে তাহাই করিয়া দাও।”

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, “আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।”

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বড়ো হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, “সুশীল, ব্যাকরণ মন্থস্থ করবে না?”

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।”

## দুরাশা

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলের প্রাতঃকালের আহাৰ সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বৃত্ত এবং আপাদমস্তক ম্যাকটন পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্রমে ক্রমে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুস্বাটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বত-সম্বন্ধ সমস্ত বিশ্বাচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মর্দাছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতোছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের স্করুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিকবসনাবৃত্তা নারী, তাহার মস্তকে ম্বর্গকপিণী জটোভার চূড়া-আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিনসঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘাশ্রয়কার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল; পর্বতশৃঙ্গে সম্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনও চম্চক্কে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।”

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, “আমাকে ভয় করিও না। আমি ভুল্লোক।”

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, “বহুদিন হইতে ভয়ভরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে জেনানার ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।”

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি। কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা শ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার

উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবীয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?”

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, “আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।”

বদ্রাওন কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাহার কন্যা যে কী দৃষ্টিতে সম্মানসূচক দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিস্ময়বিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মূখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, “বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।”

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দৃঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, “বৈঠিয়ে।”

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাহার নিকট হইতে সেই সিন্ধু শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নূরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নূর-উল্-মুল্ক্ আমাকে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে তাহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পার্শ্বক আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিন্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্ত দুইটি পাশ্চ নরনারীর রহস্যলাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোক্ষ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দ্রাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৃট এবং ম্যাকিন্টশ পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কন্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একট উপবেশন-পূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগোরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে এমন নবাবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্প দশ দিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ৰলঙ্কা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি—এক নবাবকশিত বাঙালি সাহেব— দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অর্বাশষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সন্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, “বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।”

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, “কে এ-সমস্ত করার তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।”

আমি কোনোরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, “তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।”

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরওয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্কাটা রোডের ধারে বাসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, “আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস করেন তো বলি।”

আমি শশবাস্ত হইয়া কহিলাম, “বিলক্ষণ! ফরমায়েস কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।”

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতোছিলেন আমার মনে হইতোছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া ঝাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অব্যাহত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খন্ড খন্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতোছিলাম। ভাষার সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, “আমার পিতৃকূলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সম্মান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষণায়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্ততঃ করিতোছিলেন, এমনসময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার-বাগানদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।”

স্বীকৃষ্টে, বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলায় মূখে হিন্দুস্থানী কখনও শুনিনাই, শুনিয়া ম্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিলাম, এ ভাষা আমার ভাষা—এ যে দিনের ভাষা সে দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে-টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরাচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিংয়ের ঘনকুম্বাটিকাজালের মধ্যে আমার মনশঙ্কের সম্মুখে নোগলসম্রাটের মানসপুত্রী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তররাচিত বড়ো বড়ো অপ্রভেদী সৌমশ্রেণী, পথে লম্বপৃচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মহলক্ষের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্নর্গকালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উকীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পারজামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে এক শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুদলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।



নবাবপুত্রী কাহিলেন, “আমাদের কেজা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।”

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মন্থুর্তে উপদ্রু করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছাড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চাড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

“কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদীক্ষণ করিতে করিতে জোড়করে উর্ধ্বমুখে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিংহবস্ঠে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সূকশ্ঠে ভৈরোরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনও স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনারিবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদ ভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকারি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নিজ্বন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোখিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভীতি-মাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শূন্যচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত, ব্রাহ্মণের পূণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদাহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বান্দি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষ্যাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম পার্বণ উপলক্ষ্যে এই বান্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দীক্ষণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, ‘তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?’ সে জিভ কাটিয়া বলিত ‘কেশরলালঠাকুর কাহারও অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।’

এইরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কেশরলালকে কোনোরূপ ভীতিচক্রে দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুধা ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাহারই পূণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তস্রুতে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপূর্ণ দশা আমার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইত। মর্ত্তিপ্রতিমর্ত্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়ার্চিত

দেবালয়, ধূপধূনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, বোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছন্দবেশধারী দেবতাদের বিচিত্রলীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুন্দর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকটে একটি পরমরমণীয় রূপকথার বাজ্য ছিল।

এমনসময় কোম্পানিবাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্ষাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানে রাজপদ লইয়া দাত্তীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুটুম্ব-সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যয়ে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানি-বাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতার আমাদের সকলের মনেই যিকার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে ফৌজ লইয়া সমস্ত কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে ষতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না; কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুর্দল পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ষতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্বেকি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগর্দল মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমনসময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে জিলার কমিশনার-সাহেব লালকর্তি গোবা লইয়া আকাশে ধূলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, এঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে

প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লঙ্কায় ঘুণায় বৃক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীর্দ্র ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অস্তঃপূর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধূলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ ধামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি ম্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনার তীরে আশ্রয়স্থানে কেশরলাল এবং তাহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বৃষ্টিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে, রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বৃভূক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলাসিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাহার পদধূলি মর্ছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিনের নিরুদ্বেগ অশ্রুরাশি উন্মেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাহার মুখ হইতে বেদনার অক্ষুণ্ণ আত্মস্বর শুনিয়া আমি তাহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম, শূন্যলয়, নিমীলিত নেত্রে শূন্য কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাঠবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চাליয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত গুণ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনার জল আনিয়া তাহার মুখে চক্ষে সিঞ্জন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গো করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি

মুছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি বোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনও বাহিরাকাশের লুপ্ত তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বাহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।”

আমি নির্বাণিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্তার্ণবের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতোঁছিলাম কি ভাষা শুনিতোঁছিলাম কি সংগীত শুনিতোঁছিলাম জানি না, আমার মূখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, “জানোয়ার।”

নবাবজাদী কহিলেন, “কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুবন্দনার সময় মূখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।”

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, “তা বটে। সে দেবতা।”

নবাবজাদী কহিলেন, “কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!”

আমি বলিলাম, “তাও বটে।”

বলিয়া চূপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, “প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মৃত্যুভের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে পূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সূদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদুহিতাকে ভুলদাঁষ্টতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল গালিতে পারি না, কিন্তু তাহার মূখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মূখের দিকে চাহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেরানোকা বাধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাধন খুলিয়া দিল, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্তোভে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিব্যার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার প্রতিমূখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তম্ভ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপলকিত নিস্তরঙ্গা যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পদ্মমঞ্জরীর ন্যায় এই বার্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আশ্রবনের উর্ধ্ব আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্রণ কেল্লার চড়াগুডাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর একতানে মৃত্যুর গান গাইল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারার্থচিত্ত নিস্তম্ভ তিন ছুকন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল

বাঁচিভগাবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষেবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুদালুকা কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুম্মদগর্ভ বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।”

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুর্হিতা কহিল, “ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্টা ত্যাগ করিব, কোন্টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপদের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবার বাহিব হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে— তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখে-দুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদুর্হিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতস-বাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের, সেই চরম দুঃখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।”

এই বলিয়া নবাবপুত্রী ধামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, “বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর-একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।”

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্দ।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু

কোনোমতেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাজ্জর আকাশতলে অকস্মাৎ কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও ঈশানে, কখনও নৈঋতে, বজ্রপাতের মতো মূহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মূহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্ৰমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবাহি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্ত-রশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে-সকল বীরমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি। কোথাও কেশরলালের কোনো সম্বান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাঙ্গা কহিল, 'কখনও নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই। সেই ব্রাহ্মণ, সেই দুঃসহ জ্বলদাণ্ডি কখনও নির্দাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনও কোনো দুর্গম নির্জন বজ্রবেদীতে উদ্ভূতশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথাই কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম, কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষভেজে আমার সর্বাপ্নে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপূর্ণ দীপ্তি লাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মূদ্রিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্ততঃ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নির্দিষ্টকাল কোন্ অনির্দেশ রহস্যান্তিমুখে ধাবিত হইতেছে— তাহার কোনো সঙ্গী নাই, কোনো সেবক নাই, কাঠাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পূর্ব আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমনসময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম,

কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভূটিয়া-লেপ্চাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার বিচার নাই, ইহাদের দেবতা, ইহাদের পূজার্চনার্বিধি সকলই স্বতন্ত্র; বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শূচিতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।”

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “কী দেখিলেন।”

নবাবপুত্রী কহিলেন, “দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভূটিয়াপল্লীতে ভূটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্র মলিন অঙ্গনে ভূটা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।”

গল্প শেষ হইল; আমি ভাবিলাম, একটা সান্দ্রনার কথা বলা আবশ্যিক। কহিলাম, “আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।”

নবাবকন্যা কহিলেন, “আমি কি তাহা বৃষ্টি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যেষ্ঠানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্টিভিত্তিক ভক্তিবৈগম্যিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে স্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।”

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “নমস্কার বাবুজি!”

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, “সেলাম বাবুসাহেব!” এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমালয়শিখরের ধূসর কৃষ্ণাটিকার শির মধ্য মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মূদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মহালক্ষ্মীর আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা বোড়শী নবাববালিকাকে

দেখলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্তি দেখলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যান্‌কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাঙ্কন ভ্রম-হৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্যমূর্তিও দেখলাম—একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উদ্‌ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া সিন্ধ রোদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ ব্যয়-সেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজড়িত মৃদুমন্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সর্বলোকিত অনাবৃত জগৎদশ্যের মধ্যে সেই মেঘাঙ্কন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুরাশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কম্পনাখন্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেদা কিছই হয়তো সত্য নহে।

বৈশাখ ১৩০৫



## পদ্মপ্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বড়িতেন এবং পদ্মার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পদ্মাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূলা বর্তমান, তাহার নববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পাবলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিন্তাধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বাসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুদ্ধীক্ষিত হৃদয়েব তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক এই কয়সটাতে ভালোবাসা দেওয় এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিতৃশাশুড়ীর এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সম্মুখ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলাবৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্দ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বর্ণিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এই-সকল চাপাচূপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পদ্মের নরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকতে হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যৌদিন তাস খেলিবার সাথী না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সঙ্কটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নমনমন পড়িয়া থাকিতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বৃষ্টিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারও বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাম্বুরে গোপনে জলসিগুন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের স্নাতীক্ষ্ম ক্ষমতাটা একজন পুরুষ মানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে তাসের হারাজিৎ ও ছজাপাজার পুনঃ পুনঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্ধামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্ন শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বৃষ্টিতে পারিতেছিল না; রক্তশ্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লঙ্ঘায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমনসময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, “বৌঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।” বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হৃষ্ম এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সন্দীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা কড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেক্ষা কম্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বৃষ্টিতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াক্ষয় জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, “কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।”

বিনোদা শয়নকক্ষের স্মার রোধ করিয়া বিছানার শূইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক ধামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গুণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

তখন বিনোদা জানিত না যে, ‘প্রজনার্থং মহাভাগা’ শ্বশী-জন্মের মহাভাগা সে

লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সঙ্গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বহু বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবল কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেন্ট ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়ন্তম্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু, কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অশ্রু তাহার অর্দ্র চক্ষু জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন— কারণ, সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুরবায়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহু কাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অশ্রুর মধ্যে বসিয়া ভাবিতোছিলেন, আমার অন্ন কে খাইবে, তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতোছিল, কী খাইব।

ঠিক সেই সময়ে চারি মাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতোছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সারাহে অপর্ণান্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া ঝাঁর সরা ভাড়ি এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে মৃদানিস-পালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতোছিল। অশ্রুর গণ্ডে দুর্ভিক্ষকাতর বড়ুকুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত স্কারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বেল-মাণ্ডিত দালানে একটি শ্বেতলোদর সন্ন্যাসী দুই-সের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুগ্ধ-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজন-যাপার নিরীক্ষণ করিতোছিলেন, এমনসময় কোনোমতে স্কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকারা রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া কণি স্কারে

কহিল, “বাবু, দুটি খেতে দাও।”

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!”  
গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণ স্বরে কহিল, “ওগো, এই ছেলোটিকে  
দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।”

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন  
বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ  
সম্রাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুপ্ত করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১০০৫

## ডিটেক্টিভ

আমি পদলিসের ডিটেক্টিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল— আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্তবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতোঁছিলেন, অতএব সহসা সম্ভ্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমন বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পদলিস-বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেক্টিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কঙ্কলপাত হই তেমন আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাকে আমার কিছু কাজের বাঘাত করিত, কারণ পদলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়, তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরও যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, “তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?” আমি তাহাকে বলিতাম, “সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।”

স্ত্রী বলিত, “সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।”

ডিটেক্টিভ-লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীর্ণ এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নিজীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুর্হতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না। জ্বালিয়াত যে জ্বাল বিস্তার করে তাহাতে অনর্নিবিলম্বে নিজেরই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধবাহু হইতে নিগমনের কটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নিজীব দেশে ডিটেক্টিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি ‘ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো অনাড়াই নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।’ খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, ‘গবর্মেন্টের সমুদ্রত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো

গোরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে উদার কম্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!

আমি কম্পনাচক্ষে যখন লন্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাস্পাকুল অপ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুণ্ডিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে যুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাত্‌ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মৃত্ত-ন্যাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রাস্তাবাটনা, গৃহকার্ঘ, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, নাস্পত্যকলহ, বড়োজোর প্রার্থাবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছুর নাই—কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনও এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মূহুর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে সয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুঁজিতে তা দিতেছে।

আমি অনেকসময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পাঁথকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভাঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেকসময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশোর সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা 'নস্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমনকি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পাঁথকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো-একটা উৎকট দৃষ্কার্ব সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি—সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই-সকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিত করিয়া বৃন্দবরসে পেন্সন লইয়া মরে; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার স্বরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিকল্প ঘটিবার্টিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্পোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজের অশ্বকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী; আমি মনে মনে কাঁহলাম, দৃষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই তাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বথয়ে পরিহার করে; সংকার্ব করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দৃষ্কর্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরূহ। দেখিলাম, এই ছোকরার্টির চেহারাটাই ইহার

সর্বপ্রধান বাহাদুর; সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, “ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সর্বাধিষ্টি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বল সাবাস্।”

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, “এই যে, ভালো আছেন তো?” সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চর্মকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, “মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।” মনে করিলাম, কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চর্মকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সে চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্পোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃষ্কারিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শূইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপাধিচিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্পোস্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মূখচন্দ্র আঁস্কত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলোটের প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দৃষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মূখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র স্বেধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা গুণ্ডাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালমূর্ত ছেলোটের হৃদয়স্বার উন্মোচন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদগদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, “ভাই, একটি স্থীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।”

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মূখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “এরূপ দুর্বোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর

বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।”

আমি কহিলাম, “তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাই।” সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে স্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ব হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অর্কিণ্ডকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতাই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুকাজনক হইয়াছে—যে অসামাজিক মনুষ্যসম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্য-সমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎব্যবহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর; আধুনিককালের চশমা পরা নিরীহ বাঙালি ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুর্লিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাম্বুকী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া ‘আবার গগনে কেন সূর্য্যশু-উদয় রে’ কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমনসময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ভিমাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, “আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসার”—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলাকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ



প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলোটর যেমন সাহস তেমন তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো-একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেইদিন অবকাশ বৃদ্ধিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নতুন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমভিনয়, ইহাকেও মন্থন আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে সে আমাদের লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সেই ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নতুন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না— অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমনকি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্ষ এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সর্বিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্থনের আচরণের পূর্ণ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মন্থনের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মংলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল— মন্থন কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্থনের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, “আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলের খাওয়ানো সংকল্প করিয়াছি।” শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, “ভাই, মাপ করো, আমার পাক্ষিকের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।” হোটেলের খানায় মন্থনের কখনও কোনো কারণে অন্তির্দ্দিচ দেখি নাই, আজ তাহার অন্তির্দ্দিচ নিশ্চয়ই নিতান্তই দূর হইয়া উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসার থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পাড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “হরি-মতিকে আজ আনিতে যাইবে না?” আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, “হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাতে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।” এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যেপ্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেসসীসমাগমোৎকর্ষিত প্রণয়ীর ন্যায় মূহূর্মূহূ ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোখলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমনসময় একটি রুম্বম্বার পাল্কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুষ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গর্দিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাই-হুই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি কাঁচিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া-শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মূখ্য করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুষ্ঠিত নারী বসিয়া মদুম্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, “ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।” মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পাড়িল যে, বোধ হইল যেন তখন সে মাটিতে পাড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় বাগ্য হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, “ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি।” সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুস্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুষ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি মন্মথর কে হন।” কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন। তাহার পব কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেক্টিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎকণ পরে ডিটেক্টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, “মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিবুদ্ধ না হইতেও পারে।”

মহিম কহিল, “না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাস্তব হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।” বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

সুচরিতাসু,

হৃৎভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজি-

বাড়ির মাতুলালয়ে বাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় খৈর্বে'র বাঁধ ভাঙিয়া এবং লঙ্কার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কতারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চারপাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো সম্বন্ধ পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পদলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সম্বন্ধ করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্ভ্রামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুর্যভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাস্‌পোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন-ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মূহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বৃদ্ধিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা-ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্শ মাপ করিয়া শত্রুবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাই, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গ কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে; ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমন্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদন্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার বাহা বক্তব্য তাহা তাহাকেই বলিব।

নিতাশ্ভাঙ্কী  
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

## অধ্যাপক

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজ্ঞদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ডুল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রম্ভার পাণ্ড হইয়াছিল।

কলেজে এইরূপে শেষপর্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নতুন অধ্যাপকের মূর্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদ্ভিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাহার নাম গোপন করিলেও তাহার উল্লেখ নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাহাকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি-সাহেবের বিশেষ প্রশংসালভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু লোকটি স্বাহু বলিয়া কেমন তাহাকে অত্যন্ত সূদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত; আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নবাবহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাহাকে বহুদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে সভাব নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছাত্রশ জন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট এক জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার ধেরূপ ধারণা উক্ত পয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্জাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতামাট্রেই চমৎকৃত হইবে—চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্জাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজি ভাষার বিশুদ্ধ তেজস্বিতার বিমূগ্ধ ও নিরন্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারও কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণবাবু উঠিয়া শান্তগম্ভীরস্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল-সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমৎকার এবং যে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমনকি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিল, “তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কী বলিতে পারে।”

রাজা শিবসিংহের মহিষী লিছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্বোচ্চশ্রেণীর। আমি আপনাকে ষতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহার চেয়েও বেশি মনে করিত। অতএব আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইরূপ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল, ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণবাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব -সকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃষ্টিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল থাকে, বামাচরণবাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমনকি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদস্যুর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা—এমনকি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমনকি, সের্গুপয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইরূপ আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায়

পাঁচসাত দিন পরে একে একে উত্তরগর্দল দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকিতে সে অস্ত্রগর্দল আমাকেই বিধিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগুলো অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগর্দল আমার সহাধ্যায়ী গর্দভদিগের বৃষ্টির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল। তাহারা জানিত, চূরিমাগ্রেই চূরি; আমার চূরি এবং অন্যের চূরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বৃষ্টির সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গর্দভিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অম্লোর শ্রম্বা কিছুতেই হাস হইল না; প্রভাতে যখন যশঃসূৰ্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রম্বা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়া ছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূৰ্য অস্তোন্মুখ হইল তখনও সেই শ্রম্বা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রম্বার কোনো পরিভ্রান্ত নাই, ইহা শূন্য ছায়ামাত্র, ইহা মৃৎ ভক্তহৃদয়ের মোহাম্বকার, ইহা বৃষ্টির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

### শ্বিতীৰ পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতোছিল। আমার লেখক অংশ বলিতোছিল, আমি ইহার পরিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক পদ্যে হউক, খুব 'সারাইম'-গোছের একটা-কিছু লিখিব; বাঙালি সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত-অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অম্ল্যাকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তখনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদ্রবতী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়িত নেত্র আমার মূখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “বাঙ ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।”

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসন্নগৌরবগর্ভিত ভক্তি-

বিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাসকাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কন'ওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীর্তি, অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নিৰ্জন ঘরে চিত হইয়া শুনইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহ্নে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিন্তাবিনোদন ও সময়ষাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্ধিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বসিতাম, টেলিগ্রাফের কাটা কট্‌কট্‌ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোক-সমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লোহসরীসূপ ফর্ষিতে ফর্ষিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়াহুড়ি পড়িত—কিয়ৎক্ষণের জন্য কোঁতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহা করিয়া সঙ্গী-অভাবে সকাল-সকাল শুনইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় ষাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্য শ্মশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অমূল্যটাও এমনি গর্ভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে—মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি—কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীমুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্কেশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌বন্দ্য বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরস্পর শোনা গিয়াছিল যে, তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কোঁতুকবহু ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বকলি মঞ্জুমদার-নামক একটি কাম্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীর এক প্রহসন

লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমনসময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্নে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্ত্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়সাপনের উদ্দেশ্যে বায়ুভরে উত্তীর্ণ চ্যুতপত্রের ঋতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দায় সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাঢ়সংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মৃদামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্তী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই; কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি ষোড়শী বৃবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনোরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুঃখান্ত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চাড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দর্শমিনিটকাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই তাহার জীবনে সকল দেখাশুনোর সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ার বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারী তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

পৃথিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অন্ধ ছিলাম তাহা এই উত্তরদিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনামোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনও সুন্দর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুন-শেষের অপরাহ্নে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দুইমিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিন্ন দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সম্মুখ প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে



প্রসারিত-চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদ্ভিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাত্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সে আমার পক্ষে একটা নতুন রহস্য-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপর সেই অপরাহ্নবেলার ছায়া ও রবিরাশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মর এবং সেই যুগলচন্দ্র ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন অংশ, কাব্যের কোন রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সপ্তে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুগ্ধ কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহৃদয়ের নিভৃত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়ী কী অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃজন করিতেছিল— অর্ধেক রাতি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিষ্কটরূপে বাক্য করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপূর্ববর্তী প্রেমিক দৃশ্যান্তকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মানুসকে সত্য মিথ্যা চের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দৃশ্যান্তর এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না; কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেটন করিয়া করিয়া উর্ধ্বকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরিদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাষ্টারদিগকে দাঁড় টানিতে নিবেদন করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কন্বের কুটিরের মতো ছিল না; গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল দেখিলাম, আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে তাহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস দিয়া উর্ধ্বমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিঁড়িতে এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেটন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে প্রসৃত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মূর্তিমতী মধ্যাহ্নকালী। সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দ-সুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুদূর পরপার এবং উর্ধ্ব তীরতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাঙ্গারূপিনীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অজস-

বিন্যস্ত বাম বাহু, সেই উৎকীর্ণ বস্কম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তম্ব একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মর্দিয়া গইলাম।

অবশেষে নোকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটি তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী-একটা ঘর্নিট স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কইলাম, “মাঝি, আজ আর আমার হৃৎগলি যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।” কিন্তু ফিরিবার সময় উজ্জানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীরু। নোকা যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মৃদু তুলিয়া মৃদু কোতুহলের সহিত আমার নোকায় দিকে চাহিল, মৃদুত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় তাহার বাঁজল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার স্কোড় হইতে একটি অর্ধদণ্ড ম্বল্লপক পেয়ারা গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দর্শনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমালাদের লঙ্কার তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোলুপারমান জোয়ারের জল ছলছল লুশ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নিলঙ্ক অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্রিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষছায়ার পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্তদিন ম্বল্ল দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে—আকাশ আলোকিত, ধরণী প্দলকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিম্পন্দ সুন্দর; তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতার তন্ত-যৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিকীর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই ম্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবরুণ ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর, সে আমাকে অহরহ মৃকভাবে অনুন্নয় করিতেছে, “আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অব্যক্ত স্তব উদ্ভিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলা!”

প্রকৃতির সেই নীরব অনুন্নে আমার হৃৎসের তন্ত্রী বাঁজিতে থাকে। বারম্বার কেবল এই গান শুনি, “হে সুন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণ-পতঙ্গের একটিমাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!” এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিষ্কৃত

করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না; মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনও তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার জলাট অলৌকিক আভাস আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমনসময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অম্বলা নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে ষেরূপ ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রুর প্রতিও কাহারও যেন সেইরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ার নিত্যন্ত ক্ষিপ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অম্বলার মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সর্চিকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মৃদুমন্দগমনে আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল, কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, “কী হে অম্বলা, ব্যাপারখানা কী! তোমার পায়ে কাটা ফুটিল নাকি।” অম্বলা ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল; কহিল, “যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।” বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়স্বল্প উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুনে প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অম্বলা সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার সে কাব্যের কতদূর।” শুনিয়া আরও আমার গা জ্বলিতে লাগিল; মনে মনে কহিলাম, “যেমন আমার কাব্য তেমন তোমার বৃদ্ধি!” মুখে কহিলাম, “সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।”

অম্বলা লোকটা কোত্‌হলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না, তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ও দিকে কী আছে হে।” আমি বলিলাম, “কিছু না!” এতবড়ো মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনও বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া, দন্দ করিয়া, তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় টেনে অম্বলা চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে বাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাগ্ন করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার বহুভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমন করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অম্বলা চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মত্ত আকাশে প্রথম কৃকপাকের অপবর্ণিত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজালনিবন্ধ তরুপ্রণীতলে খন্ডিকরণখচিত একটি গভীর

নিভৃত প্রদোষাশঙ্কার; মর্ম্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতার তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃন্দ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতোছিল—বৃন্দ সন্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতোছিলেন। এই পবিত্র সিন্ধু বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে কাঁচৎ দাঁড়ের শব্দ সূদূরে বিলীন হইতোছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতোছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনার যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিষ্কম্বিত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল; আমি যেন বৃষ্টিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বৃষ্টিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন উর্ধ্বশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ঐ পদবিষ্কম্বিত, ঐ বিশ্রম্ভালাপ অবাবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝড়িয়া ঝড়িয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাবু তখন বড়ো এক পেয়লা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীল পেন্সিলে দাগ-করা একখানা হ্যামিল্টনের পুরাতন পৃথি মনোযোগ দিয়া পড়িতোছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অনামনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মূহূর্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া চমতভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি লজবাস্ত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, “আপনি চা খাইবেন?” আমি যদিও চা খাই না, তথাপি বলিলাম, “আপিস্তি নাই।” ভবনাথবাবু বাস্ত হইয়া উঠিয়া ‘কিরণ’ ‘কিরণ’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। স্কারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, “কী, বাবা।” ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকম্বদহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া চমত হরিণীর মতো পলারনোদাতা হইয়াছেন। ভবনাথবাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন; আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, “ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্র-কুমারবাবু।” এবং আমাকে কহিলেন, “ইনি আমার কন্যা কিরণবাবা।” আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতোছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনন্দসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি দুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাবু কহিলেন, “মা, মহীন্দ্রবাবুর জন্য এক পেয়লা চা আনিয়া দিতে হইবে।” আমি মনে-

মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অর্তিধর জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অর্তিধর পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দীভূগী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না!

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অর্তিধর। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি-এ পরীক্ষার জন্য জার্মানপান্ডিত-বিরাচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথবাবুর সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম। তিনি হ্যামিল্টন প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচলিত দ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনও নিবৃত্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাবু এমনি ভালোমানুষ, এমনি সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুব্ধ হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমন আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দূরূহ পান্ডিত্য কিরণের পক্ষে দূঃসহ; সে যখন মনে-মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্ছেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম। এখন আব সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিনী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাবালোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া একঁটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারী-কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই বাতৃভাষার আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দুই হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশ কিছু নয় কিন্তু বড়ো সুমিষ্ট—শাড়ির প্রান্তটি কখনও কবরীর উপরিভাগ বাকিয়া বেঁটন করিয়া আসে কখনও বা পিড়গৃহের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাঙ্গনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তবুও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বাসিত কৃতজ্ঞতারসে অর্তিধর হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহ-

সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল, এবং অন্যতকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাধিবাবর সরঞ্জাম আনিয়া রাধিয়া ভবনাথবাবুকে ভৎসনা করিয়া বলিল, “বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাবুকে ঐ-সকল শব্দ কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আসুন মহীন্দ্রবাবু, তার চেয়ে আমার রামায়ণ শোণ দিলে কাজে লাগিবে।”

ভবনাথবাবুর কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাবু অপরাধীর মতো অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তা বটে! আচ্ছা ও কথাটা আর-একদিন হইবে।” এই বলিয়া নিরুদ্বেশচিত্তে তিনি তাহার নিত্যানির্মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহ্নে আর-একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমনসময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, “মহীন্দ্রবাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলা মারিয়া দিতে হইবে।” আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাথবাবুও প্রফুল্লমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাবুর কাছে আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে-মনে পূর্লকিত হইয়া উঠিতাম; আমি বৃদ্ধিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি; সে কেমন করিয়া বৃদ্ধিতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সূচ্য নহে।

বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দূরস্থ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, “মহীন্দ্রবাবু, রামায়ণের পাশে আমার বেগুনের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনি গে, চলুন।”

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কম্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোনো-এক রূপে তাহার সীমা থাকি কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, “মহীন্দ্রবাবু, দুটা আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।”

কী উদ্ভার, কী মৃষ্টি! অকল্প সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মূহুর্তে কী সুন্দর ক্লে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দৃশ্যে জটিল হউক না কেন, কিরণের বেগুনের খেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোনো-প্রকার দ্বন্দ্বিতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবোঁচক স্বপ্নের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আশ্রয় তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সীতার দিয়াছে। আমি এতদিন কম্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সঞ্জন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে ভুলতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল হৃদয় লয়ে সংগীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও ডল পাওয়া

যায় না। কিরণ সেখান হইতে মঞ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়৷ যখন তাহার আমতলায়, তাহার বেগুনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রান্না, মই চাড়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘনসবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সম্বন্ধে পরিচয় করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দ-লাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না—আপনি যে কথা মূখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে, এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষয় বিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্ছেদপ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মূহুর্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ!

ইতিপূর্বে আমি কোনো অনায়াসীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, যে নব্যরমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধে বাহিরে সঞ্চার করেন তাহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি, অতএব তাহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার তাহা আমি কিছুই জানি না; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসবে, আমি কোন্‌ অংশে ন্যূন।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম; চাটি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ সরে বলিত “মহীন্দ্রবাবু, কাল সকালে আসবেন তো?” তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জন, বন্দু, কী মোহিনী জন!

অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা-হেন!

আমি সহজ কথার উত্তর করিতাম, “কাল আটটার মধ্যে আসব।” তাহার মধ্যে কিরণ কি শূন্যে পাইত না—

পরানপূর্তাল তুমি হিরে-মণিহার,

সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কল্পনা মূহুর্তে মূহুর্তে নতন নতন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টিত করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শূভ-অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শুনাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমনকি স্থির করিলাম জার্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিন্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে বর্জিতে

পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে-মনে হাসিলাম, কহিলাম, “কিরণ, তোমার আমতলা, বেগুনের খেত আমার কাছে নতুন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং কড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মূহুর্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।”

সূর্যাস্তকালে দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াকে ক্রমেই যেমন পরিষ্কৃত দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাভণ্যে নারীত্বের পূর্ণতার যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃন্দ পিতার শূন্যকেশের উপর পবিগ্রতার উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর মূদ্রিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংকীর্ণ হইয়া আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সন্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল— এ দিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোনদিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পশ্মবনের মাঝখানে ফস্ করিয়া তাহার বিপুল চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ উদ্বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবুর গৃহে গিয়া দেখি, তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দার নির্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নতুন কাব্যসংগ্রহ, যে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্ভূত এবং তাহার পার্শ্ব লাল কালিতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ম্বন্দ্রভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল; বোধ হইল যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হৃদয়তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তম দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না; মহীন্দ্রনাথ-নামক কোনো বাঙালি বৃদ্ধকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর-কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পালে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেঙ্গিল দিয়া



একটি উজ্জ্বল রঙচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পূলকোচ্ছ্বাসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম, “কী পড়িতেছেন।” পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, “বইখানা একবার দেখিতে পারি?” কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, “না না, ও বই থাক্।”

আমি কিস্কন্দুরে একটা খাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজি কবির জবানিতে বাস্তব হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে স্দগভীর নিস্তত্বতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশঙ্কগর্দল জননীর ঘুমপাড়ানি-গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং স্করুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল; কহিল, “বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?” আমি মনে-মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শূভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, “আমার কতকগর্দল কবিতা আছে, আপনাকে শুনাইব।” কিরণ কহিল, “কাল শুনিব।” বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।” ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাহার সরল নেত্রম্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নিজের শয়নকক্ষে নির্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিভিশান-কোঠায় কিরণবাবু বন্দোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষার অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃৎস্নের ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবাবু বন্দোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবাবু। সে যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বন্ধু পিতা এবং তাহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনও আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিবৃত্ত ছিলাম যে, তাহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানগণ্ডিত-রচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তর্কগর্দল আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গর্দিতকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই তাহা হইলে

ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অন্যর লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। যদি এই কিরণ হয়!

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভ্রাতৃস্বয়ং অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম, “হয় হউক— আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।” বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্বাপেক্ষা উচুে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া বৃক্ষের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্য জার্মানপাণ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অন্যদরে পাড়িয়া রাখিয়াছে; খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিত পরিপূর্ণ। বৃক্ষ নিজে তাহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসমজ্যোতির্বিজ্ঞানিত মূখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো সুসংবাদের নিবন্ধধারায় তিনি সদা প্রাতঃস্নান করিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দৃষ্টের ভাবে বুদ্ধহাস্য হাসিয়া কহিলাম, “ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি!” যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্ষ হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্ষ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সন্মিতকরণ হইয়া আসিল, তিনি তাহার কন্যার পরীক্ষাস্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাহার সরল বৃষ্টিতে আমার গর্বের কারণ বৃষ্টিতে পারিলেন না।

এমনসময় আমাদের কলেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সবসোস্কন্দল মূখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছল্‌ছল্ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বৃষ্টিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার বচনাবলীর খাতাখানা পড়িয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

## রাজটিকা

নবেন্দ্রশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধুমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ইষৎ একটু হাস্য করিলেন। হাস্য, প্রজাপতির পক্ষে বাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দ্রশেখরের পিতা পুর্ণেন্দ্রশেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা-স্বারা রানবাহাদুর পদবীর উৎকৃষ্ট মরুকুলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরও দুর্গমতর সম্মানপথের পাথের তাহার ছিল, কিন্তু পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনাতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাঙ্কম গিরি-চুড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবন্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত লোকে গমন করিলেন এবং তাহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রস্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই—চণ্ডলা লক্ষ্মীর অচণ্ডলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবেন্দ্র নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুম্বাণ্ডের মতো ইংরাজের স্বেরে স্বেরে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি স্মিতীর দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারের বড়োভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি-এ এবং বৃদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের ধার ধারিতেন না; মূর্খতায় বলও তাহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণ ও পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রমথনাথ জাজ্বলমান ছিলেন, দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছরতিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মূর্খ হইয়া ভারতবর্ষের অপমান-দুঃখ ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল, অবশেষে দুইদিন পরে বলিতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর-কাহাকেও না; ইংরাজি বস্ত্রের গৌরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন 'কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্বার রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখাইব'—নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র জানিয়া

ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমনকি মধ্যে মধ্যে সাম্রাজ্যিক ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমস্ততার ক্রমশই তাহার শিরা-উপশিরাগর্ভে অল্প অল্প রীরী করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগর্ভে রাজপ্রসাদগর্ভিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলোহপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, “আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।”

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তখনই কৰ্ণধ্বসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে স্তান সূর্যাস্ত-আভা সক্রমণরিত্তম লঙ্কার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতাসনপথ হইতে অনিমেষনরনে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্ভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পশ্চিমবর্গ তাহার সম্মুখে ধূলার স্তম্ভিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মুঢ় গর্ভ আপন মনে ভাবিতেছিল, “সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।”

প্রমথনাথ মনে-মনে কহিলেন, “গর্ভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ বুকিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।”

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমস্টিন জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বাসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত লাহিত উপাধিধারীগণ পূর্ববৎ ইংরাজের স্মারে স্মারে উকীর আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্ভাগ্যে দুর্ভাগ্য নবেন্দ্রশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভাগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগর্ভে লেখাপড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেমনি: নবেন্দ্র ভাবিলেন, “বড়ো জিভিলাম।”

কিন্তু ‘আমাকে পাইয়া তোমরা জিভিরাছ’ এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন সাহেব তাহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশত দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান করিয়া

দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণপ্রথর হাসি যখন টুকটুকে মথমলের খাপের ভিতরকার ঝকঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জ্বলিল। বদ্বীল, “বড়ো ভুল করিয়াছি।”

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শূভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলদ্বার মধ্যে দুই জোড়া বিলাতি বড় সিঁদুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুলচন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধূনা জ্বলাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, “তোমার ইস্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাহার কল্যাণে তোমার পদবৃন্দ্বি হউক।”

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স্ স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সূতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, “ভাই, আমি একটি জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জপ করিবে।”

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, “যাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।”

নবেন্দুর মনে-মনে রাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যোদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, “সুন্দর বাঁড়ুজোর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।” দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, “মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চললাম।”

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকার পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে-মনে কহিল, “তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।”

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়-বাহাদুর-পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শূনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্বাসিত সংবাদ ভীরু বেচারী শ্যালীদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরৎশুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণ চিন্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবালোকে স্ত্রী পান্ডিক করিয়া তাহার বড়োদিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, “তা বেশ তো, রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লজ্জাটা কিসের!”

অরুণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, “না দিদি, আর যা-ই হই, আমি রায়-বাহাদুরনী হইতে পারিব না।”

আসল কথা, অরুণের পরিচিত ভৃত্যনাথবাবু রায়বাহাদুর ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আর্পিত্যের কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কাঁহল, “আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।”

বন্ধারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। সানন্দচিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চাড়া যাত্রা করিলেন। রেল চাড়িবার সময় তাহার বামাঙ্গ কাঁপল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাশুদুরে পূর্ণপরিষ্কৃত হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জননদীকূললালিতা অম্লান-প্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে বলমল করিতেছিল।

নবেন্দুর মৃগ দৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণপূর্ণিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ার নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শূশ্রূষাপূলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দূরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মতো অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপা-মিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে এক দিকে ক্ষুধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাটা এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন-ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সেজন্য প্রত্যহ তাহার গজনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষন্ড আত্মসংশোধনচেষ্টার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নতুন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাভণ্যর স্বামী নীলরতনবাব, আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, “কাজ কী, ভাই! যদি পাগটা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুট্‌ফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।”

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর-খেতাবের সম্ভাবনা আপনাই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজর্জাসিঙের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কনগ্রেসের সময় নিকটবর্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাভণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, “একটা সই দিতে হইবে।”

পূর্বসংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাভণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, “খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।”

নবেন্দু আশ্চর্যান্বিত কহিল, “সেই ভাবনায় আমার রাগে ঘুম হয় না!”

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, “তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।”

লাভণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিস্মৃতভাবে কহিল, “তবু কাজ কী! কী জানি কথার কথায়—”

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, “কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম কইয়া যাইবে না।”

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাভণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, “করিলে কী!”

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, “কেন, অন্যায় কী করিয়াছি।”

লাভণ্য কহিল, “শেরালদা স্টেশনের গার্ড, হোয়াইট্‌-অ্যাভের দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্ট্‌, হার্টব্রাদারদের সহিস-সাহেব, এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার পুঞ্জার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!”

নবেন্দু উদ্বেগভাবে কহিল, “তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।”

দিনকয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক X-স্বাক্ষরিত পত্রপেরক তাহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কনগ্রেসের চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার মতো লোককে দলে পাইয়া কনগ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেশ্বর! কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি  
করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে দুঃখও আছে। নবেন্দুর মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন,  
তাহাকে নিজস্বভাবে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায় অপর  
দিকে কংগ্রেস লাগানোভাবে ছিপ ফেলিয়া অনির্মিতলোচনে বসিয়া আছে, এ কথাটা  
নিতান্ত চাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা  
লইয়া লাগ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানে না, এমন ভাবে লাগ্য  
আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, “ওমা, এ যে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা!  
আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘন ধরে, তাহার কালিতে  
যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকের কাটে—”

নবেন্দু হাসিয়া কহিল, “আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রুকে মার্জনা  
করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সেনার দোয়াত-কলম হয় যেন!”

দুইদিন পরে কংগ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ  
ডাকযোগে নবেন্দুর হাতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে ‘One who  
knows’-স্বাক্ষরে পূর্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন  
যে, নবেন্দুকে বাহারা জানেন তাহারা তাহার নামে এই দুর্নামরটনা কখনোই বিশ্বাস  
করিতে পারেন না; চিত্তবোধের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অক্ষয়ালির পরিবর্তন যেমন  
অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কংগ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের  
ষথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মজেলশূন্য আইনজীবী  
নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া বেশভূষা-আচারব্যবহারে অশুভ করিবৃদ্ধি  
করিয়া স্পর্ধান্তরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া অবশেষে ক্রমশঃ হতভাগ্য  
ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই সকল— ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেশ্বর! ইংরাজের নিকট এত নাম, এত বিশ্বাস  
সঞ্চার করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেশ্বরের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য।  
ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি  
সারবান পদার্থবান লোক।

লাগ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, “এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্দু  
লিখিল! কোন্ টিকিট-কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের  
বাজনদার!”

নীলরতন কহিল, “এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।”

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল, “দরকার কী। যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ  
করিতে হইবে।”

লাগ্য উচ্চৈঃস্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির কোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “এত হাসি বে!”

তাহার উত্তরে লাগ্য পুনর্বার অনিবার্য বেগে হাসিয়া পদ্পিত্তবোঝনা দেহলতা  
লুপ্ত করিতে লাগিল।

নবেন্দু নাকে মখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল



হইল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, “তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!”

লাবণ্য কহিল, “তা কেন! আমি ভাবিতোঁছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনও ছাড় নাই—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।”

নবেন্দু কহিল, “আমি বৃষ্টি সেইজন্য লিখিতে চাহি না!” অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দু ষেটা জলে ও ঘিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া ষথাসাধ্য চেপ্টা করিয়া বেলিয়া দেয় তাহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবর্মেণ্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গবর্মেণ্ট অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবর্মেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দূর্ভেদ্য অন্তরায়। কংগ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সম্ভাবসাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ ‘লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে’ মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নিষ্ঠুর দেশ-হিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, “এখনও তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।”

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্বে বক্ষস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈলসঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এমনসময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকূতহলী চক্ষে আড়াল হইতে কোঁড়ক দেখিতোঁছিল।

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না—নবেন্দু ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিবাস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চাকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া উর্ধ্বশ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, “সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ-পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ বা লাবণ্যের, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়ফড় করে নবেন্দুর ক্ষুণ্ণ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শাইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাসোর সমস্ত আভাস মূখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্‌বিশ্বনভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?”

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্ৰোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, “তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের। তুমি আমার ধম্বস্তরিনী।”

কিন্তু, মূহূর্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, “একে আমি কনগ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!”

“হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি বাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।”

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগাড় পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, “যাও কোথায়।”

নবেন্দু কহিল, “একটা বিশেষ কাজ আছে—”

লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, “এখন দেখা হইবে না।”

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল, “আমরা পাঁচজন আছি।” নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটিজুতা ও মনিংগোন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে অঙ্গুলিসংকেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মূখ না তুলিয়া কহিলেন, “কী বলিবার আছে, বাবু।”

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, “কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—”

সাহেব ত্রু কুণ্ঠিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন, “সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!”

নবেন্দু “Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে” করিতে করিতে ঘর্ম্পদ্বত কলেবরে কোনোমতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাতে বিছানার শূইয়া কোনো দূরস্বপ্নশ্রুত মন্তের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, “Babu, you are a howling idiot!”

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধাবণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অম্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, “ধরণী মিথ্যা হও!” কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, “দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে

গিয়াছিলাম।”

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনহয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, “তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসে নাই তো?”

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দস্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, “বকশিশ, বাবুসাহেব।”

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, “কিসের বকশিশ!”

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, “ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিশ।”

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, “ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্রি ধরিয়াজেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় তো তাহার পূর্বে ছিল না।”

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, “বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাই মিলেগা।”

নবেন্দু সংকুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, “উহারা গরিব মানুষ, কিছুর দিতে দোষ কী।”

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, “উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।”

রুদ্ধ মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বহুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, “বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জান!”

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সম্মতিক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শব্দ করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, “আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।” কথাটার ষাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি ভারস্বরে ‘হিপ্ হিপ্ হুরে’ শব্দে তাহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লঙ্কার রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর বারবাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পদ্মমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা

সেদিন হাস্যে লজ্জার এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাণ্ডিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়ামালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুরকে কহিল, “আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।”

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সানন্দে পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্ভ্রামাই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সম্মুখে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে three cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!

আশ্বিন ১০০৫

## মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝ নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেথায়, সোনার রঙ হইতে ইম্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বখ-মূল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শূন্য চক্ষুর কোণ ভিজ্জবে-ভিজ্জবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শূন্যলয়, “মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।”

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বপ্নাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকরের যেমন একরকম বহুকালজীর্ণ সংস্কারবিহীন চেহারা, ইহারও সেইরূপ। ধূতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপাশ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, “আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।”

“কী করা হয়।”

“ব্যাবসা করিয়া থাকি।”

“কী ব্যাবসা।”

“হরীতকী, রেশমের গুঁটি এবং কাঠের ব্যাবসা।”

“কী নাম।”

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, “এখানে কী করিতে আগমন।”

আমি কহিলাম, “বায়ুপরিবর্তন।”

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, “মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।”

আমি কহিলাম, “এ কথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর ষথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।”

তিনি কহিলেন, “আজ্ঞা হাঁ, ষথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।”

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, “এই বাড়িতে।”

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্ত-ধনের সম্বন্ধ পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইন্স্কুলমাস্টার। তাহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোলরিঞ্জের স্মৃতি প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝ নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আড়াটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকান্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তত্ব দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্স্কুলমাস্টার কাহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিকৃষ্ণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাহার অপূত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে তর্কিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাহাকে দেখিবামাত্রই নবাবগা বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালো-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চলচলন আর রহিল না। এমনকি, ব্যাঘ্নো হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লস্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কৃত্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। সাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিশু শান দিবার জন্য হরিণ শব্দ গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অর্থাৎ স্ত্রীলোক দুর্বল পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারী একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শান-দেওরা যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাল ও নাগপাশ-বন্দনগর্দল পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে

চার, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ড্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদন্ত সূমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল—ব্যবসায়ের সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যের তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বৃষ্টি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বৃষ্টিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা করিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চাম্বিশ বৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোন্দ বৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বয়সের পিণ্ড, যাহাদের বৃকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিদ্ধকের মণিমালিকা অপেক্ষা বেশি করিয়া বৃষ্টিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উস্তাপে তাহার হৃৎপিণ্ডের বয়সপিণ্ডটা গলাইয়া, সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার স্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া বাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সপ্তীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নার তাহা পদে পদে এবং তাহা চম্বিশ ঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পারিতন্ত্রতাটা স্ত্রীর পক্ষে গোরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সুকুম্ব নিষ্টি ধরিয়া তাহা অহরহ ভৌল করিতে বসি কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্তি, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অল্পপরিমাণের মধ্যে কতটা বিপুলতা— ভালোবাসাবাসির তত সুসুকুম্ব বোধ-শক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথাই মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চূনিয়া চূনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই মেয়েদের বল, তাহাদের জীবনবাবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসা-মান বস্তুটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে বুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষেরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেকা দিয়া এই দুর্লভ বস্তুটি, এই দিগ্‌দর্শন বস্তুশালকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতার সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শূভবিবাহের পূর্বে পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কার দরু দরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ কখনো নূন কম হইত না এবং পানে চূন বেশি হইত না, তথাপি মণিভূষণের হৃদয় কী-কেন-কী-নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব



করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সন্দেহ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামন্ডার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দূর্গামোহন ভালোবাসা এত সুক্ষ্ম করিয়া বৃদ্ধিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শূগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শূগালসম্প্রদায় ইন্সকুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদূর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অটুহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল ম্বিগুণতর নিস্তম্ভ হইলে পর মাস্টার সম্মুখ অন্ধকারে তাহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসয়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোন্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায়, তাহা হইলেই মনুহর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালতরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের ম্বিগুণ অনিশ্চয় হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চটপট এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে বাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দূর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মূখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাকথানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেরসীর নিকট হাণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যান্ডনোটের প্রসঙ্গ ভুলিতে হয়; কিন্তু সূর্য বাধিয়া যায়, বাক্যস্থলন হয়, এমন-সকল পরিষ্কার কাজের কথায় মধ্যেও ভাবের জড়িতা ও বেদনার যোগে

আসিরা উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্লেভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটীয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বাসিরা বাসিরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তিনমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না, ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অপ্দবীকণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুদ্ধিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নবা পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের বে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বৃদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল—অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বৃদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কাহিল, 'যাব্দ কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যে-রূপ জানিত তাহাতে বৃদ্ধি, এইরূপ হওয়াই সম্ভব

এবং ইহাই সংগত। তাহার দৃষ্টিচলিতা সূতীর হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র ষড়ের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্কের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মৃদুতেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহবরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কাঁহল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কাঁহল, 'গহনাগদ্যলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমনকি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বৃষ্টিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কাঁহল, 'গহনার বাস্তুটা আমার কাছে দাও।' মণি কাঁহল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাস্তব করিয়া গহনা লইলে সে বাস্তব হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাস্তব না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বৃষ্টিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগদ্যলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বৃষ্টিতে না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কঠীকে পিত্তালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হুম্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ইকার এবং দন্তা-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অবস্থা প্রশ্ন দেওয়া যে পদ্রুর্ঘোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বৃষ্টিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর কতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিলা না।

নিজের প্রতি যে নিদারূপ অন্যারে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইল মাত্র। পদ্রুর্ঘমানুষ বিখ্যাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বহুদিন নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ করিয়া খুলিয়া উঠিতে না পারে তবে থিক্ তাহাকে। পদ্রুর্ঘমানুষ দাবান্নের মতো

রাগিনী উঠবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক প্রাণস্বেধের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কৰ্তব্য আমি করিয়া বাইব।' আরও শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশান্তিতে জগৎ চলিবে তখন বাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীযুগের ফণিভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, শাস্ত্র বাহার বৃশ্চিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনও সে কোনো কথা উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদস্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য-কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লালিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অন্ততস্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের স্বেদের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, স্বেদ রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পাড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই। স্বামীর বৃকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মৃত্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে-মনে পদাঘাত করিয়া আত্মদরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃশ্চ বাহ্যিক গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চূপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কঠীবন্ধুর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিতালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পাড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রস্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তন্মাস করিতে পদলিমে খবর দেওয়া হইল—কোন নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সম্বান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিভ্রম শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিপ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোমাসির বাগা আরম্ভ হইয়াছে। মৃৎলথার বৃষ্টিপাতশব্দে বাগার গানের সুর

মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিখিলকঙ্কা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল—বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্টস্টুডিও-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চূড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিজলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেসের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যান্টার, শোখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কর্ড, এমনকি শূন্য সাবানের বাসগুঁড়ি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্রম গোলক-বিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প্‌ সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাচিত এবং স্লোন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্প্‌টি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ-মুহূর্তের নিরন্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার স্বকুণ্ডিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুঁড়ি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন, তোমার অস্লোন সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো; এই-সকল মৃক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান ধামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরম্ব অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অপ্রভেদী সিংহস্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃত মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিকষ-পাষণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমনসময় একটা ঠক্‌ঠক্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার কম্বল শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাতির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। প্লেতিকৃত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফড়িয়া ফড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্বকীত হৃদয় এবং ব্যগ্রদৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা বতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুতহস্তে আরও একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থাকিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শূন্যে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধস্বরের উপর ঠক্ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ জিনিস স্বরের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগূলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধস্বরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বার বাহির হইতে ভালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই স্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থার উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো স্ফূর্তিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও বর্ঝবর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শূন্য বাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সূরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শূন্যে বাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সম্মুখবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবশ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীকার নিস্তম্ভতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তম্ভতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অশুভবস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে এক সময়ে ভেক এবং কিঞ্জি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চূপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরও একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বৃষ্টি গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেষ্টা বাধ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শব্দ হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রুদ্ধস্বরের মধ্যে প্রবেশ

করিল। শূন্য গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্-খট্ এবং ঝম্-ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চোকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মূহুর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল, সে বিদ্রুদ্বেগে চোঁকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অর্মানি সর্চকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্রিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিষদ্ধ আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-গুলািকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নোকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসব-জাগরণক্রান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চোঁকিতে বসিয়া চোঁকির পিঠের উপর মাথা উর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘর তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শব্দরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোন্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী স্নেহময়, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুগ্ধের শ্লেোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, 'সংসারোহয়মতীর্বাচিত্রঃ!'

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উন্মোচন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিম্নীলিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ

স্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শব্দ-কঙ্কের স্ফোরকের কাছে আসিয়া কণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সৰ্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ৰ খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনার যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটার পান শূঙ্ক, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আঁটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠ, মাথায় সিঁধি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনার হীরায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অলংকারগুলি টিলা, ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সৰ্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মূখে তাহার দুই চক্ৰ ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শূভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ৰই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ৰ বৃদ্ধিতে চেপ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ৰ মৃত মানুষের চক্ৰের মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মূখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আঁটি ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল স্ফোরকের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনার গহনার কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবন্ধ পুস্তকের মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইন্টার-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়কড় করিতে লাগিল। সেখানে কীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উত্তরে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিরা শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঝঞ্জগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা



ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খন্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্থলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নান তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মূহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সূক্ষ্মের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তম্ভ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।”

তিনি কহিলেন, “না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—”

আমি কহিলাম, “স্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।”

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, “আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।”

আমি কহিলাম, “নৃত্যকালী।”

## দৃষ্টিদান

শুনিয়েছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেরেকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি কিন্তু দেবতার সহায়তার। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপ-বশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা তিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পৰ্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরাঙ্কার আরম্ভ হয়। চোন্দ বৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতার, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নতুন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-বশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি শূন্য হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি-এল দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, “করিতেছ কী। কুম্ভের চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।”

আমার স্বামী কহিলেন, “ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নতুন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।”

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, “তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।”

স্বামী বলিলেন, “আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনও মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।”

আমি মনে-মনে ভাবিতেছিলাম, রাজার রাজার বৃন্দ হইলে উল্লেখেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার দুঃখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সেদিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর কেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিম্বা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কাঁহল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, “দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমল্ল যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।”

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম, তাঁহাকে যে মূখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুদ্ধিমান ছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্ভতার বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, “আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমন্তে সেবন করিয়া দেখিস।” ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্বেই আমি সে কৌটা শিশি তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাণ্ণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী বেন আরও ম্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকষলসুন্দ্ব যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রাখিলাম। স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশ জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও বেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, “দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।”

স্বামী কাঁহলেন, “ঠিক বলিয়াছ।” এই বলিয়া সেইদিনই এক ইয়োজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, বেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভৎসনা করিলেন। তিনি নতশিরে নিরন্তরে দাঁড়াইয়া রাখিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, “কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝবে।”

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “চোখে অস্ত্র করা আবশ্যিক হইয়াছে।”

আমি একটু রাগের ভান করিয়া কহিলাম, “অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।”

স্বামীর লজ্জা দূর হইল; তিনি বলিলেন, “চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শূন্যে ভয় না করে পদ্রুবে মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।”

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, “পদ্রুবে বীর কেবল স্ত্রীর কাছে।”

স্বামী তৎক্ষণাৎ স্তানগম্ভীর হইয়া কহিলেন, “সে কথা ঠিক। পদ্রুবে কেবল অহংকার সার।”

আমি তাহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, “অহংকারেও বৃদ্ধি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।”

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, “দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন প্রমত্তমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ ব্যয়-ব্যয় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।”

দাদা বলিলেন, “আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরও আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।”

আমি বলিলাম, “না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।”

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর বশও করুণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়—মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অস্ত্র হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দৃষ্টিনা ঘটিল; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ার আমার দাদার পরামর্শ শূন্যেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনন্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্রমাগত হইয়া পরস্পরের অভ্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার কণি দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শূন্যদৃষ্টির দিনে যে চন্দন-চর্চিত্ত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপাশ্বে আসিয়া কহিলেন, “তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।”

দেখিলাম, তাহার কণ্ঠস্বরে অগ্রজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, “বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া

দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ধনা থাকিত। ভাবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম—আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মূখে বলিও, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।”

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মূখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিল। তিনি কহিলেন, “কুম্ভ, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গো সঙ্গো থাকিব।”

আমি কহিলাম, “সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্ডাকে একটি অন্ধের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।”

কী জন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যিক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমনসময় আমার স্বামী উচ্ছ্বাসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, “আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষাণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন বহুহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।”

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বৃক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মূখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মূখ আমার বৃকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, “এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সন্তানকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।”

স্বামী কহিলেন, “কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সর্বাধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।” বলিয়া আমার মূখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের স্ভারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীষে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে-মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বাহঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত-কিছু কদম্বতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধা হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই শ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই। মানবী কহিল, সকলই বৃথা, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন, ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রুকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অন্তঃস্থ স্বামী চাকরদাসীকে নিবেদন করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটরা লইয়া নিজের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতোঁছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে বাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের স্ভারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাহার পৃথিবীর সাহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাহার এবং আমার মাঝখানে একটা দূরত্ব অন্ধতা; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন কলকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাহাকে ধরিতে বার, হাহাকার করিয়া তাহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে

স্বীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমনকি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, “আমার প্রার্থিত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।”

আমি কহিলাম, “তোমার প্রার্থিত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।”

যাহাই বলুন, আমি যখন তাহাকে মৃত্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্বীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পূর্বের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃকোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছারার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ৰ ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বন্ধিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিব্যসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহারণের শেষাংশে আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বন্ধিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্বাপেক্ষে বেঁটন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা খেতের আকাশ-ভরা কোমল সূক্ষ্ম গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমনকি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পূর্নিকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ৰ তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে-মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাহার বিরল কেশগুচ্ছ মস্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনমাসের

দেহতত্ত্বগান গুঞ্জনম্বরে শূন্যে পাইলাম না; সেই নবামের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নুতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শূন্যে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোরালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়্জদালানো ধোয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শূন্যে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আর্টাট বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার বৃত্ত এবং ভোরবেলায় ফুল ভুলিয়া শিব-পূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বৃষ্টির একটু বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিপ্রস্থার মধ্যে নির্মল সরলতাটুকু থাকে না। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে বোদিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতার আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তোমার রাগ হয় না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মূখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মূখ দেখা তো বন্দাই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেবারেবি বকার্বিক করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বালিকার মূখে সেকলে কথ্য শূন্যতা লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাপ নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মূখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দূটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দূটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগায়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতার আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নর্তাশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।



কিছুকাল বেশ সুখে কাটল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসম্বলভের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল, জিনিসপত্র আসবাব-আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না, কিন্তু অশ্বের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিম্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বদ্বিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতোছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, “ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতোছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।” যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মর্দমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাহার বাকরোধ হইত। আমি বদ্বিতে পারি, এখন আর সেদিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়াকে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়াকি অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিম্বারা বদ্বিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অশ্ব হইবার পূর্বে আমি ষাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়! যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুইচক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপদর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়বেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া উঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অশ্ব, সংসারের আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষয় ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি—আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভ আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকাই নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার

দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি বাহা বিশ্বাস করি, বাহাকে ধর্ম বলি, বাহাকে সকল সুখসম্পর্পিতর অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বরসে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পোঠীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, “বাবা, আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।” আমার স্বামী কহিলেন, “আল্লা বাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলবে না, তুমি কী করবে সেটা আগে শুন।” শুনিবামাত্রই ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ‘হে আল্লা’ বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কি-স্বারে ডাকিয়া আনিলাম; কহিলাম, “বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিণ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।”

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মূখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্নে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।” পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মূখে আসিতেছিল—‘না, কিছুই হয় নাই’; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, “কর্তা দিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।” স্বামী হাসিয়া কহিলেন, “পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।” আমি কহিলাম, “টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।” তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে—কাহারও স্বামী উপার্জন করে না, কাহারও স্বামী ভালোবাসে না; তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।” আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অজ্ঞান মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে; আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি; আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্শাশুর্দি দেশ হইতে তাহার চাতুষ্পদ্যের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, “বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোঁরাইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্মা চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-

একটা বিয়েথাওয়া দিয়া দাও!” স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন ‘তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না’ তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।” আমি হাসিয়া কহিলাম, “পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।” পিসিমা উত্তর করিলেন, “হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগোরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।”

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ঠুর একটি সঞ্জিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।” যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চূপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, “অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমন লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।” স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, “বিবাহের কথা কে বলিতেছে।” পিসিমা কহিলেন “ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অর্মানি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।” কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া উর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান, আমার স্বামীকে রক্ষা করো।

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, “বউমা, যে ভাসুরাটির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিম্ম, ইনি তোমার দিদি, ইহাকে প্রণাম করো।”

এমনসময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, “কোথা যাস, অবিনাশ।” স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে।” পিসিমা কহিলেন, “এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরাটির হেমাঙ্গিনী।” ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বস্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারম্বার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে-মনে কহিলাম, যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল। লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য

কেন হীনতা করা। আমাকে ছুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়৷ আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত ব্দলাইয়া তাহাকে দেখিলাম; মূখ্যটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোন্দ-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, “ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।”

সেই উন্মত্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ কেন এক মূহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেঁটন করিয়া কহিলাম, “আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।” বলিয়া তাহার কোমল মূখ্যধ্বনিতে আর-একবার হাত ব্দলাইলাম।

“দেখিতেছ?” বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, “আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত ব্দলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি।”

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, “বোন, আমি যে অন্ধ।” শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুদ্ধিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ অয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন চক্ৰ এবং মূখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, “ওঃ, তাই বুদ্ধি কারিককে এখানে আনাইয়াছ?”

আমি কহিলাম, “না, আমি ডাকি নাই। তোমার কারিক আপনি আসিয়াছেন।”

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়ামরী শীঘ্র নড়িতেছেন না। কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।”

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাহার ঐশ্বৰ্য্য চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, “কারিক, আমরা বাড়ি ফিবিব কবে বলা।”

পিসিমা কহিলেন, “ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অর্মানি ষাই-ষাই। অমন চঞ্চল মেয়েও তা দেখি নাই।”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “কারিক, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আশ্বীরঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো; আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।” এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, “কী বলা ভাই তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।” আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বৃকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন, এই কন্যাটিকে তাহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদাত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া, ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, “হিমু, চল, তোর স্নানের বেলা হইল।” সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, “আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলা ভাই।” পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাহাদের মধোকার বিরোধ অশোভনরূপে

আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ছেলেপুত্রে নাই কেন।” আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, “কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।” হেমাঙ্গিনী কহিল, “অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।” আমি কহিলাম, “তাহাও অন্তর্ঘামী জানেন।” বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, “দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।” পাপপুণ্য সুখদুঃখ দণ্ডপূরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে তাহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে!”

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি-ব্যবসায় ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চটপট সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, “হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আর তো”, আমি বুঝিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুইদিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কোটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, “হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি”—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রকল্পতা স্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিলাম, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধূমধাম করিয়া, চারি দিকে যেন একটা ধূলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সাহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে-মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বায়ে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; সঙ্গচ্যুত সাধীগণ অন্ধকার মাঠের

মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শরনগৃহে বতকণ আমি একলা থাকি ততকণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়াইয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম; বলিতেছিলাম, “প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বন্ধে চাপিয়া ধরি; বৃক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই-বা বল।” এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বৃকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না; অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল, এমনসময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুস-চলার উস্খুস্ শব্দ হইল এবং মনুহৃতপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অশ্রু দিয়া আমার চোখ মূছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সম্ভ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মৃষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না; বহুকাল পরে একটি সুদৃশ্য শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদম্ব হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, “কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্ত-দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।” পিসিমা কহিলেন, “তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মন্ত্রা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।” বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, “এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।” বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি-পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্ঠকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারম্বার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, “বউমা, এই ছেলেমানুষির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা!” আমি কহিলাম, “আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।”

পরদিনে যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জুড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দিদি, আমাকে মনে রাখিস।” আমি দুই হাত বারম্বার তাহার মূখে বুলাইয়া কহিলাম, “অন্ধ কিছ্ ভোলে না, বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।” বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আদ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্ঝর্ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু করিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শূন্য হইয়া গেল—সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্দ্য সৌন্দর্য সংগীত, যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে,

দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে! আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, “ইংহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।” ঝিক্, ঝিক্ আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী! আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনও ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না? যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই।

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনও হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্রম্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটার টান পড়ে, তেমনি তাহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই-যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মৃত্যুর জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা-ঠাকরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন।” আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকালে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল; সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতে-ছিলাম। ঝিকে বলিলাম, “কই, আমি তো এখনও কোনো খবর পাই নাই।” ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, “দূরে এক জাগরণ আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি স্মৃতিতে দিন-দুইতিন বিলম্ব হইতে পারে।”

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, “কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।”

আমার স্বামী কম্পিত অক্ষুট কণ্ঠে কহিলেন, “মিথ্যা কী বলিলাম।”

আমি কহিলাম, “তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ।”

তিনি চূপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, “একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।”

আমি কহিলাম, “না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।”

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, “আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার যুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।”

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অশ্রুতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্ষ্য করিতে পারি না। বাহাকে বকিব বকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।”

“আমার বৃকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না— আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।”

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্লেম সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পার। কেবল মনে পড়ে, বলিয়াছিলাম, “যদি আমি সত্যী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম-শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।” এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনও রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে স্নান করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবেশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, ‘হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।’ আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, “ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে বাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।” সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রার অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষণমূর্তির সম্মুখে পাষণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে স্নান-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। স্নান ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম, “দিদি!” দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নতুন চেলি খসখস করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।



হেমাঙ্গিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।”

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, “কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ!”

হেমাঙ্গিনী তাহার স্দুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, “অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?”

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে-মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব। হেমাঙ্গিনী আমার পায়ে কাছ পড়িয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি কহিলাম, “তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাহাকে লঙ্কা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।”

আমি কহিলাম, “আনো।”

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সন্মুহ প্রশ্ন শুনিলাম, “ভালো আছিস, কুম্?”

আমি ব্রহ্ম বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, “দাদা!”

হেমাঙ্গিনী কহিল, “দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।”

তখন সমস্ত বৃঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাহাকে অনুন্নয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হৃদয় করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই ধামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লঙ্কা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে স্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, “তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সেদিন আমি যখন নৌকার উঠিয়াছিলাম, আমার বকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্ভাগী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয় হইতেছিল, সেইসঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মধুরগলে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লঙ্কার এবং কী আনন্দের নৌকার ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে

পারি না। এই কর্দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বৃকিরাছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সূখ নাই। তুমি আমার দেবী।”

আমি হাসিয়া কহিলাম, “না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারীমাত্র।”

স্বামী কহিলেন, “আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনও অপ্রতিভ করিয়ো না।”

পরদিন হৃদয় ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমালিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাতে, নানাপ্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল, নিৰ্ৰাতনের আর সীমা রহিল না; কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

শেখ ১০০৫

## সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে বায় করিতে জানিতেন তাহার অর্ধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। সুতরাং যে গৃহে জন্ম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

সুন্দর সুকুমারমূর্তি তরুণ যুবক, গানবাজনায় সিদ্ধহস্ত, কাজকর্মে নিরতিশয় অপটু; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; জীবনযাত্রার পক্ষে জগন্নাথদেবের রথের মতো অচল; যেরূপ বিপুল আয়োজনে চলিতে পারেন সেরূপ আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সৌভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌স্ হইতে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া শখের খিয়েটার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের সুন্দর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্ষমতায় মূগ্ধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অনূচরশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি-এ পাস। তাহার কোনোপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে, এমনকি, নির্দিষ্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাৎ তাহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাহার গান শুনিতে ও তাহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠান্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তর্জন করিয়া বলিলেন “কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।”

রাজা যুবতী স্ত্রীর ঈর্ষায় মনে-মনে একটু খুশি হইতেন, হাসিতেন, ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাণ্ড অনেক গুণী আছে, স্ত্রীলোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মন্ত্র পাড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য। স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়; আর, স্বামীর আশ্রিতকে দূর করিয়া দিলে তাহার একমুষ্টি অন্ন জুড়িবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্ত্রীলোকের এই বিবেচনাই পক্ষপাত দৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এইজন্য তিনি যখন-তখন বেশিমাত্ৰায় বিপিনের গুণগান করিয়া স্ত্রীকে খেপাইতেন ও বিশেষ আয়োদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। অস্তঃপুরের বিমুখতায় তাহার আহালাদিক ব্যবস্থায় পদে-পদে কণ্টক পাড়িতে লাগিল। ধনীগৃহের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিকূল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে-ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন পুটেকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, “তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।”

সে কাঁহল, রাজার আদেশে বিপিনবাবুর সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যার।

রানী কাঁহলেন, “ইস্, বিপিনবাবু যে ভারি নবাব দেখতেছি।”

পরদিন হইতে পুটে বিপিনের উচ্ছ্রষ্ট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসময় তাহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভ্যস্ত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের খালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালাশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইরূপে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে সুভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্সাল-শেষে প্রস্তুত। রাজবাটির অঙ্গনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃক, বিপিন সাজিলেন অর্জুন। আহা, অর্জুনের যেমন কণ্ঠ ভেমনি রূপ। দর্শকগণ ‘খন্য খন্য’ করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন অভিনয় দেখিলে।”

রানী কাঁহলেন, “বিপিন তো বেশ অর্জুন সাজিয়াছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার সুরটিও তো দিব্য।”

রাজা বলিলেন, “আর, আমার চেহারা বৃকি কিছই নয়, গলাটাও বৃকি মন্দ।”

রানী বলিলেন, “তোমার কথা আলাদা।” বলিয়া পুনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্রাসিত ভাষায় রানীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য রানীর মুখে এইটুকুমাত্র প্রশংসা শুনিয়া তাহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অববেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ৎকাল পূর্বে তিনিও এই অববেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন; হঠাৎ কী কারণে তাহার বিবেচনাশক্তি বাড়িয়া উঠিল!

পরদিন হইতে বিপিনের আহালাদিক সুবাবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কাঁহলেন, “বিপিনকে কাছারি-ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, এক সময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।”

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কাঁহলেন, “হাঁঃ!”

রানী অনুরোধ করিলেন, “খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন ঘিরেটার দেওয়া হউক।” রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হয় নাই বলিয়া রাজা পুটে চাকরকে ভৎসনা করাতে সে কাঁহল, “কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাবুর বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যার।”

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কাঁহলেন, “ইস্, বিপিনবাবু তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বৃকি নিজে মাজিতে পারেন না!”

বিপিন পুনর্মুখিক হইয়া পড়িল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শুনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই পূর্ববৎ অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শয়ন ভোজন

আরম্ভ করিলেন। গানবাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাহ্নে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল-সকাল অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রানী কী-একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কী পড়িতেছ।”

রানী প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “বিপিনবাবুর একটা গানের খাতা আনাইয়া দৃটো-একটা গানের কথা মৃখস্থ করিয়া লইতেছি; হঠাৎ তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শুনিলার জো নাই!” বহুপূর্বে শখটাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পরদিন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জুড়িবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দুঃখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃগ্রম অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে যে হঠাৎ রাজার হৃদয়তা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তন্দুরটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন: যাইবার সময় রাজভৃত্য পুটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

## উদ্ধার

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। বর্তদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে স্বশ্রম শাস্ত্রী স্ত্রীকে তাহার বাড়িতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ-একটু বয়স্কা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী বৃবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আলস্তুগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না। এবং বোধ করি সন্দেহ স্বভাব তাহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন; ঘরে আত্মীয়স্বজন বড়ো কেহ ছিল না, একাকিনী স্ত্রীর জন্য তাহার চিন্তা উদ্‌বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষত অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহাকে পরেশ এক মূহূর্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে বতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক-এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানাপ্রকার সন্দেহ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে-সকল কথা গৌরীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাবিনী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে-অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়ধ্বংসের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাহার তাঁর সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙিয়া গেল তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে-পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী বতই নিরন্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দ্বারা তাহাকে আপাদমস্তক যেন কতবিকৃত করিতে লাগিল ততই তাহার সংশয়মত্ততা আরও যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইল এবং তাহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি-আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধু চরিত্র সম্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশয়মাত্র ছিল না। সকলে তাহাকে পূজা করিত। পরেশ ইহার সম্বন্ধে মূখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্রমের মতো ক্রমশ তাহার মর্মের নিকট পর্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উপ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুর্চারিত ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলো দেখি, সেই বকখামিককে তুমি মনে-মনে ভালোবাস না।"

দলিত ফণিনীর ন্যায় মূহূর্তের মধ্যেই উদগ্ৰ হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা স্বারা স্বামীকে বিম্ব করিয়া গোরী রুম্বকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো!" পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুম্ব করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গোরী কোনোমতে স্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘ-বাহিনী বিদ্যুৎস্রোতের মতো গোরী বহুচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

গুরু কহিলেন, "এ কী!"

শিষ্য কহিল, "গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবারত্রে আমি জীবন উৎসর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভৎসনা করিয়া গোরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গুরুদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধায়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মূকুম্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

স্ত্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মূহূর্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গোরী কহিল, "আমার খুঁশ।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুম্ব করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, শহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কঠবা বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দূরে ষাইতে পারিলেন না। সম্ম্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্ধামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গোরী একদিন পত্র পাইল, "বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে অনেক সাধনী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিন্ত বিক্লান্ত হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুনে বৃধবারে অপরাহ্ন ২ ঘণ্টিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুঙ্করিণীতীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গোরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুনে

মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্বে চুল ঝুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হয়তো চিঠিখানি কখন বিছানার স্বলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র-পাঠে ঈর্ষার দম্ব হইতেছে মনে করিয়া গোরী মনে-মনে একপ্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পাশ্চাত্যহস্তস্পর্শে লালিত হইতেছে, এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িয়া গৌ গৌ করিতেছে, মূখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চন্দ্রতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বক্ষমূর্ধি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোলেন্সি—তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন মফঃস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সম্যাসীর এতদ্র পতন হইয়াছিল যে, তিনি সেই সংবাদ লইয়া গোরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সদ্যবিধবা গোরী যেমন বাতাসন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পদক্ষরিণীর তটে দেখিল, তৎক্ষণাৎ বহুচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মূহুর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গুরু ডাকিলেন, “গোরী!”

গোরী কহিল, “আসিভেছি, গুরুদেব।”

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন সংকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গোরীর মৃতদেহ স্বামীর পাশ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।



## দুবুন্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগোয়ে নেটিভ ডাক্তার, পদলিসের ধানার সম্মুখে আমার বাড়ি। ষমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধরকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্যা দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাহার একটি অরক্ষণীয় আত্মীয় কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পণ্ডিতের মতে বিবাহের কত শুভলক্ষণই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত ষোগ্য এবং অষোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চাঁড়ল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির-বাড়িতে মিস্টার খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমনসময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রি হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পদলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়কি-দরজা দিয়া অনাহৃত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, “বাপারটা বড়ো গুরুতর।” দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্ট-সংকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ কতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, ঐ বড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতোছিল।”

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, “যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।”

এইবার সংপাতে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহীণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠার ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, “মাপ করো, দাদা, এই পাষাণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।”

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, “ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।”

আমি কহিলাম, “নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।”

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, “ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি; ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।”

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ বাস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, “ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনায় তো একজন লোক চাই?”

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শরতানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনার দারোগার কাছে এমন মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মূখ ছিল না। দারোগার বৃদ্ধ সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় বতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই কুখার আহার, পরিধানের বস্তু, এমনকি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পৰ্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, “বাবা, ঐ বৃদ্ধো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতোছিল।” দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুঃখবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বর্ষিক জ্যোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদাশোকের দুঃসহ বেদনার নিজের সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয় মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, “বাবা, কেন এমন করিলে।”

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে

পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত, আমার শশীই যেন পঞ্জীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষার পঞ্জী ভাসিয়া গেছে। খানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাগি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পার্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আশ্রয়সাধন করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সম্বান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুগ্ন শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতোছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বৃকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভূত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, খানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কোপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কী রে।” উত্তরে শুনিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, খানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অর্সাহক, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা বৃকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রুগ্ন-অঙ্গের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুইল না।

তাড়াতাড়ি আহাির সারিয়া কাছারির রোগীর ভাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সম্ভার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিজুতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মূখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, এই গ্রাম, এই খানা, এই মেঘাজ্জর আর্দ্র পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, টাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্স্টেবল বলিয়া গেছে, “থাক্ যেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।”

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনও কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণাগদগদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। এই কন্যাছায়া বাক্যহীন চাবার

অপরিমেয় দুঃখ আমার বৃকের পাঞ্জরগুলোকে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ার বসিয়া আরামে গুড়গুড় টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে বড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আপনারা মানুস না পিশাচ?” বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা কনাং করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, “টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন: এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আসুক।”

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই বড়ে ভূমিসাং হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বৃদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিকার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিতটা ছাড়িতে হইল।

## ফেল

লেজা এবং মদুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মদুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, এক-বয়সি, এক ইন্সকুলে যায় এবং পারিবারিক বিম্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও ইন্সকুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দের বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইন্সকুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুর্লাপির বরফ, লাঠিম ও মার্বেলগুঁলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে-মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দের বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দের পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইন্সকুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইন্সকুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘূমের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স-ক্রাসে জাঁতিকলের ইন্সকুলের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমনসময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এন্ট্রান্স-ক্রাস হইতে তাহার মৃত্যু হইল এবং স্বাধীন নলিন আর্টি, বোতাম, ঘাড়ির চেনে আদ্যোপান্ত বক্‌মক্ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিম্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এন্ট্রান্স-ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি, বি-এ-পাসের এক-ঘোড়ার গাড়িকে অনারাসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলার-ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দের বিবাহের জন্য পাণ্ডীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্থায়ী কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না।

পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমা-সুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, “যিনি যাই করুন, ফস্ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।”

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমনসময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র খালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, “দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।”

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধুর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, “খবর নিতে হচ্ছে তো।”

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ছড়্ শব্দে দ্রুত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “কলিকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।”

নলিনের বুক দমিয়া গেল; কহিল, “বল কী হে!”

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, “খাসা মেয়ে।”

নলিন বলিল, “এ তো দেখতে হচ্ছে!”

পারিষদ বলিল, “সে আর শব্দটা কী।” বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। বতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে, ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডির চেয়ে ভালো দেখিতে। ম্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন ঠেকছে হে।”

হাজরা কহিল, “আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।”

নলিন কহিল, “সে ভালো কি এ ভালো।”

হাজরা বলিল, “এই ভালো।”

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভার সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, “ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।”

হাজরা বলিল, “মহারাজ, শব্দটা কী।” বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া ধরের পিতার সহিত তুমুল

ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, “তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, “তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শ্ৰুভলপ্নে শ্ৰুভ-বিবাহ সঙ্ঘর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, “বি-এ পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাবু ফেল।”

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে-হলুদ।

নলিন কহিল, “ওহে হাজরা, খবর লও তো পাঠাটী কে।”

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাঠাটী সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাঠাটীকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, “আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুড়টিল!” ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তক্ষীত জ্বকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, “এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।”

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটোখাটো সমস্ত ঋণ মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেন তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। “বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা।”

বিবাহসম্বন্ধে আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শূইয়া পড়িয়া গুড়গুড় হইতে ষৎসামান্য সাক্ষনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমনসময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, “দরোয়ান!”

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, “অব্হি ইস্কা কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।”

## শুভদৃষ্টি

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর স্মিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধান কান্তিচন্দ্রের পশুপক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জার পশ্চিমদেশীয় মতো; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছকনলাল, এবং গাইরে বাজরে খাসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দুইচারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অল্পানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড়ো বোটে তাহাদের বাস, আরও গোটা-তিনচার নৌকার চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রামবন্ধুদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলার তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ সযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন, এমনসময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দুই হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া, একেবারে আরম্ভের বাহিরে না যায় এইভাবে, ব্রহ্মসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মূর্খটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে ঘোবনে পা ফেলিয়াছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পেঁাছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করার টিল দিলেন। তাহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মূর্খ দেখিবেন বলিয়া কখনও আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মূর্খখানি মানাইয়াছিল। সোনার ফুল-দানির চেয়ে গাছেই ফুলকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মূর্খখানি কান্তিচন্দ্রের মূর্খ চক্রে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তরুণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমনসময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতব্রহ্ম হইয়া কাদো-কাদো মূর্খে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকে বন্ধে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আত্মস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণসন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকান্ড একটি চপেটাঘাত



করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দূরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী-একটা পাখি আহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কৌতূহলী কান্তিচন্দ্র পাখির সম্মানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থঘর, প্রাঙ্গণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘৃণ্ড বন্দুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে অণ্ডল ভিজাইয়া পাখির চণ্ডপদুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া উর্ধ্বমুখে ঘৃণ্ডটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লুপ্ত জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তত্বে মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণ-চ্ছবি এক মূহুর্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলসো মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ -আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মতো নূতন উত্তরবাতাসে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে বাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তত্বে গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহ-বিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুক-হস্তে হঠাৎ এই ব্যাধিত বালিকার সম্মুখে আসিয়া অভ্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, 'যেন বম্বালসুখ চোর ধরা পড়িলাম।' 'পাখিটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই' কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তটুকু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন. এমনসময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সুখা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সুখা।" তখন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরমুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নামটি উপযুক্ত বটে। সুখা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মূর্খমুখ শান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমূর্তিত তাহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবেব সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ালু মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তুচ্ছা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি।"

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে করেকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির

সম্বন্ধে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ ভাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, “ঠাকুর, আপনার যদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।”

নবীন বাঁড়ুস্কে কহিলেন, “বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সূধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সংপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভালো ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মতো সামর্থ্যও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।”

কান্তি কহিলেন, “আপনি নৌকার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।”

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সূধার কথা বাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে মুগ্ধকণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছু-একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, “আমার কন্যাকে ভূমি বিবাহ করিবে?”

কান্তি কহিলেন, “আপনার যদি সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তুত আছি।”

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “সূধাকে?”— উত্তরে শুনিলেন, “হাঁ।”

নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, “তা দেখাশোনা—”

কান্তি, যেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, “সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।”

নবীন গঙ্গাদকণ্ঠে কহিলেন, “আমার সূধা বড়ো সূশীলা মেয়ে, রাখাবাড়া ঘর-কম্বার কাজে অশ্বিতীয়। ভূমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার সূধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক। কখনও মূহূর্তের জন্য তোমার পরিভাপের কারণ না ঘটুক।”

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া বধাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মূখের দিকে চাহিলেন। নর্তাশির টোপর-পর্য্য চন্দন-চর্চিত সূধাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠান্দিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেয়ে নয়! হঠাৎ বরকের কাছ হইতে একটা কালো বস্ত্র উঠিয়া তাহার মস্তিস্ককে যেন আঘাত করিল, মূহূর্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকারলাবনে নববধুর মুখখানিকেও যেন কালিমা-লিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র স্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন;

সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অশুভ পরিহাসে অদৃষ্ট ভুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল। কত ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়বন্ধুবান্ধবদের সান্দ্রনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ, সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন-এক অজ্ঞাত পল্লীগামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মূখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শব্দরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। 'প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর-এক মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল।' কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নয়, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বৃষ্টির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মূখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাটা আমোদ কিছুই তাহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমনসময় হঠাৎ তাহার পার্শ্ববর্তিনী বধু অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেরেটি শশকশিশুর অনুরণ-পূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে, পাগলি আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মতো কোতুহলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক-না, বসুক।"

মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল।

ঘরসুন্দর রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদুটি কতবড়ো হইল।"

অসংকোচে মেরেটি নীরবে তাহার মূখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবৃষ্টি কান্তি সাহসপূর্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ঘৃষ, আরাম হইয়াছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেরেরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন, মেরেটি কালা এবং বোবা, পাড়ার ষত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী। সেদিন সে যে সুখা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাহার অনুমানমাত্র, তাহার আর-কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে-মনে চমকিয়া উঠিলেন। বাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাহার কোনো সুখ ছিল না, শূভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিচাল পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, 'যদি এই মেরেটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা-অনুসারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কর্তি লাভের চেষ্টা করিত!'

যতক্ষণ আয়ত্ত্বে এই মেয়েটির মোহ তাহার মনটিকে আলোড়িত করিতোছিল ততক্ষণ নিজের বধুটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সাক্ষ্যের কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অর্নি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিচয়ের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধুর মূখের দিকে কোনো-এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে বথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটিমাত্র কোমল সুকুমার মূখের উপরে প্রতিফলিত হইল; কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ স্ত্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে মূখখানি মন্দিত। বদ্বিলেন, নব্বানের আশীর্বাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১০০৭

## যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়টাকে সাপ-ব্যাঙ-বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়া ঘরে ভগবঙ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপঙ্কের শেষ কলার আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চণ্ডলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মূখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সংপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাহার জ্যাঠাইমা তাহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বাসিয়া আছেন। তাহার নিজের হাতে অল্প-কিছু সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগর্ভিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাহার এক আশ্রয়-উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিব্যক্ততার কালেজে পড়াশুনা করিত। ছেলোট কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজ্ঞাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজ্ঞাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুদ্ধিবার সাধা ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাহার জামাই হইতে পারে এ তাহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বৃদ্ধিসুখি না থাক্ বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টারিতে ৩২৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, “এ তো বিষম মর্শকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিলেন,

আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।”

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাঠটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমনসময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “এসো, বাবা, এসো।” কিন্তু কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোলা কোথায়।

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাহার রক্তর্গারিনিভ গোর পদুট দেহটি দেখিয়া মূগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই ছেলোটের সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।”

ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, “সে কি হয়!”

জ্যাঠাইমা কহিলেন, “কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।” এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও কীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জ সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, “তা বেশ হয়েছে, বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠান্ডা হও।” তাহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চাঁনের সম্রাট তাহার স্ৱাস্থ্য হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

কীর্ণাস্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।”

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলোটিকে মনে-মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাহার ছেলের কাছে সূক্ষ্মতা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে-মনে খিকার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদাত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চূপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, “আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিও না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটোলোক নই। কিন্তু বড়োঘরের মেয়ে চাই।”

বিভূতিভূষণ বদ্বাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীর, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দাসে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে-মনে ষষ্ঠেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর-সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বড়শিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শূন্য মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কাম্বা জুড়িয়া দিলেন। তাহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে। পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহপ্রকৃতি ষষ্ঠেশ্বরের অত্যন্ত স্বেধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পলটনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। ষষ্ঠেশ্বরের তাহার স্বল্পপার্শ্বশ্রম ষথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাকনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাহার যে গোপন পুঞ্জির বলে স্বগৃহেই বিবাহপ্রস্তুতবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পরমাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমনসময় দুর্ভাগ্যের অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুইদিন আগে হইতে প্রচণ্ড দূর্ভোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি-বা থাকে তো বৃষ্টি থাকে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার স্বেগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকতক হাতি ও পাল্কি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে ষষ্ঠেশ্বরের ছইওয়াল গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া স্বেগুণ মূল্য কবুল করিয়া ষষ্ঠেশ্বরের তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে বাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতের পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া, বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য ষষ্ঠেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দিমিয়া গেল। ব্যাকুল ষষ্ঠেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, “বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।” যে আটচালা বানাইয়াছিলেন তাহার চারি দিক হইতে জল

পাড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন প্রাণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গন্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরও সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটা সমুদ্রম্পর্নের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃক্ষগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে-তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মৃৎ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, “আমার সাধ্যমত যাহা-কিছু আরোজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।”

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক-বা ভস্মপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার সংগ্রহ করা যাইতে পারে বৃড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টিতে খুঁশ হইলেন। কহিলেন, “এতগুলো মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।”

বরযাত্রগণ খেঁপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, “আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।”

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, “একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্গামীই জানেন।”

যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টি দেখিয়া বাধানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, “ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি বত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।” বিদেশের বরযাত্রীগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বত আবশ্যিক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?”

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, “তা পারিব।” “আচ্ছা, তবে আনো” বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই পুঙ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন-যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদায় মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, “আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্বাতনের যোগ্য নই।”

একজন পুঙ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, “মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।” যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃক্ষগণ বারবার খিজির করিয়া বলিতে লাগিল, “তোমার যেমন অবস্থা সেইমত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দৃষ্টি ঘটিত না।”



এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সস্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, “ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে. এখন মাপ করো, আজিকার মতো শূভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।”

এ দিকে ছানার অন্যান্য অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠান্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমনসময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্ররা ভাবিল, বর বৃষ্টি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন; তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, আমাদের এ কীরকম ব্যবহার।” বলিয়া একটা ছানার খালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন, “তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাকে পড়ে তো সেগুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।”

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠবে কি না ইতস্তত করিতেছিল — বিভূতি কহিলেন, “বাবা, তুমিও বসিয়া যাও. অনেক রাত হইয়াছে।”

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।

## উলুখড়ের বিপদ

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপূরে প্যারী বলিয়া একটি নতুন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভালো। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃন্দ নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি হইতে আশ্রয়কার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, “বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার সর্বাধা হইবে না।” বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথখরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, “বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।” হরিহর কহিলেন, “বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।”

গিরিশ বসু সান্ত্বনায় প্রণাম করিয়া কহিল, “ভট্টাচার্য মহাশয়, আপনি আমার কি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অসর্বাধা হইতেছে।” ইহার উত্তরে হরিহর দু-চারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মননী লোক ছিলেন, কাহারও খাতিরে কোনো কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে-মনে উৎপত্তপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধূলা লইল। দুই-চারদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুর্নিসের সমাগম হইল। গৃহিণীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। কি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল-রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বদিকিলেন, হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাহার মনে শেল বিধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, “জমিজমা বোঁচরা কলিকাতার বাওরা যাক, এখানে বড়ো মর্শকিল দেখিতেছি।” হরিহর কহিলেন, “পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না; অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।”

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় ঋজনা বৃন্দ্র চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত ব্রহ্মাসুর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, “বেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করো।” নায়েব ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া কহিল, “সামনের ঐ জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।” হরিহর কহিলেন, “সে কী কথা! ও যে আমার বহুকালের ব্রহ্মত্র।” হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, “ঐ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃন্দ বয়সে আদালতে সাক্ষি দিতে পারিব না।” ছেলেরা বলিল, “বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটার টিঁকিব কী করিয়া।”

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ার বৃন্দ কর্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমণ্ডে গিয়া

দাঁড়াইলেন। মন্থেসফ নবগোপালবাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে তাঁর উৎসব সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে ধামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারম্বার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনও রাত হইতে পারে। শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকটেল বাজিয়া উঠিল, পাঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বসন্তবাবু, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।”

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল বসন্তবাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন, “সম্প্রতি যিনি নতুন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মন্থেসফ থাকা কালে মন্থেসফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিখিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।” ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, “হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?” বসন্ত কহিলেন, “জজবাবু আপিলে ফল পাইবার সম্ভাবনামাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন; হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।”

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, “তবে আমার উপায়?”

উকিল কহিলেন, “উপায় কিছুই দেখি না।”

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছ্বাসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল, “প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।”

## প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালাবিধবা। যেন শরভের শিশিরাপ্লুত শেফালির মতো বৃন্ত-চ্যুত; কোনো বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে-মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কী ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই-বে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছু গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোনো-একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বন্ধের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতোছিলাম, কবিতার ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্ঠতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুল বেগে কবিতা লিখবার ঝোক আসিল, যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্বে কখনও হয় নাই, সুতরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের স্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চির-নূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে হে, ইনি কে।”

নবীন হাসিয়া কাহিল, “এখনও সম্বান পাই নাই।”

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্ষে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার বৃদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মূর্গি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীন-মাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উস্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে, প্রায় পনেরো আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে, “ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগার কোথা হইতে।”

আমি কবির মতো উত্তর করি, “কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মধুর। সত্য ঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মৃদু করিয়া দেয়।”

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, “তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।” আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “ঠিক, ঠিক।”

পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জ্বানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, “এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।”

আমি কহিলাম, “বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র।”

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতির্বিদ্যে যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তমিন্দে জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মূহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিন্তাকোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনও অগ্নিদুঃপাত আছে। সেখানকার জনশূন্য সমাধিমন্দির গিরিগুহার সমস্ত বহিদাহ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাণ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্জার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্ধদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাধিকনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শূন্যনিবিন্দু ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনও উত্তাপ আছে। এখনও সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে। তাহার সেই দুটি চক্র বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টপাতাটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিন্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্ত হয় না—একটা যে-কোনোপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাংলাদেশে বিধবারিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখন্য নহে, অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, “চিরবৈধবোর মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর কীর্ণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরীচ রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।”

এ-সব কবিদের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থলভের প্রতি ঘৃণা

প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া মৃদুস্বরের পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, “দেখো নবীন, আর্টিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আর্টিস্ট্ বাহাই বলুন, মেরামত আবশ্যিক। বৈধব্য লইয়া তুমি তো দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।”

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজন্যই কিছু অতিরিক্ত উদ্ভাস সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, “তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।”

এমনি খুশি হইলাম—নবীনকে বৃকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম; কহিলাম, “ষত টাকা লাগে আমি দিব।”

তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম, তাহার প্রিয়তমা কাম্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত-আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্ৰান্ত করিয়া এই-সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমনকি, তাহার বিশ্বাস ছিল, বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সাস্থনা দিবার একটা পাগলামিমাাত্র। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছুতার বিধবার ভাইয়ের সহিত নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবর্তী আশ্রয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভাগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-কর্মটির মধ্যেই বন্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মূখের সমস্ত বুদ্ধিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের

চোখের দুই-চার ফোটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, “এখনই লও।”

নবীন বলিল, “তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।”

আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, “এখন তাহার নামটি বলো। আমার সঙ্গে যখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ে না। তোমার গা ছুইয়া শপথ করিতেছি, আমি তাহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।”

নবীন কহিল, “আরে, সেজন্য আমি ভয় করি না। বিধবাবিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর চাকিয়া রাখা মিথ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।”

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিধবাবিবাহে তাহার অমত নাই?”

নবীন হাসিয়া কহিল, “সম্প্রতি তো নাই।”

আমি কহিলাম, “কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মৃদু?”

নবীন কহিল, “কেন, আমার সেই কবিতাগর্দল তো মৃদু হয় নাই।”

আমি মনে-মনে কহিলাম, “ধিক্।”

ধিক্ কাহাকে।

তাহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে?

কিন্তু ধিক্।

## নষ্টনীড়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তৃতা না থাকিলেও সভাস্থলে দু' কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি-ব্যবসারে হতোদম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, “ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যেরকম অসাধারণ” ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গোরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পুরাদমে ছুটাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্পবয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অল্পবয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অভ্যস্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া ভুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে ষতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধু চারুলতা ধীরে ধীরে ঘোবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরাট ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই সফীত হইয়া সংঘের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে ঝাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্য বিষয় ছিল।

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন-রাতির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থায় সুযোগ পাইলে বধু স্বামীকে লইয়া অভ্যস্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যজীবনের সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আয়রণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দূর হইয়াছিল।

বদ্বতী স্ত্রীর প্রতি মনোবোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাহাকে ভৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, “তাই তো, চারুল একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছই করিবার নাই।”



শ্যালক উমাপতিকে কহিল, “তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না—সমবয়সি স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারদর নিশ্চয়ই ভারি ফাকা ঠেকে।”

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারদর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বদ্বিল এবং শ্যালকজ্ঞায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনুতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জ্ঞানিতে পারিল না। নুতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চারদরতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলো অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্তৃত ভাই অমল খাড়াইয়া পড়িতেছিল, চারদরতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারদরতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারদরতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিস্তৃত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারদরতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃষ্ণম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো-একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, “বোঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাস হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না—একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্ষাদা রক্ষা করতে পারি না।”

চারদর হাঁ, তাই বইকি। আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, “সেটি হচ্ছে না।”

চারদর জুতো সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়—সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে বাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু বন্ধে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতোর দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমনসময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চারদর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনার থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মদ্য ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল; দেখিল, থালায় একজোড়া নুতন-বাধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে। চারদরতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরও বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যিক।

প্রত্যেক বারেই চারুলতা আপ্যায়িত প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও স্নেহে শৌখিন অমলের শখ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, “বউঠান, কতদূর হইল।”

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, “কিছুই হয় নি।” কখনও বলে, “সে আমার মনেই ছিল না।”

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাশ নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্বেক করাইয়া দিবার জন্যই চারু ঔদাসীনা প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারও জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যাতি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়াগাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কর্মিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, “বউঠান, আমাদের এই বাগানে সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।”

চারু কহিল, “আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।”

অমল কহিল, “আর একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।”

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, “আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।”

অমল কহিল, “সেই ঝিলের উপর একটি সাকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।”

চারু কহিল, “ঘাট অবশ্য সাদা মাৰ্বেলের হবে।”

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া, রুল কাটিয়া, কম্পাস ধরিয়া, মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-পাঁচশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল—চারু নিজের বরান্দা মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান

তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারু সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, “তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া থাক।”

চারু কহিল, “না না, ঝিল বাদ দিলে কিছতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।”

অমল কহিল, “তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অর্নি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।”

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, “তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই—ও থাক।”

মরিশাস হইতে লবঙ্গ, কর্ণাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারিচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, “তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।”

এস্টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এস্টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কম্পনাকে খর্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য, এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে-মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, “তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।”

চারু কহিল, “না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি করে তুলব। তিনি তো সাহেব-বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন—তা হলে আমাদের প্ল্যানের কী হবে।”

আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কম্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, “এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।”

চারু কহিল, “পাকা আমড়া খুঁজছি।”

মন্দা কহিল, “পাস যদি আমার জন্যে আনিস।”

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা-কিছ গুল থাক, কম্পনা ছিল না; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া। সে এই দুই সভ্যের সকলপ্রকার কর্মিটি হইতে একেবারে বর্জিত।

অসাধ্য বাগানের এস্টিমেটও কমিল না, কম্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কর্মিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাধাইতে হইবে অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমনসময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, “অমল, তুমি যদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।”

অমল জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বেশ হত।”

চারু। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত— আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বন্ধুতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, “আচ্ছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।”

চারু কহিল, “তুমি কী চাও।”

অমল কহিল, “আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা একে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।”

চারু কহিল, “তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি! মশারির চালে আবার কাজ।”

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো আনা লোকের যে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কৃত্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে-মনে মানিয়া লইল এবং ‘আমাদের এই দুটি লোকের নিহৃত কর্মিটি যে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে’ ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল, “আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।”

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, “তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?”

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, “তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।”

অমল। আজ থাক, বউঠান।

চারু। না, আজই দেখাতে হবে—মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া, একটুখানি কাশিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুড়িতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল ‘আমার খাতা’। অমল লিখিয়াছিল—‘হে আমার শত্রু খাতা, আমার কম্পনা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপদ্রুব প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাটপটের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব সেদিন আজ কোথায়! তোমার এই শত্রু শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কম্পনা করিতেছে না।’—ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তম্ভ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে কণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তুমি আবার লিখতে পার না!”

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, “অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।”

মৃদু মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

### শ্বিতীর পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষ্যও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, “বোঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।”

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, “চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়—এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।”

চারু কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নহে; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বৃদ্ধা কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিজেই বার বার বলিত, “বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।”

চারু বলিত, “না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি; তুমি এইটে লিখে ফেলো, দোরি কোরো না।”

সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী-একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, “কতটা লিখলে।”

অমল বলিত, “এরই মধ্যে কি লেখা যায়।”

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, “কই, তুমি সেটা লিখলে না?”

অমল বলিত, “রোসো, আর-একটু ভাবি।”

চারু রাগ করিয়া বলিত, “তবে যাও!”

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটুখানি বাহির করিত।

মৃদুতে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, “ঐ-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!”

অমল বলিত, “এখনও শেষ হয় নি, আর-একটু লিখে শোনাব।”

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দুই-এক জায়গায় দুটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত প্দলকিত কৌতুহলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন বাহা লেখে তাহা ষতটুকুই হোক চারুকে সদ্য-সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অর্লিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কম্পনার উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অর্তিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল, তখনই চারু অন্তঃপদের গবাঙ্ক হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতর আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপদের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দার মন্মথ দস্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দস্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনও প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রুপ করিত। চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দস্তর 'কলকঠ'-নামক বই মূর্খের কাছে ভুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দার প্রবেশ করিল, চারু লক্ষ্যও করিল না। অমল কহিল, "কী বোঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দস্তর গলগন্ড।"

চারু কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও!" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, কদ্রু তৃণ; ভাই রত্নাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মন্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহুস্বরে জগৎ মাতায় না—তবু, ভাই অশোক, তোমার ঐ প্দম্পিত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিরো না; তোমার পারে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিরো না।"

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রুপ করিয়া বনাইয়া বলিতে

লাগিল, “আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুম্ভাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুম্ভাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।”

চারু কোতূহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, “তুমি ভারি হিংসুটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।”

অমল কহিল, “তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।”

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না; পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে ‘সরোরুহ’-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল, কাগজে অমলের সেই ‘খাতা’-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খুব খুশি হইবে। কিন্তু খুশির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বলিল, “সরোরুহ পত্রে যে-সে লেখা বের হয় না।”

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বদ্বাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, এক শো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বদ্বিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতোছিল তাহা সে ভালো করিয়া বদ্বিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখার প্রবৃত্তি করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কর্মটির রুদ্ধ স্ফার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, “তাই তো চারু, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।”

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে, এ কথা তাহার স্বামী বদ্বিতে পারিলে চারু যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, ‘অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বদ্বিলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বদ্বিয়াছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহে।’

চারু জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি তার লেখা পড়েছ?”

ভূপতি কহিল, “হাঁ—না, ঠিক পাড়ি নি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত পড়ে খুব প্রশংসা করছিলেন। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।”

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বদ্বাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “এখনও বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না? দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।”

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে-মনে ভাবিল, “বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অনায়াস। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।”

ভূপতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, “আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম—ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় বলে তো বোধ হয় না।”

চারু কহিল, “আমাকে পাড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেয়েছ?”

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, “এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—”

চারু। ইস্ ইস্, তুমি আর বোলো না! স্বামী হয়েই যত্ন নেই তো আরও কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, “আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।”

চারু। তের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একটু রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বোলো।

ভূপতি কহিল, “নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।”

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপালবাবু তাকে



বাংলার রাষ্ট্রিক নাম দিয়েছেন।

শ্রীনিয়া ভূপতি কিছুর সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। শ্রীনিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবর্মেণ্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চার করিয়া ফিরিতেছিল—এমনসময়ে হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইরূপে শুরু হইয়াছে— 'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মৃদুপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নিলঞ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—আর আজ তাহার সেই তলতল হাসিখানি—শিশুর স্বপ্নের মতো, প্রিয়তার স্মৃতির মতো, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মন্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চারু সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।"

চারু কহিল, "মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল "এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কণচন্দী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তবু অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে-মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, "বলিবার কথা কিছই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।"

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপ্রাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিম্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইব্রেরি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রুফ-সংশোধনকার্যে সাহায্য করিত; কোনো-একটা কাঁপির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাত্তা কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা

ভালের উপর ষত-খর্শি লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে—আমি কারও স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে—কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বোঠানের এ কী অত্যাচার।”

অমল হাসিয়া কহিল, “তাই তো বোঠান, আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জ্বলদম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।”

সাহিত্যরসে বিমুগ্ধ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে-মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, “তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।”

ভূপতি কহিল, “এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের ষত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।”

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, “অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারী বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেয়ে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একটু পড়াশুনোর নিষ্পত্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।”

অমল কহিল, “তা আছে। বোঠান যদি আরও একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।”

ভূপতি হাসিয়া কহিল, “ততটা আশা করি নে, কিন্তু চারু বাংলা লেখার ভালো-মন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।”

অমল। ঠুর কম্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আজ্ঞা তুমি তোমার বউঠাকরুনকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কী দেবে শুন।

ভূপতি। তোমার বউঠাকরুনের জুড়ি একটি খুঁজে-পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাবে।

দুটি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভার সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে—সম্পাদক ও সম্পাদকের দ্বারা তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ার, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী-

আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠান্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা-কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল ও চারু হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমানুষি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যিক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাত্তে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভান্ডার প্রায়ই লুণ্ঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোরদুটির চৌর্ষপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইত সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মৃৎ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মৃৎ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মূখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্ত মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারু এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূবে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সূদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মৃৎখোঁচা হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরটুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহুত প্রবেশ চারুর কাছে মত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। বিমৃৎ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে-ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তাঁর মৃৎ স্বরে বলিত, “ঐ আসছেন” তখন অমলও বলিত, “তাই তো, জ্বালালে দেখছি।” পৃথিবীর অন্য-সকল সঙ্গের প্রতি

অসহিবুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, “তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটার বাটপাড়ির লক্ষণ কিছ, দেখলে!”

মন্দা। যখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশ।

মন্দা। তোমরা কী পড়াছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শুনতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু ‘কালোহি বলবস্তরঃ’।

চারদ্র ইচ্ছা নহে, অরাসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারদ্র। অমল কমলাকান্তের দস্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মর্খ, তব্দ শুনলে কি একেবারেই বৃকতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারদ্রতে মন্দাতে বিম্বিত খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চারদ্রকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, ‘তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসি গে।’

চারদ্র অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, “আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।” বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, “তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বৃকি? তবে আমি উঠি।”

চারদ্র ভদ্রতা করিয়া কহিল, “কেন, তুমিও শোনো-না, ভাই।”

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাশ কিছুই বৃকি নে; আমার কেবল বৃম পার!— বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, “তা বেশ তো, মন্দা-বউঠান, তুমি শুনবে সে তো আমার সৌভাগ্য।” বলিয়া পাত উল্টাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃতি হইল না।

চারদ্র তাড়াতাড়ি বলিল, “ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহবী লাইব্রেরির থেকে পুরোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।”

অমল। সে তো আজ নয়।

চারদ্র। আজই তো। বেশ! ভুলে গেছ বৃকি!

অমল। ভুলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চারদ্র। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি বাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে।— বলিয়া চারদ্র উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে-মনে বৃকিল এবং মদহৃতে’র মধোই চারদ্র প্রতি তাহার মন বিবাক্ত হইয়া উঠিল। চারদ্র চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না

ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “যাও ভাই, মাম ভাতাও গে; চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মর্শকিলে পড়বে।”

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, “কেন, মর্শকিল কিসের।” বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, “কাজ নেই, ভাই, পোড়ো না।”

বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া অন্যত্র চলিয় গেল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দাড়ি বিনাইতেছিল। “বউঠান” বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জ্ঞানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, “আহা অমলবাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদ্ভুত।” অমল কহিল, “বাঁ দিকের বিচারিও যেমন ডান দিকের বিচারিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।” বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গল্প বলা, আমি শুনিনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔৎসুকাজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, “কী বকাছ তার ঠিক নাই।”

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, “না, আমার বেশ লাগছে বলে যাও।” মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সর্কোতুকে হাসিতেছে এমনসময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সত্তা ভাঙিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, “বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে।”

চারু কহিল, “তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।” বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, “ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিলাম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর ‘সন্ধ্যার পাখি’ বলে নুতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনার বলে এনেছি।”

চারু। এখন থাক, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হুকুম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্বেষ করিতে থাকিবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতার গৃহে চলিয়া আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, “সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।”

মন্দাও তো কম বেহারা নয়। একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভৎসনা করা চারুর পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনার উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল মূবককে মূন্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারী অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মারাত্মকীয় মতলব কেমন করিয়া বৃদ্ধাইবে। বৃদ্ধাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উলটা হয়।

বেচারী দাদা! তিনি তাহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভূলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চারু কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। তাঁর অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, বৌদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেইদিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই তো তাহার লেখার গোড়া। কৃষ্ণে সে অমলকে রচনার উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের ‘পরে তাহার পূর্বের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না; চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মারাত্মকীয় মন্দা, বেচারী দাদা।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সৌন্দর্য আঘাটের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝড়িকিয়া পড়িয়া কী-একটা

লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চারুর কাছে সেইগুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

“তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!”

হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল; কহিল, “তোমার ভারি অন্যায়।”

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। নরকিয়ে নরকিয়ে দেখাছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে বলে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, “তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।”

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, “আমি পান নিয়ে আসি গে।” বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, “চমৎকার হয়েছে।”

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, “বাও! আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।”

অমল কহিল, “খাতা এখন দেব না, লেখাটা কাঁপ করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।”

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বইকি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বারবার শপথ করিয়া কহিল “কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে” তখন চারু কেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, “তোমার সঙ্গে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!”

অমল কহিল, “দাদাকে একবার দেখাতে হবে।”

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল; খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “না, তাঁকে শোনাতে পাবে না! তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।”

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল বদ্বন্ধ। দাদা মদখে বাই বন্দন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চারু। তা হোক, আমার খুশিতে কাজ নেই।

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখবে—অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুণিই ভালো, বাকিগুণা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে-মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, "ভাবান্দ্রুজলে অভিষিক্ত ধুব-একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।" হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাশ্বলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গান্ড এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কণ্ড, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প—এইসমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা-ভঙ্গী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। বাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কী বল।"

অমল। অনেকগুণি রোপাচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কী করে।

চারু। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো—হাতের অঙ্করে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু'কপি করে বের হবে; একটি তোমার জন্য, একটি আমার জন্য।

কিছুদিন পূর্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ্য না করিয়া কোনো রচনার সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজার রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বশ মজা হবে!"

চারু কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকেরা যে মেয়েই ফেলবে।



চারু। আর আমার হাতে বৃষ্টি মারের অস্ত্র নেই?

সেইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল করিল, কাগজের নাম দেওয়া থাকে চারুপাঠ। চারু করিল, “না, এর নাম অমলা।”

এই নতুন বন্দোবস্তে চারু মাকের কর্যাদনের দুঃখবিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া করিল, “চারু, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, পূর্বে এমন তো কোনো কথা ছিল না!”

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া করিল, “আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখনো না।”

ভূপতি। বামালসদৃশ গ্রেফতার। প্রমাণ হাতে হাতে!—বলিয়া ভূপতি একখন্ড সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গদ্য সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সম্বল করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসদৃশ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহাব খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

“আর এইটে দেখো দেখি!” বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে ‘হাল বাংলা লেখার চক্ৰ’ বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া করিল, “এ পড়ে আমি কী করব।” তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া করিল, “একবার পড়ে দেখোই-না।”

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাভঙ্গুরে-পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্থ দস্তুর লেখার ধারাকে সমালোচক তীর উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইরূপ রচনাপ্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া করিল, “একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।”

চারু তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসার এক-একবার খুশি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পাঁড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীর সুধাপাত্র মূখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে

লাগিল।

সে বৃষ্টিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুদর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনার অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চারুদকে দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারুদ আরামের জন্য অতিনিদ্রিতে যে-একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্থলিত করিবার জো করিল। চারুদ ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারুদ তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চারুদকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারুদ নিমগ্নচিস্তে বসিয়া আছে।

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চারুদর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুদর আর চেতনা নাই।' মৃহুর্ভের মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারুদ যে মৃর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুদর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুদর উপর ভারি রাগ করিল। চারুদর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা।

চারুদর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেলুম। আজ আমার কী ভাগ্য।

অমল। আমার নতুন লেখা দু-একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনার শোনার' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই, ভাই—আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে—আমার কী।

অমল কিছদ তীব্রস্বরে কাহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই-বা রাগ করবেন। আজ্ঞা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনাই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংবত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পার না। সেইজন্যই সমস্ত মৃধে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল—'অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল বাহুপ্রবেশ করিতে

শিখিয়াছিল, বৃহৎ হইতে নিগমন শেখে নাই—নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষণ-জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় বোঁবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার—যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমন্ডিত উপলখন্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।’

এমনসময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইরূপ ভান করিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে অমলের মূখের দিকে চাহিয়া নির্বিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটিকে যথোচিত লালিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমনসময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শূনা যায়। এ যেন মন্দার ঘরে। শরবিম্বের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনও চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল—‘মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়—অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না!’

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া বাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও বৃদ্ধিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্বোধ মূঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধ পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্রান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল। অমল মনে-মনে কহিল, “বউঠানের এ কী দৌরাণ্ডা। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাহারই ক্রীতদাস। তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জুলুম।” এই ভাবিয়া সে আরও উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বৃদ্ধিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—একবারও ধামিল না। রাগে ক্রোড়ে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নতুন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তুপাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুইফুলের গন্ধ আসিতোছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতোছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আন্তে আন্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন কর্ কর্ করিয়া কেন্ জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমনসময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মূখ অত্যন্ত স্নান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া, প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন সান্দ্রনা-প্রত্যাশার চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতোছিল না। খোলা জানলার কীর্ণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মূখ ফিরাইল না—মূর্তীটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, “চারু।”

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে স্নেহাঙ্গুষ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ, চারু? মন্দা কোথায় গেল।”

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া কমা চাহিবে—সেজন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতোছিল, এমনসময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আশ্ব-সম্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি বাস্ত হইয়া বাধিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চারু, কী হয়েছে, চারু।”

কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছুই হয় নাই। অমল নিজের নতুন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে, এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না। এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্‌খানে লুক্কাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অकारणे সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কণ্ঠের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চারু, তোমার কী হয়েছে! আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের কল্যাট নিয়ে আমি কীরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিবে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে বাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেজন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি শ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, “আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চারু, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।”

চারু অধীর হইয়া বলিল, “সেজন্যে নয়।”

ভূপতি কহিল, “তবে কী জন্যে।” বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, “সে এখন থাক, রাগে বলব।”

ভূপতি মৃদুহৃৎকাল স্তম্ভ থাকিয়া কহিল, “আচ্ছা, এখন থাক।” বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা-কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা স্কোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, “ফিরিয়া ডাকি।” কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিম্ব করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাতি হইল। চারু আজ সর্বিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাতের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমনসময় শূন্যতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, “ব্রজ, ব্রজ।” ব্রজ-চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, “অমলবাবুর খাওয়া হয়েছে কি।” ব্রজ উত্তর করিল, “হয়েছে।” মন্দা কহিল, “খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে যে।” মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল, চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্মৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিম্ব অন্যান্যনস্ক হইয়া ছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, “কিছু খাচ্ছ না যে।”

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “কেন। কম খাই নি তো।”

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, “আজ রাগে তুমি কী বলবে বলিছিলে।”

চারু কহিল, “দেখো, কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।”

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “হাঁঃ, তুমি পাগল হয়েছে! অমল ছেলেমানুষ। সেদিনকার ছেলে—”

চারু। তুমি তো ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও।

যাই হোক, বেচারী দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দেহ, তা বলতে হয়।

চারু রাগিয়া বলিল, “আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দেহ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।”

চারুর এই-সমস্ত অমূলক আশঙ্কার ভূপতি মনে-মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনন্দমানিক কাঙ্গানিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধনী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিকোণ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধার এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, “এ নিরে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ মরমনাসিংহে প্র্যাক্টিস্ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সঙ্গে নিরে যাবে।”

অবশেষে নিজের দৃষ্টিচলতা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, “তোমার লেখা আমাকে শোনাও না, চারু।”

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, “এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।”

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শুনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।”

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

### নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা-আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ-সমস্তই উমাপদের উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, “এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।”

উমাপদ কহিল, “নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।”

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুদ্ধ স্বরে কহিল, “আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব—তোমার সিকি-পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।”

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সন্দেহনা ছিল না। অর্ধের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুব্ধ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দঃখে সম্বাদীপ নিবাইয়া জ্ঞানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পরদিনেই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্বক উমাপদের সহিত কথা কহিল না—ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মন্দা বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধুম যে?”

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অসুবিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে।—বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চূপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, “ছি ছি, কী লজ্জা। বাবু কী মনে করলেন।”

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল। চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা সে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ—সেটা কেবল মৃদু ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব সুস্পষ্ট—আর একদণ্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্যতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শূন্য মনোদঃখের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার

জন্ম ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমনসময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, “খবর কী অমল।”

অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বৃষ্টি আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল। অমল কহিল, “দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।”

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, “তোমার উপরে সন্দেহ!” মনে-মনে ভাবিল, “সংসার ষেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।”

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বৃষ্টি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু গুরুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, “পাগল হয়েছে নাকি।”

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, “বোঠান কিছু বলেন নি?”

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যতর বাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, “অমল, তুমি কী ছেলেমানুষি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশুনো করো, কাজকর্ম পরে হবে।”

অমল বিমর্ষমুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্যপ্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

### দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে-মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষণান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া ‘অমাবস্যার আলো’ নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বৃষ্টিয়াছে যে, তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনার পূর্ণিমাকে অভ্যন্ত গর্বসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার



অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই; তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না—পূর্ণিমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মর্ন্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল—সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাসুর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দুর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদয়তার স্বরে কহিল, “এসো এসো—আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।”

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, “কোন টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়োছি নাকি।”

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, “ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।”

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মন্থোষ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংসারক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; মনে-মনে কহিল, “আর বাই হোক, চারু তো আমাকে বণ্ডনা করিবে না।”

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া কড়কিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর বাধা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সঙ্করতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততার অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাজনক ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার কত-যত্নের ঔষধ পড়িত। কিন্তু ‘হ্যাঁদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া’, এক মন্থর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাঙার চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শব্দ শব্দ কথা মনের মধ্যে বোকাই করিয়া লইয়া চারুদর ঘরে দ্রুতপদে আসিতোছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শব্দক বিবর্ণ মূখ দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া থাকিল, জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, তোমার অসুখ করেছে?”

অমলের স্নিগ্ধ স্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুদ্রাশি লইয়া বৃকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আশ্রুস্বরে কহিল, “কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরছে কি।”

অমল শব্দ শব্দ কথা যাহা সঞ্চার করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।”

চারু কহিল, “কই, তা তো কিছু বৃকতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ঠুর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।”

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল—কহিল, “আজ আমি ‘অমাবস্যার আলো’ বলে একটা লেখা লিখিছিলুম; আর-একটু হলেই তিন সেটা দেখে ফেলিছিলেন।”

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পাঁড়াপাঁড়ি করবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার ভীতদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুদর মূখের দিকে চাহিল—কী বৃকিল, কী ভাবিল, জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পাড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুরাশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহবরের মধ্যে পা বাড়াইতে বাইতোছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অচূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপৰ্য বৃকিতে পারিল না।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চারুকে ডাকিয়া আনাইল। কহিল, “চারু, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।”

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, “ভালো কী এসেছে।”

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চৈশ্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, “তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনও অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদিই-বা হয়ে থাকে, আমার তো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।”

চারু। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ

এসেছে।—চারদ্র মদুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম। বক্শিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চারদ্র। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দৌর কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারদ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিলেত?”

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চারদ্র। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুদ্ধিয়ে বললে ভালো হয় না?

চারদ্র। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চারদ্র। আরও তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, “বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে, বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।”

অমল কহিল, “তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।”

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চারদ্র তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, “দাদার অনুমতি থাকিলেই উনি মত দেবেন। কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই! দাদার পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো।”

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারদ্র যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য ম্লিগুণতর কাঁজের সঙ্গে বলিল, “তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ডান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না। পেটে খিদে মদুখ লাগে!”

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, “অমল তোমার খাতিরই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসে হয়।”

চারদ্র এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, “হিংসে! তা বইকি! কখনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।”

ভূপতি। ঐ দেখো। নিজের স্বীকে ঠাট্টাও করতে পারব না।

চারদ্র। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গদ্রুত্তর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা

তা হলে স্থির?

অমল কহিল, “হাঁ।”

চারু। মেয়েটি ভালো কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিরেছি, মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চারু। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কেন না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ঐ নিরে মিথো দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই, বাপু—দেরি হলে বুক ফেটে যাবে। তুমি টোপের মাথায় দিগে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়!

অমলকে চারু কোনো ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলাম না ধরছিলাম? হ্যাট কোট পরে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আনামদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, “তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।”

ভূপতি হাসিয়া কহিল, “কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা ভয় কী চারু, আমরা রইলাম, কালোর ভয়ের অভাব হবে না।”

ভূপতি খুশি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

### স্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপুল নির্মম পদার্থের যে সাধনার ভূপতি দীর্ঘকাল দিনরাত্রি একান্তমনে নিযুক্ত ছিল সেটা একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জারগার যেন জলের মাকথানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশুসন্তানদের মতো ভূপতির মূখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপূরে করণাময়ী শূদ্রস্বাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে-মনে বলিতেছিল, “এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একটুখানির

জন্য শ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অর্নি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সদ্ব্যোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মূখে কতই মিষ্ট, কতই ভালো-বাসা। মানুসকে চিনিবার জ্ঞান নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছন্নামাত্র নাই।”

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তন্ত শূলের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল, “অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তবু এ কয়দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।” চারু প্রতিশ্রুতি মনে করে, অমল আপনি আসিবে—তাহাদের এতদিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, “আর-একটু পরে যাচ্ছি।” চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে—চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্রান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বৃকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে-মনে বলিল, নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দূর গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনও অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে—অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুব সন্বন্ধটুকু আছে—অনেক ভাব, আড়ি অনেক স্নেহের দৌরাঙ্গা, অনেক বিশ্রাম সুখালোচনার বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময়, লতাবিতান—অমল সে কি আজ ধূলার লুটাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে। একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্জন করিয়া যাইবে না—তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ-সন্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সন্বরণ করা আর যার না। চাকর আসিয়া কহিল, “মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।”

চারু আঁচল হইতে ভাড়ারের চাবি খুলিয়া বন্ করিয়া চাকরের পারের কাছে ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বৃকের কাছ হইতে কী-একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাসমুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা-হাতে আহ্বারস্থানে

উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মূখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, “বোঠান, আমাকে ডাকছ?”

চারু কহিল, “না, এখন আর দরকার নেই।”

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্রে একবার অমলের মূখের দিকে চাহিল; কহিল, “যাও।”

অমল চারুর মূখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, “আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে—আজ অনেক ঝগাট।”

চারু বলিল, “তা যাও-না।”

ভূপতি ভাবিল, চারু অভিমান করিল। বলিল, “তাই বলে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একটু জিরিয়ে যেতে হবে।” বলিয়া বসিল। দেখিল চারু কিম্ব হইয়া আছে। ভূপতি অন্তঃপুরে চিন্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল, “অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।”

চারু তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী-একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মূখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল, অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার মূখে তরুণতার সেই স্ফূর্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্রিষ্ট করিতেছে, চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্বক এমন বিরোধিতা করিয়া তুলিতেছে।

বিছানার শূইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া— ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুণ্ণ? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, “বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা—তুমি ছাড়া তাঁর আর সাঙ্ক্ষনার কোনো পথ নেই।”

অমল ভূপতির বিষয় স্থান ভাব দেখিয়া সম্মান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখদর্শনার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারও কাছে সাহায্য বা সাঙ্ক্ষনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত

পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চারদুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কণ্ঠমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, “চুলোয় যাক আঘাড়ে চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পদরুশমানুষ।”

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল, অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে—সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীনের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে-মনে উজ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, “চিঠি লিখবে তো, অমল?”

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বাহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, “এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বাহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।”

ভূপতি মনে-মনে কহিল, “যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মর্দুলাভ করিলাম।” সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাঁখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চারশক্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপদরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে-মনে স্থির করিল, “বাস্, এখন আর কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।”

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল—স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ার নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপদরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াকে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মূখহাত ধুইয়া সকাল-সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিলার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শাইয়া গুড়গুড়ির সদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনও অনন্দস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে।

তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। কপে কপে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনও চারু আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, “চারু, আজ যে এত দেরি করলে?”

চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, “হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।”

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোনো প্রশ্ন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল, আর সেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন। এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল; সে ভাবিতে লাগিল, তবে কী চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চারু ও অমলের সখিহে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুইজনের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সন্মিষ্ট কৌতুকবহু ছিল; অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন-আদর করিত তাহাতে চারুর স্নেহময় হৃদয়ালতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে-মনে খুশি হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, “চারু, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?”

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, “ভালোই আছি।”

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চারু তৎকালোচিত একটা-কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনও কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর উদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনার ব্যাধিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেরোটিকে দেখতে বেশ।—চারু, ঘুমোচ্ছ?

চারু কহিল, “না।”

ভূপতি। বেচারী অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল—দেখে এই বৃদ্ধোবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাপদীপ শয়নঘরে বিছানার অঙ্ককারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চারু, অসুখ করেছে?”

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ



শুনতে পাইয়া ব্রহ্মপদে গিয়া দেখিল, চারু মাটিতে পড়িয়া উপড় হইয়া কামা রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিয়াছিলাম। চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালোবাসা সঙ্গভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে-মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনও দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়বেগের সঙ্গভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা ভূপতি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সাম্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনোপ্রকার দুরাশা-দুশ্চেষ্টার সাহায্যে না, চারুকে লইয়া পড়াশুনা ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো সুখ সবচেয়ে সুভা অথচ সুন্দর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হারি গল্প পরিহাস, পরম্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যিক হয় না অথচ সুখ অপর্ষাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, “বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছে।” সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়—সে দুই-একটা কথা বলে, চারু দুই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পার না। নিজের এই অক্ষমতার স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত। সভাম্বলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে “উঠিয়া যাই”—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, “চারু, তাস খেলবে?” চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, “আচ্ছা।” বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যার—সে খেলার কোনো সুখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, “চারু, মন্দাকে আনিয়া নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।”

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, “না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।”

ভূপতি হাসিল। মনে-মনে খুশি হইল। সাধুরীয়া যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিশ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে। ভূপতি আর-কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিন্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনও করিতে হয় নাই; ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আশুগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না; কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে।

চারু কহিল, “আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়া নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে।”

ভূপতি হাসিয়া কহিল, “আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।”

ভূপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, “আমি বড়ো নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।”

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনও বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বস্কমের গল্প, এই-সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে

লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, “ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।”

একদিন সম্ম্যাবেলার শোবার ঘরে বড়ো বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লম্জায় একটু ইতস্তত করিল; পরে কহিল, “একটা কিছ্ পড়ে শোনাব?”

চারু কহিল, “শোনাও-না।”

ভূপতি। কী শোনাব।

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল, “টেনিসন থেকে একটা-কিছ্ তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।”

চারু কহিল, “শোনাও।”

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সম্ম্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরও দুই-একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্তীর সহিত সাহিত্যচর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বৃকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে—মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-এক সময় অনামনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্যে অমৃতঃপূরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো-একটা নৃতন বই, নৃতন লেখা, নৃতন খবর, নৃতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পাইনে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, “কেন। এত কষ্ট

কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মূটে-মজুরগুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।”

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যস্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদবাধিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার কান্ত হইল; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নিজনে গৃহস্থার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, “অমল, অমল, অমল!” সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, “বোঠান, কী বোঠান।” চারু সিন্ধু চন্দ্র মূদ্রিত করিয়া বলিত, “অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া যাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।” অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, “অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদুইও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।”

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না, তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে স্ফুটন খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তম্ব অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা-সম্বিত্ত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মূখোবখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে মনের সহিত স্বামীবিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে

লাগিল। ভূপতি যখন নির্দ্বিত থাকিত চারু, তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাসুপ্রভায় গৃহকর্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনো-প্রকার অসন্তোষ ভূপতি দৃষ্টিতে হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথেয় তিলমাত্র হ্রাস দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছৃঙ্খল প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্বে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগ-শক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমনকি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে-মনে কহিল, “কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।”

ভূপতি চারুকে বলিল, “চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।”

চারু বলিল, “ভারি তো আমার লেখা!”

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। ‘বিশ্ববন্ধু’তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ, থামো।

ভূপতি “এই দেখো-না” বলিয়া একখণ্ড ‘সরোরুহ’ বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরম্ভমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অমলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে-মনে ভাবিল, “লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।”

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে, এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহুদুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, “আমার এক বন্ধু নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বড়ি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।”

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধুসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বড়িতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হার! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলোমানুটি করিয়া পুজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য

তাহার এত চেষ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চারু মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোটো না করিলা ফেলে।

চারু খাতাখানা মর্দাড়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নুতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলার উৎসুক ভূপতি শরনগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দার ফুলের টব-পর্ষবেক্কেণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, “এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা।”

ভূপতি কহিল, “হাঁ।”

চারু। এত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, কেনামি লেখাটার নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভরংকর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চারু সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে; সুরেজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল—প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কর্দিন বে-একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষার তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার কেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাতে উঠিয়া দেখে, চারু বিছানার নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, চারু দক্ষিণের ঘরের জানালার বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, “ঘরে আজ বে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি।”

ভূপতি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বিছানার পাখা-টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, “আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও।” এই হাসিটুকু ফুটাইয়া ভুলিতে তাহার বকের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি

লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম-কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে “তোমার নামে চিঠি নাই” এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, “একটা জিনিস আছে, দেখবে?”

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, “কই, দেখাও।”

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাহ্যিক পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে-মনে ভাবিল, “সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।”

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল, “রাগ কোরো না। এই নাও।”

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কষ্টকশয়া হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, “আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?”

ভূপতি কহিল, “দুই হস্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।”

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবিছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়—বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চারু। তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম, বড়োজোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কী, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা।

চারু। তা হলে তো কথাই নেই!

দিন-দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, “আমার বোন এখন চুঁচড়োর আছে,

আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি।

চারু। না, অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চাড়া হাবড়া-স্টেশন-আঁতমুখে ছুটিল। পথে এক সার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমনসময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হরতো অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, "আমি ভালো আছি।"

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।" অনুসন্धानে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাম করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো—এ তো ভালো হয় নাই।

ধাকিয়া ধাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়িবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলঙ্কাভাবে তাহাকে বিম্ব করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

### উর্নবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তবু সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মধুমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধো সমুদ্র—পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতীকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা-প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মূহুর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বন্ধ শব্দ জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে বে করদিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই করদিনের স্মৃতি তাহাকে লক্ষ্য দিতে লাগিল। বে অনাভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে কঁটা



পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চারদ্র যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগদুলা মনে আসিয়া তাহাকে “মুঢ়, মুঢ়, মুঢ়” বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের, বহু ষড়্দের রচনাগদ্যের কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে স্বেধা হইতে বলিল। অক্ষুণ্ণতাড়িতের মতো চারদ্র কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, “আমার সেই লেখাগদ্য কোথায়।”

চারদ্র কহিল, “আমার কাছেই আছে।”

ভূপতি কহিল, “সেগদ্য দাও।”

চারদ্র তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল; কহিল, “তোমার কি এখনই চাই।”

ভূপতি কহিল, “হাঁ, এখনই চাই।”

চারদ্র কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগদ্য বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারদ্র ব্যস্ত হইয়া সেগদ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “এ কী করলে।”

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, “থাক্।”

চারদ্র বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারদ্র বুকিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি ভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারদ্র সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবলিত নির্বোধের সমস্ত চেষ্টা বর্ণনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল তখন চারদ্র আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া ষেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চারদ্র স্বহস্তে ষড় করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিল তাহার জন্য চারদ্র এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বর্ণনা, ইহা অপেক্ষা সর্করণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বর্ণনা এ তো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগদ্যের জন্য কতহৃদয়ের কতবন্দনা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্ক্ষেপণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে-মনে কহিল, “হার অবলা, হার দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এককাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও ‘পাই নাই’ বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।”

তখন আপনার জীবনকে চারুদর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমন করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটা কণিশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের স্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই বাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে বাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে—অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিত্যন্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিন্ত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিছু বলিল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

### বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারখানা কী। এত ব্যস্ত কেন।”

ভূপতি কহিল, “খবরের কাগজ—”

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মূড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধু। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না।

ভূপতি। মানুষের যা হোক একটা-কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, “কবে আসবে।”

ভূপতি কহিল, “তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।”

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন স্নানের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।”

ভূপতি ধমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুদর মূখের দিকে চাহিয়া রহিল। মূর্চ্ছিত শিখিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুদর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুদর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বৃদ্ধিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেঁটন করিয়া জ্বলিতেছে, চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।—“কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের

মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্দুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তত্বে শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বন্ধের কাছে ধরিয়৷ রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?”

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, “না, সে আমি পারিব না।”

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মূঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, “চলো, চারু, আমার সঙ্গেই চলো।”

চারু বলিল, “না, থাক্।”

বৈশাখ-অগ্রহারণ ১০০৮

## দর্পহরণ

কী করিয়া গল্প লিখিতে হয় তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বস্কমবাবু এবং সার ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি—এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলঙ্কার দিক হইতে কত অনির্বচনীয় গীতে এবং গণ্ডে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে বৃকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না—আমাদের শূন্য সংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বৎসরের বালিকা নিরুপরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নিরুপরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে—অনেকে ইন্সকুলমাস্টারি মনুসেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকও করেন—তাহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্বচনরূচির অতিমাত্র লালিতা এবং নূতনশ্বে হাসিবেন, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,  
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মনুসেফি-লাভের জন্য বাগ্ন হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি পুরাতন বেহালার আওরাজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনাড়ম্বরতার বাধা, এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন; তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিশ্ব্যাগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের শুরূ হইল সেইখানে।

শ্বশুরমহাশয় কেবল তাহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমনকি, উপক্রমণিকা তাহার মদুখন্ড শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিবাহতাপে অত্যন্ত উত্তম দই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্ক না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম—প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে, শ্রম্মাও চাই। শ্রম্মা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় ষেরূপ রচনা-প্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য মণো বজ্রসম্বন্ধীর্ণে সূত্রসোবাস্তি মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরে যে-সকল মণি ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগর্দলি অনেক, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই—কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাহার মণিগর্দলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্ক দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধু বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই, কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বদ্বিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মর্শাকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরাজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছই হইত না, কেবল ধোঁওয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, “এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।” অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিনীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে ক’খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমমালাপই নিরাপদ। সুতরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চার যে ক্ষতি হইত আলাপচর্চার তাহা সুদসুন্দ্র পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছই একেবারে নষ্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ—বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারম্বার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমনসময়ে আমার স্ত্রীর জাঠতুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত—আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়োভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা

রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভাগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাহার বধুমাতার কবিতার রচনানৈপুণ্য সম্ভাবসৌন্দর্য প্রসাদগুণ প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাহার বৃন্দ বৃন্দাদিগকে দেখাইলেন, তাহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, “খাসা হইয়াছে!” নববয়স্ক যেরূপ রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কণ্ঠমূল এবং কপোলম্বর অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না—কী জিনি, লঙ্কার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত গ্রন্থটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলাক্ ও কীট্‌সের নাইটিংগেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্‌সের গোরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরাজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বৃন্দ-বান্ধবেরা তাহা বৃদ্ধিতে না—কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যার কী উপায়ে।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিবন্ধিণী তাহাতে লঙ্কাপ্রকাশ করিত—আমি তাহার সে লঙ্কা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বৃন্দবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপূরে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলার লেখা। স্বপক্ষের অন্তর্কালে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিযুক্ত প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন-সময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, “আমার বিম্বান বৃন্দ যদি তাহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বৃদ্ধিয়া লইয়া আসিতেন তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যাধিত করিয়া তুলিতেন না।”

চুলার আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর

অনিষ্টকর কথাগুলো মন্থে মন্থে হৃদয়ঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই—অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শুনিন নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনিই কি শ্রীমতী নিব্বিরণী দেবীর স্বামী।” আমি কহিলাম, “আমি তাহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।” বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠতুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নিদর্যাচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেক-রকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মন্থে মন্থে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নিব্বিরণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, “হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা। আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে ‘জগদিন্দ্র’ লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।” শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দোর হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, “তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।”

তাহারা কহিল, “প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।”

আমি কহিলাম, “বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জ্ঞানি।”

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নিব্বিরণী কহিল, “কেন গো, এত ব্যস্ত কেন—আবার কি পাঠ্য দেখিতে যাইতেছ।”

আমি কহিলাম, “একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।”

“তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে।”

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ

না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, “তুমি পাগল হইয়াছ? না না, সেখানে তুমি বাইতে পারিবে না!”

আমি কহিলাম, “রাজপুত্র-নারী বৃদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত—আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাভাতেও পাঠাইতে পারে না।”

নির্ঝরিণী কহিল, “ইংরাজ বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু—থাক্-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই—শেষকালে—”

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর,  
অন্যো বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরন্তর।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ ‘দৃষ্টিহীন নাড়ী-ক্ষীণ হিমকলেবর’ অবস্থার একেবারে নিরন্তর হইয়া পড়েন তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্যে যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বৃদ্ধ ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, “নিঝর, তুমি কি মনে কর—”

স্ত্রী কহিল, “আমি কিছুই মনে করি না, কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া বাইতে পারিবে না।”

আমি কহিলাম, “সে আলাদা কথা। তোমার মূখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।”

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দূরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্রাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কর্তলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সঙ্কর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাষ্ট্রা কহিতে লাগিল, “আর সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন—কোনদিন-বা মশারির মধ্যে নাইট-স্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।”

আমি কহিলাম, “ঠিক কথা। এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া বাইবে না।”

সেই রায়েই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্পশিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে—আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, “সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না, সেটার জন্য মাথা চাই।” মাথা যে কোথায় আছে, সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয়, কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, “লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।”

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তর্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, “কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি ছীন।”



আমি কহিলাম, “রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।”

নির্ঝরিণী কহিল, “তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।”

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

‘উদ্দীপনা’ বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুইজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বৃষ্টি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন শ্বিধা জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না; যেমন করিয়া হউক, জ্বিততেই হইবে। হাতে তখনও দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম; বর্ষিকের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বর্ষিকের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজ গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মর্শকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম, সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রি আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের খালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল, “আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।”

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, “তুমি কি মনে করিতেছ, আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়—তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল।”

যাহা হউক, ইংরাজ প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবৃষ্টিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারী নিব্বর ইংরাজ সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

### উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল মনটা তত

চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উদ্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নার নিৰ্ঝরিণীর মূখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছ পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উদ্দীপনা'র বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ। স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। স্চিপত্রে দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'নর্দিনী', এবং তাহার রচয়িতার নাম—এ কী! এ যে নিৰ্ঝরিণী দেবী।

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও নাম নিৰ্ঝরিণী আছে কি। গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিৰ্ঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুত বোনের বস্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা—সাদা ভাষা, কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ৰ জলে ভরিয়া যায়। এ নিৰ্ঝরিণী যে আমারই 'নিৰ্ঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যাধিত রমণীর সেই স্থান মূখ অনেকক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিৰ্ঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায়।"

নিৰ্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নিৰ্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নিৰ্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছ জেদের সঙ্গেই বলিলাম, "না নিৰ্ঝর, সে কিছতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নিৰ্ঝরিণী কহিল, "সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নিৰ্ঝরিণী। সে আমি পড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "আঁ, সে কী! কবে পড়াইলে।"

নিৰ্ঝরিণী। আজই পড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিব্বরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও একছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাহার রচিত উপন্যাসটি পড়িলেই কাহারো বদ্বিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্মিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনিব্বরিনি দেবী

স্ট্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্র-অশাস্ত্র অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠিকবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিস্তৃত পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ট্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বদ্বিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত; তাহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আঘাড়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন—এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ট্রীগাম্ভীর্যপটুত্বম্। তিনি স্ট্রী-চরিত্র বদ্বিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বদ্বিতে শব্দ করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরও একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শব্দনিয়ম, কবির নববিবাহের পর তাহার বিদুষী স্ট্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উদ্ভ্রংশ হইতে র-ফলাটা লোপ করিয়াছিলেন— শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যে রূপ পরিণাম হইয়াছিল আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শব্দরবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

## মাল্যদান

সকালবেলার শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলার বাতাসটি অল্প একটু তানিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধু করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে—সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োরান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমনসময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, “কী যতীন, পূর্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি।”

যতীন কাঁহল, “কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।”

আশ্চর্যসমাজে ‘পটল’ নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, “আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে—তার সঙ্গে দুই বেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুন্দর লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না। আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলার নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাত জন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাসিপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মূখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।”

যতীন হাতজোড় করিয়া কাঁহল, “থাক্, থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনা’ই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয় কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।”

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় বাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা-কী দৃষ্টান্ত তোমার মাথায় আসিগাছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।—বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুত-জাঠতুত ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিগাছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুঁচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাস্তিদির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল—ওর ঐরকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দৃশ্চিন্তা সহিতে পারিত না—অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। শ্লেগের ভয়ে বলিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমনসময় ডাক্তারিতে নুতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হস্তাথানেকের জন্য এখানে আসিগাছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাঙ্গুনমধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমনসময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমনসময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, “ও কুড়ানি।”

মেয়েটি কহিল, “কী, দিদি।”

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, “কেমন, ভালো দেখিতে না?”

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “হাঁ, ভালো।”

যতীন লাল হইয়া চোঁকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, “আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি

করিতেছে।”

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি না তুমি বড়োমানুষি কর! তোমার বৃদ্ধি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে করিল, “ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাল্গুন-ঠেঠে লগ্ন নাই—এখনও হাতে সময় আছে।”

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে সেই মেয়েটি অবাধ হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্ছিপে—মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নিবৃদ্ধি বলা যাইতেও পারে, কিন্তু তাহা বোকাগি নহে; তাহা বৃদ্ধিবৃন্তির অপরিষ্করণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরণ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনের দেখিয়া করিলেন, “এই-যে, যতীন আসিয়াছে, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মান্দু করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলার পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জ্ঞাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, ‘ও তো শ্বশুর; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জ্ঞাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।’ প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শব্দ করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, ‘স্বরদার, আমাকে মা বলিস নে—আমাকে দিদি বলিস।’ পটল বলে, ‘অতবড়া মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বৃদ্ধি বলিয়া মনে হইবে যে।’ বোধ করি, সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুলসি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন তো।”

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেশী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে করিলেন, “বৃথা সংকোচ করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কাঁচ ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্ করিতেছে—এখনও শাসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না—উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।”

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছুমাত্র কুষ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন করিল, “শরীরবস্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।”

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “হৃদয়বস্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?”

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া করিল, “ও কুড়ানি,

আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কোতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাহাদের অনন্দকরণে মদুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

ষতীন লাল হইয়া উঠিয়া বাস্ত হইয়া কহিল, "আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ—ভারি অন্যায়ে। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশংসা দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উহার কাছে প্রশংসা প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু, ষতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত বাস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুস্থ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কোতুক করিয়াছে—তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই তো ষতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বানিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে—ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুস্থ নাই—আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কমই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া ষতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কোতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বৃদ্ধিবৃন্তের উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রক্ত-লালার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া ষতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকার সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল; ঐ বৃদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখদুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গুনের এই কুঞ্জ-গুঞ্জ-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার কদম্বকাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাত মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্ঘাটিত ষবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি ষতীনের জাকিয়া পাঠাইল। ষতীন আসিয়া দেখিল, কন্ঠে কুড়ানির হাতে পারে খিল ধরিতেছে.

শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, “ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পারে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের ভেলো হিম হইয়া গেছে।”

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাতি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বৃষ্টি, সম্ব্যাবেলার কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য্য তাই। যতীন কহিল, “হরকুমারবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; তুমি যাও, পটল।”

পটল কহিল, “পরের দোহাই দিবে বইকি। ছট্‌ফট্‌ কে করিতেছে তা বৃষ্টিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথার কথায় লক্ষ্মীর মুখচোখ লাল হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল তা কে বৃষ্টিবে।”

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচ। আমি ভুল বৃষ্টিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, “তোমার চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পারে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বৃষ্টি এত দৌর করিলি। ছি ছি, ঠুর পায়ের ধূলা নে।”

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধূলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমনসময় কুড়ানি আসিয়া অন্দানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “থাক্ থাক্, কাজ নাই।” কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল, “পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম।”

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বৃষ্টিহীন মুখে তাঁর বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অন্ততস্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লক্ষ্মী পার না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চিকিৎসকের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমার বোলের গন্ধে বাজস ভারাক্রান্ত—এমনসময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেরালা হাতে লইয়া কেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হাঁপের মতো চক্ষে একটা সক্রমণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না, ইহা কেন সে বৃষ্টিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া



অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল; ভাবটা এই যে, “কেমন ধরা পড়িয়াছ।”

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পাড়িতেছিল, এমনসময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে-মনে কাঁহল, “বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে—পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্ন দেওয়া উচিত হয় না।”

কুড়ানিকে বলিল, “ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বৃদ্ধিতে পার না!”

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি রম্ভ সংকুচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কাঁহল, “কুড়ানি, দেখি, তোমার মালা দেখি।” বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মূখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মূহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাস-ধ্বনি শূন্য গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে—“পালাইলাম। শ্রীযতীন।”

“ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!” বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বৃদ্ধিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পাড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পাড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বৃদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বৃদ্ধিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই বাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বৃদ্ধিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বাসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগ-পক্ষীর আশ্চর্যম্বৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুঁটা ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সার্থিতেছে। তাহার বৃদ্ধির ভিতরে যে-একটি সূখার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপদ্ড় করিয়া চলিয়া দিভেছে—

ভূমিতলে পদঙ্গীভূত সেই শ্মলিতকেশা মর্দুপ্তবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, “লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।”

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, “ও কী হইতেছে, কুড়ানি।”

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বাসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!”

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, “এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।”

হরকুমার কহিল, “তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।”

পটল। তুমি কেমন স্বামী। আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে আমাকে খুলিয়া বল্।”

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, “কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুঃখী; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনও মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভুল কেন করিবি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।”

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরও জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তম্ভভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিকণ সূপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চকু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সন্ধ্যা তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে

মুছিয়া ফেলবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সম্মানে পুঁলিসে খবর দিলেন। সেবারে স্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুঁলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সম্মানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

ষতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার স্লেগ-হাসিপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহাৰ সারিয়া হাসিপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসিপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নতুন রোগিণী আসিয়াছে। পুঁলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

ষতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। ষতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে ষতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে ষতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগ-নির্মীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপালের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে; দেখিবামাত্র ষতীনের বৃকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দীর্ঘকাল হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলন প্রাণটি ক্রিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সাহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। ষতীনই-না ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ষতীনের বক্ষোশ্বাসে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নার তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, ষতীন তাহা না চাহিতেই, স্বপ্নের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণ-বিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকস্মাৎ তার পায়ে কাছ আপনি আসিয়া ধসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মুছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যভোগ্যের অধিকারী।

ষতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। ষতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। ষতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল “কুড়ানি” তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ জাগিয়া গেল—ষতীনকে সে চিনিলাম এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি স্নোহের আবরণ

পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে স্নগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি ঘেন সদূরব্যাপী সজলমিন্মতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সক্রমণ বন্ধের সহিত কহিল, “কুড়ানি, এই দুখটুকু শেষ করিয়া ফেলো।”

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেরালার উপর হইতে যতীনের মূখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুখটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসিপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্ত রূপ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।”

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নতুন-আনীত রোগিণীর স্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য স্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিররের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন-ল্যাম্প্ ছায়াঙ্কুরে মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্‌ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, “তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।”

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, “ভালো বোধ হইতেছে?”

কুড়ানি একটুখানি চোখ বদ্বিজিয়া কহিল, “হাঁ।”

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।”

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শূকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের মধ্যে যতীন চূপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা, নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর বদ্বতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্‌ রৌদ্রের আলোকে, কোন্‌ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বৃষ্টির উপরকার সমস্ত কুরাশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাতি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই শুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ স্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, “তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিদ্বানার

শুইলাম। অর্ধেক রাতে পটল কহিল, ‘ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।’ পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না— তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।”

পটল হরকুমারকে কহিল, “চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।”

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আশা আছে?”

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইংগিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, “যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।”

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, “কুড়ানি, কুড়ানি।”

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, “কী, দাদাবাবু।”

যতীন কহিল, “কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।”

কুড়ানি অনিমেষ অবদ্ব্য চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, “তোমার মালা আমাকে দিবে না?”

যতীনের এই আদরের প্রশ্নটুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, “কী হবে, দাদাবাবু।”

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, “আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।”

শূন্য কক্ষকালের জন্য কুড়ানি স্তম্ভ রহিল। তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হট্টু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, “কুড়ানি।”

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উল্ঙ্গদল করিয়া কহিল, “কী, দিদি।”

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?”

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টিতে কহিল, “না দিদি।”

পটল কহিল, “যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।”

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিনীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল সেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক-একগাছি চূড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, “যতীন।”

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া

সোনার হার দিল। বতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো বখন কুড়ানির মূখের উপর আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অন্ধান মূখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই—কিন্তু সে যেন একটি অভঙ্গস্পর্শ সূক্ষ্মস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

বখন মৃতদেহ লইয়া বাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বৃকের উপরে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে কহিল, “বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।”

বতীন কুড়ানির সেই শান্তস্বপ্ন মৃত্যুছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, “বাহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।”



## কর্মফল

### প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসী সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন—সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। “এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল!—দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।”

শশধর। এতেই বুঝবে, তোমার দিদির শাসন কী রকম কড়া। দিনরাতি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রকম ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম খুঁটি পরে ইন্সকুলে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে ফুকটা কিনে দির্শোছিলেম সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্ কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেকে। তা, তাই বলে কি আর নতুন ফুক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসুচি।

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সত্যি কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতাম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘূর্নাসি পরিয়ে ইন্সকুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন সূচিছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বই ছেলে নয়—একে একটু সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক-সুটে কাপড় রায়মুজের ওখান হতে আনিরে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক-সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদুড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে—আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃন্দ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।



সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধু।

বিধুমুখী। খালার করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্। তোর মেসোমশায় তোকে পেলোটির বাড়ি থেকে আইসক্রীম খাইয়ে আনবেন, তুই ঠুর সঙ্গে যা। ওগো, যাও-না, ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিস্ত্রী।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে ঠৈপতুক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাটার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পার না?

শশধর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলোটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

সুকুমারী। এই-যে মন্মথবাবু আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমানুষ, বাপের বড়নির চোটে ওর একদম্ড শাস্তি নেই। আর সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

সুকুমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিনি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

বিধুমুখীর প্রস্থান

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। নিয়ে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিরে জবাবদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়—সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতাম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাগুই পায়, চাবার পুর্বেই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে মুখী হতে পারে না। বর্ণিত হয়ে ঐশ্বর্যরক্ষা করবার যে-বিদ্যা— আমি তাই ছেলেকে

দিতে চাই, ঘাড় ঘাড়-চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনি ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্ব্যবস্থা থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা যখন নেই তখন সাধুসংকল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, খেঁষ চাই। স্বাভাবিকের ইচ্ছার একেবারে উলটামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামতো ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই যদি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীর্দ!

শশধর। তোমার মতো অসম সাহস আমার নেই। বীর স্বরকল্পের অধীনে চরিত্র ঘণ্টা বাস করতে হয় তাকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্বাভাবিক সঙ্গো বীরত্ব করে লাভ কই। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাটা বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সংপূর্ণাঙ্গ—গৌরবাত্মক করতে গেলেই মর্শাকিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরে-সুস্থে তোমার মতে চলা যেত, পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেইজন্যই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্লেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা—প্রতিদিনই তো ঠেকছ তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না, তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমন ভাবে চলতে চাও যেন তোমার স্বাভাবিক একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে-সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

### শ্বিতীর পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে চৈব বহুদারম্ভে লঘুক্ৰিয়া—শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দাম্পত্য-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তারা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাহার স্বাভাবিক মধ্য মধ্য যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তবু তাহার আরম্ভ বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে—ঠিক অজায়ুধের সঙ্গো তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্তস্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন, “তোমার ছেলোটিকে যে বিলিতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।”

বিধু কহিলেন, “পছন্দ যদি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলোদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।”

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, “সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন।”

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা

তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য খোবার দরকার হয় গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলোটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধু। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বাসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামী-স্বীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলোটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধু। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছ্ নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যান্টর অয়েল মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো; কেরোসিন, ক্যান্টর অয়েল গায়ে মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্ৰতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ-কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি, ছেলোটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোর্পনি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ কলকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন; কহিলেন, “আমিও তা জানি। তোমার ভাগিনীপতি শশধরের ‘পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছি, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই এখন-তখন ছেলোটাকে কিরিপিং সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসের আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অন্যরাসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগবাচনার লজ্জা

আমার সহ্য হয় না।”

এ-কথা মশ্বথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ-পর্বন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাহার গুঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ স্বামীসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপারিসীম মূর্খ। কিন্তু মশ্বথ যে বাসিয়া বাসিয়া তাহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন, হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্মান্তক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন, “ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গারে সর না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।”

এমন সময় বিধবা জ্ঞা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরালো না! রাত্রে কুলার না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্‌ফিস্! তোদের জিবের আগার বিখাতা এত মধু দিনরাতি জ্বোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজবউয়ের কাছ হতে শেলাইয়ের প্যাটানটা দেখিবে নিতে এসেছি।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদুড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়ারেন, তুমি ঘেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার ষাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি ষাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, বতরুণ তোর বন্দুর চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিদ্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বর্টি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বর্টি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প করতে তো শুন নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি ষেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে ষেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলাম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না।

বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদুড়িসাহেবের বাড়ি ইভনিং পার্টি ছিল, কষেকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেস সূট পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্ৰস্তুত পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য ষে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয়, শুন।

সতীশ। একটা মনিং সূট আর একটা লাইঞ্জ সূটে এক-শ টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়-শ টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কী, সতীশ। এ তো তিন-শ টাকার খাঙ্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফর্কির করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে এমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোর্টের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

### সতীশের প্রস্থান

ভাদুড়িসাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিত থাকতে পারি। ভাদুড়িসাহেব ব্যারিস্টার মানুস, বেশ দু-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেকেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে

পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিস্টার ভাদুড়ির বাড়িতে টেনিসক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস স্টুট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার নাহয় ওরাজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সর্বাধা করে দিচ্ছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না— আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন— ইনি আজ টেনিস স্টুট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস স্টুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস স্টুটটা মিস্টার সতীশকে দান করে তার এই—এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী স্টুট, সতীশ— খিচুড়ি স্টুটই বলা থাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি স্টুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবে লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শব্দে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিস্ট কথার ছাঁটও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ, সতীশ? রীতিমতো সভা হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস স্টুট সম্বন্ধে তোমার ষেরকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

### অন্য গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নৌলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলোম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মূর্শকিল হয়েছে, আমি কিছতে এখানে এসে সুস্থমনে থাকতে পারি নে— কেবলই মনে হয়, আমার টাইটা বুকি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটার হয়তো কুঁচকে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐরকম অনায়াসে স্ফূর্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোর্টার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তাহারা হৃদয়ের সান্ধনা জগতে কোথায় আছে—দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না, নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিস্ট কথার আমদানি এখনই শুরুর হয়েছে। প্রশয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একটু কেক খেয়ে যাবে, মিস্ট কথার পুরস্কার মিস্টার।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টেনিস কোর্টার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্টা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা বর্জিলয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ করবেছ। এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধু। বলো তো, রায়মশায়। আমি তো ঠুকে কিছুতেই বর্জিয়ে পারলেম না।

মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মর্হুতেই! একজন বললেন নিদয়, আর-একজন বললেন নির্বোধ। যার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি—তার ভঙ্গী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তার ভঙ্গীপতি পর্বন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কী রকম কড়া শুন।

শশধর। বেচারি সতীশের একটু কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলি নে। ফিফিগা পোশাক আমার দৃ চক্ষের বিষ। ধূতি-চাদর চাপকান-চোগা পরুক, কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ-বয়সে শখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বড়োবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরও বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো, যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখিছ তার আক্রমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালগসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে-দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সেদিক হতে আসছে না, বরং এখন হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায়মশায়, পেরে উঠবেন না—দেশের কথা উঠে পড়লে ঠুকে খামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বর্জি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদুড়িসাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি করছে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও-বেচারার বড়ো মর্শকিল। আমি র্যাঙ্কনের বাড়িতে

ওর জন্য—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেব-বাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা। এখন নিয়ে যা।

বিধুর প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামতো চলতে পারবে।

দ্রুত প্রস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে?

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হয় মন্মথের হজমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক-না কেন, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মদুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ-সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

শশধরের প্রস্থান। বিধু-মুখীর কন্দন

● বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনো কাশা, কখনো হাসি—কতরকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই—বেশ আছে।

দীঘানবাস

ও মেজবউ, গোসাঘরে বসেছিঁস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি, রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে বাগ করব আমার মেজাজ কি এতই বদ।

নলিনী। না, ও-সব কথা থাক্। সকল সময়েই নন্দীসাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে এমন দামি জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাকে দিয়েছি তার তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাথে করি? তার প্রতি যখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা, ঘাপ করো, আমি চূপ করে শুনব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমানি নির্বুদ্ধিতার সুর চাঁড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার জন্য



নেই বলে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু, এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে-দান, আমার কাছে সে-দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছই অন্যায় বলছি নে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতাম। তুমি বখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছই-না-কিছই দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চূপ করে থাকার উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। এ নেকলেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ে না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধর হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন বদ্বি?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্যে তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে; আজ-কালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করবার দুঃখ-টুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্যে তাই করতে চাই, নেলি, একেও যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা কবাব তা তো করেছ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকার-টুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেকলেসটা গলার ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি নেন করবেন, আমার জন্যেই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে।

সতীশ। সে-কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেকদিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা, সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামি জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফুলের তোড়ার বেশি আর কিছই দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। ঠিক, এখন তবে তোমার গুরু নন্দীসাহেবের পাঠ আবিস্তি করো। দেখি, স্মৃতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা, আমার কানের ডগা

সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

সতীশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নালিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয় নি। আজকের মতো ঐটুকুই থাক, বাকি-টুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু হয়েছে।

### নবম পরিচ্ছেদ

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি, এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বলছি, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অনাথা হবে না।

বিধু। ওগো, এতবড়ো সভাপ্রতিষ্ঠান বর্ধিষ্টির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তার চলে কী করে বলা দেখি।

মন্মথ। ধার যে রূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না— ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে হবে।

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

### মন্মথের প্রস্থান। শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে স্কু কাম্বাকাটি করে আমাকে বাড়িছাড়া করেছে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কী।

বিধু। সবই তো শুনছি। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ঠর মন সুস্থির হচ্ছে না। স্যানিটর-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর বাই বল, মন্মথকে বোকাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বদ্বি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে। কিন্তু, এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমাদের হাতে কিছ, কি—

বিধু। কিছই নেই—সতীশের ধার শ্রুতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে, হাতে কেবল বালাছোড়া আছে।

### সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মর্শকিলে পড়েছ

দেখো দেখি।

সতীশ। মর্শকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বড়ি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দখাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদিবা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যান্য কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্‌দিন কী করে বসে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনো আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

● সুকুমারী। কী সর্বনাশ। সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল, এমন কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করাও চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেয়াদা: ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মশাথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে একজামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি, দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি নাহয় ওকেই মানুব করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু, সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মূখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন, বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না।  
তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধু। দাদি!

সুকুমারী। আর দাদি-দাদি করে কাদতে হবে না। চল, তোর চুল বেঁধে দিই  
গে। এমন ছাঁর করে তোর ভ্রূণীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে  
দেবে। তাতে কি গুর ভালো হবে।

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না। আমি  
মোটামুটি এই বৃষ্টি যে, বার বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায়  
করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কঠিন উপায়ে রক্ষা করা কারও উচিত হয় না।  
আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষার মান্দু  
ষার্থ মান্দুষ হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের  
মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল-কর্মফল কর আমি তা  
সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ায় গড়ায় আদায় করে  
নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কড়া আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই  
মহুকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শুধতে শুধতে আমাদের অস্তিত্ব  
পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও  
বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরকম। কর্মফল নৈসর্গিক,  
মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি নৈসর্গিক মান্দুষ তিনি যা-খুশি করবেন; আমি অতি সামান্য  
নৈসর্গিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, তুমি  
কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি যে ভাবে মান্দুষ করতে  
চেষ্টা করিলাম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংঘম  
আর-এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে  
যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা  
যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বৃদ্ধতে না দাও, তবে তার আশা আমি ত্যাগ  
করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মান্দুষ করো—দুই নৌকার পা দিয়েই তার বিপদ  
ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ, মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস-মতেই নিজের ছেলেকে আমি  
মান্দুষ করতে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি, তা  
কোনোমতেই হবার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য

তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না! অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বশেষেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাদুড়ীজায়া। শুনছে? সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিস্টার ভাদুড়ী। হাঁ, সে তো শুনছি।

জায়া। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদুড়ী। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না? তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদুড়ী। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসে ছিলে। অসম্ভবতা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ী। সম্পূর্ণ আবশ্যিক, যিনি যাই বলুন, ওর চেয়ে আবশ্যিক আর-কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধহয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে কুধাশাস্তি হয় না।

ভাদুড়ী। এই মেসোটি আমার মজ্জেল—অগাধ টাকা—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষাপত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চটপট নিক-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

ভাদুড়ী। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠছে—এক ছেলেকে পোষাপত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা নিধান দিয়ে দাও-না।

ভাদুড়ী। ব্যস্ত হোরো না—পোষাপত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলাম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল, অমনি তখন উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ী। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরও মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে! কিন্তু, আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধহয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন।—বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু, মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষাপত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেক দিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষাপত্র নিচ্ছেন না—বোধহয় ঠুন্দের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা, সতীশ।

সতীশ। আঁ! বলো কী না!

বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেকসময় ভুলও তো হয়।

বিধু। না, ভুল নয় সতীশ, এবার ভোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না দু'কি!

বিধু। দিদির চেহারা বেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বিধু। সতীশ, তুই চাকরির চেষ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, যাই বল মা, এ তাঁর অন্যায়। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় তো কী, সতীশ। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কী রকম ব্যবহার। শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেল। অস্থির হোস নে, সতীশ। একমনে ভগবানকে ডাক্; তাঁর কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো—এখনো সময় আছে। মা, ঐদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকে উঁচত, কিন্তু বেরকম অন্যায় হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে ঐদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে—তিনি দয়া করে বেন--

বিধু। আহা তাই হোক, নইলে ভোর উপায় কী হবে সতীশ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান, তুমি বেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মূখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্‌ফাট সাজ করে কোথায় চলেছিস। উঁচু কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেঁট করবি কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম; কথাবার্তা পরে হবে।

প্রস্থান

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি। মা গো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘ্ন ঘটই ঘটুক শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই। এ আমি বরাবর দেখে আসছি। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি—আমি তো সতী ষ্টী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে, দাঁদির এবারে—

স্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী, মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি?

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল ভাদুড়ীসাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়ীসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেবমানুষ, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলেম, তোমাকে তারা আজকাল পৌঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে? তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ঠুকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে; কিন্তু, সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতাম, কিন্তু ভূমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝিছ, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরও ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আজ্ঞা, আমারই নাহর

দোষ হল, তবু যে কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ দরকার-মতো দুটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছ, না, কিছ, না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

সুকুমারী। খোকর জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই— আর একটা সেলার সূট—

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো, শোনো, ওর মাপটা নিয়ে বেয়ো, জুতো চাই।

সতীশ প্রস্থানোদ্মুখ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—সবগুলো ভালো করে শুনাই যাও। আজও বুঝি ভাদুড়ি-সাহেবের রুটি বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছটফট করছে। খোকর জন্যে স্ট্র-হ্যাট এনা— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম, তোমার মেসের কাছ হতে তুমি নতুন সূট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পরসায় ভাদুড়ি-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না যেন।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ—এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছ, আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হেঁটে চলতে হলেই অর্নি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে তো? মূটেকেও তিনি এক পরসা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মূটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে।

চয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্ গে যা।

হরেন। দেখ-না কী লিখছ—আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি—যা তুই।

হরেন। শুয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমি কাঁচা পেরারা ভালোবাস বুঝি?



আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। আঁ! মিথ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার, ভা, ল, বয়ে আকার সঙ্গে আকার ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা। আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। হ্যাঁ, মিথ্যা কথা! আমি তোমাকে লজ্জাস আনতে বলেছিলাম, তুমি সেই টাকার তোড়া কিনে এনেছ—তাই বইকি, আর-একজনের জিনিস বইকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজ্জাস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

স্টেট লইয়া চীৎকারস্বরে

ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সঙ্গে আকার সা, ভালোবাসা।

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস নে—ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলছি! যা!

হরেনের চীৎকারস্বরে ভ্রমণ, সতীশের সবেগে প্রস্থান

বিধুম্বীর বাস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।

হরেনের ভ্রমণ

এমন ছিচকাঁদনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আমার দিগে ছেলেটির মাথা থাকেন। এখন যেটি চার তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে

দোকান কাটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। কেন নবাবপুত্র। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়।

সতর্কনে

খোকা, চুপ কর্ বলছি। ঐ হামদোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও। আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর, তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষু দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মনুষ্য করলেম, আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ!

বিধু। (সরোদনে) দাঁদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। ছি ছি, খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সরে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজ্জাস অন্তে বলেছিলে, দাদা সেই টাকার ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই এমনি আমাকে মেরেছে।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি? ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-ক'বরাজের বোতল-বোতল ওবুধ গিলছে, তবু দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহানমে।

নলিনী। সে জায়গার বাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়। যে লোক সম্মান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে বেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফ্যানানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দম্ব কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হংকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অর্মান সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাথে আমি তোমার মূখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনও আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনবে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যন্তর আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেসকল ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা ভেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্ন দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির কোরো না। ঐ বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন, আমি বাই।

সতীশ। মিস্টার ভাদুড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি।

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়ি নি।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মূখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না?

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিস-টাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বন্ধমূল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুন।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অনারূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। পদ্রুমান্দ্র পরের পয়সার বাবুর্গিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের বেরূপ চাল দাঁড়িয়েছে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দেবে। মার গহনাগািটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষ্যাম

বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না!

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বদ্বিষ্ণে-  
ছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই। তুমি তো আর  
কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি  
বেড়ে যায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন—আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে  
এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা  
দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও  
নি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু, আমি বলছি, সতীশ  
যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না।  
ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে  
গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির  
থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মদহর্তের  
জন্যেও বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে  
সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার  
বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে  
আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শোঁখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের  
মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার  
মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে!  
নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে! ওমা, কী হবে গো। আমি  
কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুর্ষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত  
না—তা হতে চিরকালের মতো বর্ণিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েছ তাতে  
আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন  
আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে  
আঁছিস কেন। আমাকে চিনতে পারিছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার  
শাসন হতে আমাকে বর্ণিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে।

সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক', তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ, সতীশ! চলো চলো—কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ, একটু ঠান্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মধ্যে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন বস্তুটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিত থাকো।

সতীশ। মেসোমশাই, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করি়েছি তা যদি শেষ করি়িটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো—তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করি়িছ তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব—সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি—পরশু শক্রবারে রেজিস্ট্রী করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্। ও-সব স্নেহ-ফেহ আমি কিছু বদ্বি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই—যা কর্তব্য তা কোনো রকমে পালন করতেই হবে এই বদ্বি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিণ্ডিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন।

### সতীশের প্রশ্ন

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

### সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে

আমাদের তরফ-মানিকপদুর লিখে-পড়ে দেব—তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মূগ্ধ! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না।

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বৃষ্টি নে। তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দাঁড়ি দিয়ে মরব, এই আমি বলে গেলেম।

সুকুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশাই, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ঝিকার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে ষতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকাড়িও আমি বেশি চাই না। তা ছাড়া, তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ, সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বইকি! বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে—কিন্তু ভালো করে বৃষ্টিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েছেন তা উৎসাহ না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছই দরকার নেই, সতীশ—তোমাকে বরণ কিছ, নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আল্পাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চাড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃন্দ্রি দেন নি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বৃন্দ্রি দিয়েছেন তেমনি সপ্তে সপ্তে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু, সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢলেছে সে যদি আজ থাকত তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল। সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচোড়া কথা বলে থাকে। তুমি বৃন্দ্রি সেই ভরসার পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। চাকরি হয়ে অর্থাৎ একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি যাই।

## সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অশ্রুশ্রু কিছুই নেই— কেবল খানকরেক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ যে একতাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সপ্তে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সপ্তে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পারে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই, মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে—তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমাষে একটি তন্দুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কান্ড, সতীশ। এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুন্ট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুরাখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ—আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।



সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনো কালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী স্দকু, এ টাকাগুলো—

স্দকুমারী। গুনে খাতাটির হাতে দাও-না—ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তুমি?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অল্প-ঋণ আবার নতুন করে ফাঁদতে পারব না।

প্রস্থান

স্দকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে-পারিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দ-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কিনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলাম, ইতিমধ্যে গানির টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল পূরণ করে রাখব—কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি—এই যথেষ্ট। নেলি—না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়—আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল। আমার অন্তিমের প্রেমসী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চন্দ্র মৃদব।

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল, তা আমাকে তখন বলে নি—তা হোক, এই বিলের ধারে এই বিলাতি স্টিফানোর্টিস লতার কুঞ্জ আমার এ জন্মের হাওয়া-খাওয়া শেষ করব—মৃত্যুর স্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব—এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতে চাই। পৃথিবী হতে ওই ধূলোটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থার মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

ঘরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্র আছে। কিন্তু,

আমি কমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কম্পনা, ভোগের আশা ছিল—অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অস্বাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না—সেজন্য যারা দারী তাদের কিছুতেই কমা করতে পারব না—কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে—তাদের সকল সুখকে কানা করে দেয়। তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দম্ব জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে—আর-কারও গায়ে হাত দিতে পারবে না। আঃ—তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না—তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁত-মাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-কাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না—অথচ আমার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল—আমার নৌলি—উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সংখ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে! বাপ-মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাঙ্ক্ষা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উর্ধ্ব চড়ে নি—ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কী মূল্য। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কী এমন বড়ো। এখনি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা—ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

ছাড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী। দাদা নাকি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বাবাকে বলে দিয়ে না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়—মেসোমশায়—এইবেলা রক্ষা করো—আর দৌর কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি, মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কিরকম বিস্তী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসুচি! দেখো দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস্-ধড়াস্ করছে। সতীশ মদ ধরেছে বুঝি!

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

হরেনকে লইয়া দ্রুতপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব পুর্লিশ সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এইবেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়—যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শূনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও যাও, আমার সম্মুখ হতে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ওই পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না—মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি—এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ,—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো আমি সব যেন সহ্য করতে পারি--আমার সকল দোষগুণ

নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কী আর বলব। মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি—ভগবান তোর ভালো করুন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে কমা ভিক্ষা করে নিই গে।

প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী, নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উল্টো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলাম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রম্বা আছে।

নলিনী। শ্রম্বা! সতীশ, তোমার উপর ওইজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রম্বা! ছি ছি, শ্রম্বা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি—তোমাদের আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি—এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁঙ্গিকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরও অম্বলা যে ধনীটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই-যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা করে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো।—মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

## গদ্যস্তম্ভ

অমাবস্যার নিশীথরাতি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়-কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মন্দিরের স্ভার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল-কাঠের বাস্ক বাহির হইল। পৈতায় চাৰি বাধা ছিল। সেই চাৰি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাস্কটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর-কিছুই নাই; তাহার প্রবেশস্ভার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাস্কটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাস্কটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল—কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের স্ভার খুলিয়া ফেলিল—তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরের চণ্ডী-মন্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাতি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, “জয় হোক বাবা।”

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভিত্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।”

শুনিলে মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল; কহিল, “আপনি অন্তর্ভামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বদিকলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করয়ো না।”

মৃত্যুঞ্জয় তাহার দৃষ্ট পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু, ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করয়ো না।”

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সন্ধ্যা দৃষ্ট হইয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমন্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তখন এমনি করিয়াই একটি সম্যাসী 'জর হোক বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সম্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমতো সেবার ম্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সম্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস, তুমি কী চাও”, হরিহর কহিল, “বাবা, যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এক কালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিকু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদেরকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু, আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।”

সম্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “বাবা, ছোটো হইয়া সূখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টার শ্রেয় দেখি না।”

কিন্তু, হরিহর তব্দু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত ম্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সম্যাসী তাহার কুলি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠপত্রের মতো গুটানো। সম্যাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা, আর, সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

পারে ধরে সাধা।

রা নাহি দেয় রাধা ॥

শেষে দিল রা,

পাগোল ছাড়ো পা ॥

তেঁতুল বটের কোলে

দক্ষিণে যাও চলে ॥

ঈশানকোণে ঈশানী,

কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, “বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।”

সম্যাসী কহিলেন, “কাজে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে বাহার তুলনা নাই।”

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, “বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।”

সম্যাসী কহিলেন, “না। সাধনা ম্বারা বুঝিতে হইবে।”

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সম্যাসী হাসিয়া কহিলেন,

“বড়ো হইবার পথের দঃখ এখন হইতেই শূন্য হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পার।”

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু, হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর-কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঠালকাঠের বাস্কে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাতে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বৃদ্ধিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, “দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।”

হরিহর কহিল, “দূর পাগল, সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলো হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁক দিয়া গেল—আমি সে পড়াইয়া ফেলিয়াছি।”

শংকর চূপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল—গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান একমুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বৃদ্ধিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদের বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্ত-লিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্র পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সম্বন্ধ ইহার কাছ হইতেই মিলাবে।”

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

০

গ্রামের নাম ধান্নাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মন্দির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেন আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেন। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন

সম্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোবোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সম্যাসী! তাড়াতাড়ি হুকুটা রাখিয়া মর্দিকে সর্চকিত করিয়া এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু, সে সম্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সম্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মর্দিকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঐ-বে মস্ত বন দেখা যাইতেছে ওখানে কী আছে।”

মর্দি কহিল, “এককালে ঐ বন শহর ছিল, কিন্তু অগস্ত্য মর্দিনর শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে, ওখানে অনেক ধনরত্ন আঁজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।”

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মর্দির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাপা চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সম্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ের ধরে সাধা।  
রা নাহি দেয় রাধা ॥  
শেষে দিল রা,  
পাগোল ছাড়ো পা ॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মনে হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার ভ্রম্মা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। ‘রা নাহি দেয় রাধা’ অতএব ‘রাধা’র ‘রা’ না থাকিলে ‘ধা’ রহিল—‘শেষে দিল রা’ অতএব হইল ‘ধারা’—‘পাগোল ছাড়ো পা’, ‘পাগোল’-এর ‘পা’ ছাড়িলে ‘গোল’ বাকি রহিল—অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল ‘ধারাগোল’—এ জায়গাটার নাম তো ‘ধারাগোল’ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহু কষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পূনর্বীর সে বনের মধ্যে বাহা করিল। অপরাহ্নে একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল, আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পশু আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিম পাড়ের প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় ধমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা

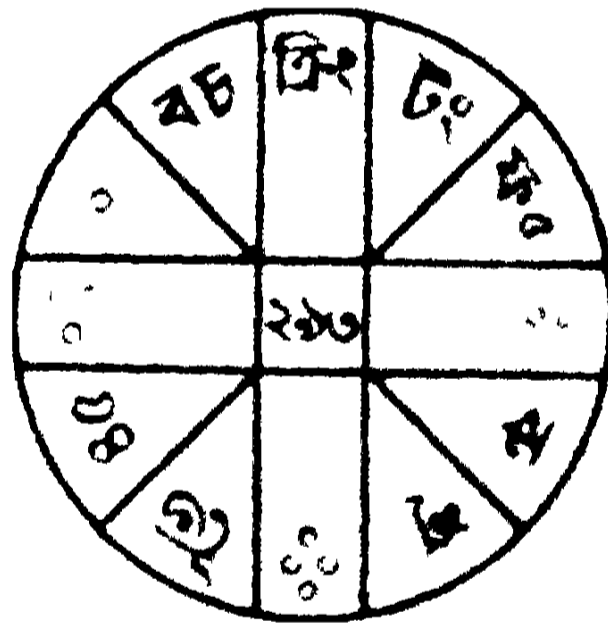


তেঁতুলগাছকে বেটন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—  
তেঁতুল বটের কোলে  
দক্ষিণে যাও চলে ॥

দক্ষিণে কিছূ দূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অর্নতি দূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নমন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল কমন্ডলু আর গেরদুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহু দূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুঁশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় -ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—



এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যারাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রটির উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্য ভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ বাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্ট-সিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিহিতে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তাঁরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ধ্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উল্কার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বৃকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভান্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছূই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মূর্খ হইয়া উঠিল।

এমন সময় কিছদুর ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহু কষ্টে কিছদুর গিয়া একটা অশথ গাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক করিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে— কিছদুর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুদ্ধিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুপ্ত সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না, তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু, দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যিক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে অঙ্ক করিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছই বুদ্ধি নাই। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখন্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন কণি হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কারুশয়গৃহিনী ব্রত-উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া ষষ্ঠ বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উল্টা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় বাইতেছে তাহা কিছই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ত

রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা-কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ঝিকারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনা বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সম্যাসী সুরঞ্জের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঞ্জের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাঁতলা পড়িয়াছে—মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলো ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সম্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বৃদ্ধিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহ-দণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বীর গণনা সারিয়া সুরঞ্জ প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্যাসী বলিয়া উঠিলেন, “আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।”

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ যে গর্দভ মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সম্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সম্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সম্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উঠিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সম্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “পাইয়াছি।”

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল। আর সেই সঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ করিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সম্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সম্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে।” কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাৎড়াইতে গিয়া তাহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি।”

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চক্ৰমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনার আতর্নাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, “এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাইতে পারি নাই—পিছলে পাথরসদৃশ আমি পড়িয়া গেছি। পাটা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাবধর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সদরপেয়র মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গদ্যস্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কর্দ্দিন না-খাইয়া না-ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে ‘পাইয়াছি’ তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ঐ গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জ্বরগাটাও অত্যন্ত পিছল—তাই পড়িয়া গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো—আমি বন্ধ হইয়া এই ধন আগলাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে কাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ত-ভূল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা-পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি—এই ধনের সম্বন্ধে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোখের সম্বন্ধে কখনো লইতে পারিবে না।”

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, “মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি।—তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তার নাম ছিল শংকর।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “আমি সেই শংকর।”

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গদ্যস্ত ধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, “দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবাধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাস্তুর মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সম্বন্ধ পাইলাম, আর শ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সম্বন্ধে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

“কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে লুকাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ঐ কাগজের সম্বন্ধ পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মূহুর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

“অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ শ্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, ‘বাবা, তুচ্ছ দূর করো, তাহা হইলেই বিশ্ব-ব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।’

“তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহে পরমহংস-বাবার ধূনিতে আগুন জ্বলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে-মনে বলিয়াছিলেন, কাগজ-খানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

“কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মূর্তির অপূর্ব আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাই না।

“ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাহার দেখা পাইলাম না।

“আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরানন্ডচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল—সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

“এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিত্তে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন অঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বপরিচিত।

“এক কালে বহুদিন বাহার সম্বন্ধে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, ‘এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।’

“কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে—কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলো লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম;

কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম—সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

“তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরসে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গদ্যস্তম্ভ সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

“সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

“তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সম্বান করিয়াছি। মনে আর-কোনো চিন্তা ছিল না। ষত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল—উদ্ভাসের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসয়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

“ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

“তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভান্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

“এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে-মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই ‘পাইয়াছি’ বলিয়া মনের উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভান্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।”

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভান্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিও না।”

শংকর কহিলেন, “আজ আমার শেষ বন্ধন মৃত্ত হইয়াছে। তুমি ঐ বে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তুমি করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এত দিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাপ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।”

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, “তুমি মৃত্ত পুরুষ, আমি মৃত্ত নহি, আমি মৃত্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।”

এই বলিয়া তাহার ষষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না—আমাকে

দেখাইয়া দাও।”

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাংড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকর্থাধার মতো, বার বার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রান্ত হইয়া এক জায়গায় শূইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাতি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাংড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল, “ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।”

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতি দূর হইতে উত্তর আসিল, “আমি তোমার নিকটেই আছি—কী চাও বলো।”

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, “কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।”

তখন আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দশ প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাতির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, “ওগো, আছ কি।”

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, “এইখানেই আছি। কী চাও।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “আমি আর-কিছু চাই না—আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।”

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ধন চাও না?”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “না, চাহি না।”

তখন চক্ৰমকি ঠোকর শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, “তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।”

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, “বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত বার্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।”

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “কী নিষ্ঠুর।” বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বজীবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কহিল, “ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।”

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীর

ধরিত্তা মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিত্তা অনেক আকাবাকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক জারগার আসিয়া সম্যাসী কহিলেন, “দাঁড়াও।”

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচাপড়া লোহার ম্বার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সম্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিত্তা কহিলেন, “এসো।”

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্ৰমকি ঠোকোর শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গারে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভস্থ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দূরে জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, “এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।”

সম্যাসী কহিলেন, “আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল—আর এই ছাতু চিঁড়া আর বড়ো এক-ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।”

দেখিতে দেখিতে সম্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভান্ডারের লৌহ-ম্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাপেক্ষ উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কম্পনার তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতি-হাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া উর্ধ্বাধিত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশ পিতল-কাসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় ম্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, “ওগো সম্যাসীঠাকুর, আছ কি।”

ম্বার জ্বলিয়া গেল। সম্যাসী কহিলেন, “কী চাও।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “আমি বাহিরে যাইতে চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দূটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।”

সম্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নতুন মশাল জ্বলাইলেন—পূর্ণ কমন্ডল্ একটি রাখিলেন, আর উত্তরীর হইতে কয়েক মর্শ্চি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ম্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাংলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলিকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ



করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে—আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণলব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবস্জা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন স্বেরে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ওগো সম্রাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!”

কিন্তু, স্বের খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু স্বের খুলিল না। এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া স্বেরের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল—তবে আর কি সম্রাসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শূন্য হইয়া মারিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাসোর মতো ঐ সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মর্ন্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া, কঠিন হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোখলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোখলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বলাইয়া বধু ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরাতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যাধিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মন্দির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মন্দির এতক্ষণ রাতে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মন্দির কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গাচ্যুত সাধিকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেলানোঁকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শব্দবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষি-লোক হাতে দূটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারার ক্ষীণ-

লোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃস্তুকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ‘কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিণীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মত্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বৃক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।’

এমন সময় স্মার ধূলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।”

সে বলিয়া উঠিল, “আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মৃস্তু চাই।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “না, যাইব না।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?”

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, “না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কোপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মূহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।”

সন্ন্যাসী কহিলেন, “আচ্ছা, তবে এসো।”

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, “এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।”

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

## মাস্টারমশায়

## ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিম্নতম শব্দসমূহে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বিজিতলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাত-ফের্তা যুবক সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নতুন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধুহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, “মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।”

মজুমদার সর্চকিত হইয়া একটা বিলাতি দিবা গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাংলাইয়া দিয়া ব্রহ্ম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক-স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, ‘এ কী। এ তো আমার পথ নয়!’ তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, ‘হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।’

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে, যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল, ‘এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল।’

“এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!”

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, “ভূম্ ভিতর আকে বৈঠো।”

সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, “নেহি, সাব, ভিতর নেহি যারে গা!”

শুনিয়া মজুমদারের গারে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, “জলদি ভিতর আও।”

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, “গাড়োয়ান, গাড়ি বোখো।” বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া খামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার বাস্ত হইয়া কহিল, “আরে, কীহা যাতা।”

কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, 'কোন প্রাচীন রুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum— তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি।' লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অস্বাভাবিকপূর্ব্ব একটা-কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালার' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অস্বস্তি কীর্ণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অশ্বকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তত্ব পাল্লামেন্টের মতো পরস্পর মূখামূখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিটমিটে আলোকশিখার চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফ সামনের আসনে গিয়া বাসবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মূখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ জোর করিয়া বৃজ্ববার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বৃজ্বিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়ীটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়্খড়গগুলো ধর্ধর্ধ করিয়া কাঁপিয়া ধর্ধর্ধ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়ীটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তার গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইল কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই!"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শব্দ স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বৃকি শব্দ স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কণ্ঠপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হোসের মজুমদারিগরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা স্বেচ্ছা খাটাইতেছেন, তাহাকে আর নিজে খাটতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাহার ক্রিয়াকর্ম দানখ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাহার বাঁধানো হুকায় ডামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি-আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দালিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাহার তহবিলে দস্তম্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলোটের চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, “আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!” অধরবাবু অন্তর্গত অন্তর্চর রতিকান্ত বলিল, “বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।”

ছেলোটের নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবু স্থানী ননীবালা সংসার-খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দূটো-একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিস্মৃতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিস্টাভায় ও শিস্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা

করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মৰ্বাদা অক্ষর রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাহার ভাবার মিস্ততা ও আচারের শিষ্টতার কেবলই বেসুর লাগিল—সেই শব্দ সাধনায় ছেলে ভুলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, “ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই বে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।”

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমন ননী-বালার ছেলে স্বয়ম্বামাস্টার হইতে বাসিল—সে যাহাকে না বরিয় লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাখিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্ট্রেন্স্ স্কুলে কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মূখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের ‘কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমন তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।” হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, “বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।” দরোয়ান কহিল, “দেখা হইবে না।” তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে স্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, “বাবু, চলা যাও।”

বেণুর হঠাৎ জিদ চড়িল—সে কহিল, “নোঁহ যায় গা।” বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃষ্ণ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার পড়া কিপৰ্যন্ত।”

হরলাল একটুখানি মূখ নিচু করিয়া কহিল, “এন্ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি।”

রতিকান্ত প্রু ভুলিয়া কহিল, “শব্দ এন্ট্রেন্স্ পাস?” আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।”

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কত এম-এ বি-এ আসিল ও গেল, কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্ট্রেন্স্-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন।”

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কাঁহল, “যাও!” রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে-মনে ভাবিতোছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে, ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

০

এবারে মাস্টার টিকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোটো ছেলোটো তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমনি করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শব্দ পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গাণ্ডি পার হইয়া দৃষ্টান্তমির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্ততঃ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অববেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্য কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চণ্ডলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অনসবের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের দোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগাই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিতে মেলামেশা করিবার

উপযুক্ত ছেলে বেগুদর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অন্তর্কুল অবস্থায় বেগুদর যে-সকল দৌরাশ্বা দশ জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাতিকান্ত বলিতে লাগিল, “আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমশায় মাটি করিতে বাসিয়াছেন।” অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন ষথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেগুদর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেগুদর দয়স এখন এগারো। হরলাল এফ-এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলোটাই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেগুদরকে লইয়া সে গোলদিঘ এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যাগার গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্সপীয়ারের ‘জুলিয়াস্ সীজার’ মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে আর্টনির বস্তুতা মন্থন করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বাসিয়া যখন পড়া মন্থন করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেগুদরকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেগুদর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বৃদ্ধিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেগুদর ইংস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপানি সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে বাস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতার কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, “তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাতি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেগুদর আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।”

সেদিন রাতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জন্য তিন-চারজন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া



বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এসকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুদ্ধিতে বাকি ছিল না। তবু সে চূপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুদ্ধিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পতকণ্ঠে বলিল, “মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।”

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মূখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সর্বাধিকমতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মূখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চা মাছ ছিল। তাহাদিগকে মূড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলো পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুদ্ধি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মূখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মূখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মূখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস না—ব্যাপারখানা কী।”

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, “মাস্টারমশায়—”

মা কহিলেন, “মাস্টারমশায় কী।”

বেগু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, “মাস্টারমশায় বৃদ্ধি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!”  
সে কথার কোনো অর্থ বৃদ্ধিতে না পারিয়া বেগু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলো কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুঁলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুঁলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাস্তব সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রাতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, “যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাস্তব মধ্যে রাখিয়াছে।”

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসমূহ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রাতিকান্ত কহিল, “বাড়িতে অনেক লোক রাখিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। বাহার যখন খুঁশ আসিতেছে যাইতেছে।”

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, “দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেগুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।”

রাতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, “এ তো অতি ভালো কথা—উভয় পক্ষেই ভালো।”

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেগুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেগু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাহার সেই ভঙ্গপ্রায় টিনের পেণ্ট-রাইটও নাই। দড়ির উপর তাহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেগুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নতুন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেগুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেগু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, “বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন?”

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।”

বেগু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া

পাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তত্ত্বপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমনসময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণু কহিল, “মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।”

বেণু তাহাদের বন্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে ঘুটে হরলালের পেটেরা বাঁহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইন্সকুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল ‘আমাদের বাড়ি চলো’, এই স্পর্শ ও এই কথাটাব স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু, ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বন্ধের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুড়ের মতো আর কুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বাসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেকচারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ইঞ্জিনের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয়, বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতার তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টার বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, ‘এ লোকটা চলিবে।’ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাজ জানা আছে?” হরলাল কহিল, “না।” “জামিন দিতে পারিবে?” তাহার উত্তরেও “না।” “কোনো

বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শর্নিয়া সাহেব আরও যেন খুঁশ হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতোছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়ো সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেহনিয়া বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেহনিয়া তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালিগও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুঁচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

হরলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "মা, ওইট মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার সন্নিহিত ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অপরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুঁচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শর্নিয়া মূহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে অপরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল, তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে তাহার নুতন গৌফের রেখার সাধাসাধনা করিতেছে। চাল-চলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই।

ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুহলকে আমোদে রাখে। পাড়বার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু মিত্রবর্ষী বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাতে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, “আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিঁদুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।” ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জুড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল ‘মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো’। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল ‘উহাকে আসিতে বলি’, তাহার পরে ভাবিল ‘বলিয়া লাভ কী—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্’।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রান্না তাহাকে খাওয়াইবেন—‘আহা, বাছার মা মারা গেছে’।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, “অধঃবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।”

বেণু কহিল, “অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।”

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাহার দুই সিন্ধু চক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ‘আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।’

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, “মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল ঘাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।”

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মূহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, “হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।”

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ধনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, ‘বাস্, এই

পর্যন্ত। আর-কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।’

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজার ঢুকিয়াই দেখিল এসেসের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, “কে, মশায়।”

বেগু বলিয়া উঠিল, “মাস্টারমশায়, আমি।”

হরলাল কহিল, “এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।”

বেগু কহিল, “অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।”

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেগু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কথা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, “সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?”

বেগু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়স ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কী ইচ্ছা।”

বেগু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনার অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, “তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?”

বেগু কহিল, “জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।”

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেগু কহিল, “আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মূখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।” বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, “চলো আমি-সুস্থ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।”

বেগু কহিল, “না, আমি সেখানে যাইব না।”

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠান্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাঝে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মদুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া, একটুখানি ইতস্তত করিয়া, সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমনসময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য খালি গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমনসময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরওয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মদুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বৃদ্ধি! রাতকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পদলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্। ওঠ্।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মদুখেই খাবার উঠিল না।

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জ্ঞান কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরওয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন— হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শনিল, বেগু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া বস করিয়া বসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাহার মন আরও স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, “বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন ঢেকে না। আমি বেগুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।” এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত নিয়া তিনি চোখ মর্দাছিলেন।

হরলালের একদিন বেগুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেগু বলিল, “বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দৌর করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁক ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।”

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেগু যে তাহার সেই মাস্টারমশারের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশারের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেগু কহিল, “যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।”



হরলাল কহিল, “অথরবাবু, কি ষাইতে দিবেন।”

বেণু কহিল, “আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে ষেরকম মায়্যা, বিলাতের খরচ তাহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।”

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, “কী কৌশল।”

বেণু কহিল, “আমি হ্যান্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত ষাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।”

হরলাল কহিল, “তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।”

বেণু কহিল, “আপনি পারেন না?”

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, “আমি!” তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, “কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।”

হরলাল হাসিয়া কহিল, “সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।”

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেরে গমন করে।

বেণু কহিল, “আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।”

হরলাল কহিল, “তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।”

বেণু কহিল, “বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।”

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, ‘আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর ভূমিভূমি সমস্ত বেঁচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।’ কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর ভূমিভূমি কিছুই নাই।

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নতন ধরনের। শোঁখিন ধূতিচাদরের বদলে নখর শরীরে পার্শ্ব কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি কক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেঁনে আবশ্য ঘড়ি বুকুর পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আঁস্তনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা ষাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কাহিল, “এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে!”

বেগু কাহিল, “পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।”

বলিতে বলিতে বেগু কাহিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেগুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেগুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেগুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, পরিণীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেগুকে কী বলিয়া যে সাহস দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেগুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেগু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেগু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, “এই আংটিগুলি আমার মায়ের।”

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কাহিল, “বেগু, খাইয়া আসিয়াছ?”

বেগু কাহিল, “হাঁ- আপনার খাওয়া হয় নাই?”

হরলাল কাহিল, “টাকাগুলি গুনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।”

বেগু কাহিল, “আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রাইলাম; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।”

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কাহিল, “আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।”

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেগু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেগুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেগুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না, এই তাহার দুঃখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেগুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময়ে ঘড়ি খুলিয়া বেগু কাহিল, “আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।”

হরলালের মা কাহিলেন, “বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।”

বেগু মিনতি করিয়া কাহিল, “না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে বাইতেই হইবে।”

হরলালকে কহিল, “মাস্টারমশায়, এই আংটিঘাড়িগুলো বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরওয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলো রাখিয়া দিই।”

আপিসের দরওয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেগু তাহার চেন ঘাড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেগু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুম্বকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, “মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।”

তাহার পরে বেগু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়িব লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেগুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা খলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলো পুবেই গনা হইয়া খলিবন্দী হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

## ১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাতে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। মনে দেখিল—বেগুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুন্য যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেগুর মার চুনি-পায়-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শূদ্র রশ্মির সূচিগর্ভিত কালো পর্দাটাকে ফুড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেগুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা নমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া সফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাহার ঘর হইতে কহিলেন, “কী বাবা, উঠিয়াছিস?”

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “বাবা, আমি এইমাত্র

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপ্ন কি মিথ্যা হইবে!”

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলা লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবান্ডের বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বৃকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল— তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণ্ডের হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণ্ড তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণ্ড এই কান্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, “বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বাঁচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।” এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘবে তাল দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন জাহাজে বেণ্ড যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন জাহাজে বেণ্ড আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মূহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োরানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমিত নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিশ্বন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।”

হরলাল বলিয়া উঠিল “মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।” বলিয়া শূন্যকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

“ও মা, কী হইল গো” বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মূখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া, উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, “মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।” বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফাল্গুনের রৌদ্র তাহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, “হরলাল, বাবা হরলাল।”

হরলাল কহিল, “মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।”

মা রোদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, “বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।”

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, “আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।”

দরোয়ান কহিল, “তবে কখন যাইবেন।”

হরলাল কহিল, “সে আমি তোমাকে পরে বলিব।”

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, ‘এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি’ বেগুকে কি জেলে দিব।’

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শূন্য আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্লেট, চিক. সিঁথি, মৃত্তক মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেগুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাও, বাবা।”

হরলাল কহিল, “অধরবাবুর বাড়িতে।”

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শূন্যিয়াছে বেগুর বাপের বিয়ে, তাই শূন্যিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেগুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?”

হরলাল কহিল, “না।” বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই

দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা বেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরওয়ানের পাহারা কড়াকড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুর্লিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দৌতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন ও রত্নিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, “আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।”

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।”

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রত্নিকান্ত কহিল, “আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।”

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আঃ, বোসো-না।”

হরলাল কহিল, “কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।”

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধুতার জন্য বর্কশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “আমি পুর্লিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধাব দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধর আমি শৃষিব না।”

হরলাল কহিল, “আমি ধার দিই নাই।”

অধর কহিলেন, “তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?”

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রত্নিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, “ঠকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।”

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত-পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন বেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু!

তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনো-মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতবে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, “আজ মফস্বলে গেলে না কেন।”

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে—তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, “তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।”

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় গেল?”

হরলাল ‘জানি না’ এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চূপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, “টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।”

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওরে হরলাল, কী হইল রে।”

হরলাল কহিল, “মা, টাকা চুরি গেছে।”

মা কহিলেন, “চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!”

হরলাল কহিল, “মা, চূপ করো।”

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।”

হরলাল কহিল, “দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর-কেহ ছিল না।”

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, “আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।”

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, “সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।”

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, “আচ্ছা, আচ্ছা।”

হরলাল কহিল, “মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতোছি।”

মা উদ্ভিগ্ন হইয়া কহিলেন, “তুই মে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।”

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, “সত্য করিয়া বলো ন্যাপারখানা কী।”

হরলাল কহিল, “আমি টাকা লই নাই।”

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে।

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মৃদু নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।”

বড়োসাহেব কহিলেন, “দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছই বেশ নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।”

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন খাধা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুদা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশোর শেষতলের পক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রোদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো খামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মূহুর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকান্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্রম হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিম্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ, রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুদা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পখিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলার পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও”—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পখিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বদ্বাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুদা ট্রাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া বাইবার জন্য ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িখুড়ি, অনা-গোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুরহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহা নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া বে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক



অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র রুদ্র চক্ষু মেলিয়া শিকারলুপ্ত দানবের মতো চূপ করিয়া রহিল। রাতি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে ষাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শব্দকণ্ঠ ভেদ করিয়া মূখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাতি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতিসামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চূপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পদলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসার যাইতে পারিতোঁছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমনসময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইবে।”

হরলাল করিল, “কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।”

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বৃজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিষ্কার তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কর্তি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মূহুর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মূঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়ছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মূর্ত্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে, বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া

নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তন্ত বাষ্পের বৃন্দবৃন্দ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গিজার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, “বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।”

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবার হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

‘কোথায় যাইতে হইবে’ হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

## রাসমাণির ছেলে

কালীপদর মা ছিলেন রাসমাণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পাড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সর্বাধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বৃদ্ধিতে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনী বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলমিদ তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল, এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন-কি ইহা নির্বৃদ্ধিতারই নামান্তর। অথচ পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে, ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিশোধীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সূচারূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু, শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা বৃদ্ধসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পথক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, “বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখনার দরকার কী।”

শ্যামাচরণ সে কথায় কণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বোধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না; কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, “খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একটু থাকা চলিবে না। কী জানি কোনদিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে, তখন সংসার হারখার হইয়া যাইবে।”

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে, এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন—তাহার যে কোনো-একটা জায়গার জোড় আছে এবং সেই জোড়ের মধ্যে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনার তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না, তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “খুড়ামহাশয়, কান্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।”

ভবানী হতবোধি হইয়া কহিলেন, “সত্য নাকি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।”

তারাপদ কহিলেন, “বিলক্ষণ! জানেন না তো কী! দেশসুন্দর লোক জানে, পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলম্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতে আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন—সেই ভাবেই তো এ-পর্বন্ত চলিয়া আসিতেছে।”

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বাড়ি?”

তারাপদ কহিলেন, “ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।”

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার ঔদ্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা বৃদ্ধসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “ওমা, সে কী কথা! আলম্দি তালুক তো আমার খোর-পোষের জন্য আমি স্থায়ীস্বরূপে পাইয়াছিলাম—তাহার আরও তো তেমন বেশি নয়।

পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।”

ভবানী কহিলেন, “তারা পদ বলে, পিতা আমাদেরকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।”

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, “সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন। কতী নিজের হাতে তাহার উইল দই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিদ্ধকেই আছে।”

সিদ্ধক খোলা হইল। সেখানে আলম্দি তালুকের দানপত্র আছে, কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে, নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে, তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা, আর ছেলোট মন্ত্রদাতা। পিতাপুত্রের গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, “উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দই ভায়ের ভৌ সমান অংশ থাকিবেই।”

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিদ্ধকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেচার বাসাটি একেবারে শূন্য—সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খসিয়া পাড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর, আলম্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র, কিন্তু বংশমর্ষাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন, ভারি জিতিয়াছি। তারা পদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

২

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মতো দাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কতীর উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল, ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, “ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।” ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, “আমি আইন-আদালত কিছুই বুঝি না; আমি তোমাকে বলিতেছি, কতীর সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।”

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাসবাক্য তাহার পক্ষে অত্যন্ত

সাম্বন্ধনার জ্ঞানস। সতীসাধনীর বাক্য ফালিবেই, যাহা তাহারই তাহা আপনাই তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাহার আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই-ষে অল্পবস্ত্রের কষ্ট, এই-ষে পূর্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দু দিনের একটা অভিনয়মাত্র— এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধূতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধূতি তাহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইহারা জানে না, এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য— তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে।' সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুস্ৰটি ছিল নোটো চাকর। কতবার পূজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু-ভৃত্যে ভাবী সূদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্ষবশত নটাবহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তাঁর ভৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপর বিষয়সম্পর্কিত সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দৃষ্টিমত্তা ছিল না। কেবল তাহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে, নববধু সম্বন্ধে তাহার বিশেষ শখ ছিল— বরষ সেবক ও অশ্বের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষয় বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জ্ঞানিতেন।

এমন সময় যখন তাহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে— স্বয়ং স্বর্গীর কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে, হৃতসম্পর্কিত উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল

করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনন্দকল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কতব্য আছে। আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানী-চরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ বেদনা তিন ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না' ইহা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না, প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমাণি ছিলেন অন্য ধরনের মানুস। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন; ভাবিতেন, যে রূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব-বংশে তাহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাহার এ তৃষ্ণা ক্রমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্ষাদা সম্বন্ধে ঠিকমতো ধারণা করাই তাহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমাণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন; বলিতেন, "আমি গরিবের মেয়ে, মান-সম্মতের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।" উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুসই ছিল না যাহার সঙ্গে তাহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল, এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই-একবার তাহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা, এই দুইয়ের প্রতিই তাহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না; উপস্থিত প্রয়োজনই তাহার সমস্ত চিন্তাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনও তাহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভরে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমাণির উপরে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ, এ সংসারের সঙ্কল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলাসেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহা বৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশস্যের উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মূখের কাছে পাকা ফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে—সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে, ইহারা ভারি অপমান বোধ করে—এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে; আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি

আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া লওয়া— তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, টানাটানি করিয়া, দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। বাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে, অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে বাহারা নিদ্রা দেন তাহার প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সূচ্যাত্তি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক বহুত্ব অল্পস্বল্প যা-কিছু এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা-আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তর্হাশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনোদিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্ত্রের ঠিক উল্টো, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিন্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পরসা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্যন্ত তাহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহার বংশোচিত কদুশয়তার উল্লেখ করিয়া তাহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাহার স্বামীও তাহার কৃপণতা ও তাহার কর্কশতাকে তাহাদের বিশ্ব-বিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আর্পিস্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমানুষিয়ানার কিছুই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া, ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে আশ্রয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক, তাহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকতে, সে বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই— এই তাহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাসড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাহার স্বামীর সঙ্গীরা তাহাকে ভারি ভয় করিত। প্রথরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন, এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত



সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীজনোচিত সদুযোগ তাহার ঘটিল না।

এ-পর্যন্ত ভবানীচরণ তাহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু, কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পদ্যটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, 'বেচারিা করবে কী, উহার দোষ কী, ও বড়োমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর তো উপায় নাই।' এইজন্য, তাহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু হ্রদটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয়তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!" বলিয়া নিজের কম্পিত অসতর্কতাকে ধিক্কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটের দোষেই নতুন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বৃন্দ্রি প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন—ভবানীচরণ তখন তাহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত—ভবানীচরণ অম্লানমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর— তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাহার কম্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—“নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুঁশ আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।”

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু, নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাহারই গর্ভের সন্তান— তাহার আবার কিসের বাবুসানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক—অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খুব মোটারকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মর্দুগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপে শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মর্শকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবল পক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন, এবারেও তাহাকে অগত্যা

হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাহার বিরুদ্ধতা ঘূঁচল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মর্দি দিয়া গুড়মর্দি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়।

পূজার সময় তাহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নতুন সাজসজ্জা পরিয়া তাহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদের জন্য যে সস্তা কাপড়-জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বৃদ্ধাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, “কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুঁশ হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছ্ জানে না—তুমি কেন মিছামিছ মন ভার করিয়া থাক।” কিন্তু, ভবানীচরণ কিছ্‌তেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারী কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তৃত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাহাকে ছুঁটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছ্‌তেই লেখিতে পারেন না। তাহাকে মূখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকন্দমা চালাইবার পর হইতে তাহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপত্রটি প্রতি বৎসর পূজার কিছ্‌ পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ ছিড়ি ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সার্টিনের থান, কবিতা-লেখা-পাড়-ওয়াল শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবু মহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণই আপনার গ্রামাতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যান্তরিত্ত্ব বায় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মূর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন-এক জায়গায় দম্ব দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাথা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদের অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছ্‌ না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাহার মূখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাহার কাছে, খরচও তাহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাহার অন্নপূর্ণার স্কারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন।

রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, “পাগল হইয়াছ!”

ভবানীচরণ চূপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পালস দাও, সেটার তো প্রয়োজন নাই!”

রাসমণি বলিলেন, “প্রয়োজন নাই তো কী।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “কবিরাজ বলে, উহাতে পিস্তবৃন্দ হয়।”

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “তোমার কবিরাজ তো সব জানে!”

ভবানীচরণ কহিলেন, “আমি তো বলি, রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।”

রাসমণি কহিলেন, “পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।”

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত—কিন্তু, সে দিকে ভারি কড়াকড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু, বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুদার বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন; তবু আজ তাহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথা আভাস দিতেও তাহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামি পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুম্বপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, “সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশ নাই—তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।”

জামিয়ারের চেয়ে অল্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত, এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না—গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, “বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।”

ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, “রোস—এখনই কী। সন্তমী পূজার দিন আগে আসুক।”

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যতর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কী-একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন “দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।”

রাসমণি কহিলেন, “বাবাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “দেখ নাই! ও চূপ করিয়া বসিয়া থাকে। কী যেন ভাবে।”

রাসমণি কহিলেন, “ও একদণ্ড চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দৃষ্টান্ত করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।”

দুর্গপ্রাচীরের এ দিকটাতেও কোনো দুর্বলতা দেখা গেল না— পাথরের উপরে গোলায় দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব করিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাহার পাতে দই পায়স অর্মানি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুইতে পারিলেন না। বলিলেন, ক্ষুধা একেবারেই নাই।

এবার দুর্গপ্রাচীরে মন্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃত্তে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাক-নাম ধরিয়া বলিলেন, “ভেটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অর্ধেক চুরি করা হয়, তা জান!”

কালীপদ নাকী সূয়ে কহিল, “আমি কী জানি। বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।”

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ, কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাহাদের দারিদ্র্যের কত ক্ষতি, কত দুঃখ, তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই— তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া, এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনে এক জ্বরগায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও এক রকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু, মেমের দিক হইতে মন এক মূহুর্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন, তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মূখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন; কঠোর স্বরে কহিলেন, “তুমি রাগই কর আর কাণ্ডাকাটাই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।”

এই বলিয়া আর কথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “বাবা, আমার সেই মেম—”

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না; কালীপদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “রোস্ বাবা, আমার একটা কাজ আছে—সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।”—বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদের মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মূছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বাজনা করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার করুণ সুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।”

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে সুপারি কাটিতেছিলেন। তাহার মূখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কী একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা সুপারি ফেলিয়া রাসমণি তখনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাহার মূখ দেখিয়া বোধ হইল, আজও দীর্ঘপায়সের সদগতি হইবে না, এমন-কি মাছের মূড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগবে।

তখন দাঁড়িয়া মোড়া কাগজের এক বাস্তু লইয়া রাসমণি তাহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনই এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন, ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দীর্ঘ পায়স ও মাছের মূড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনই এটা বাহির করিতে হইল। বাস্তুের ভিতর হইতে সেই মেম-মূর্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, “আজ রান্নাটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর, দুইটা যে কী চমৎকার জমিয়াছে সে আর কী বলিব।”

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা-খাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্বেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তকণ এই পদতুলের একঘেয়ে পাখা-নাড়ায় সে নিশ্চয়ই এক দিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত—কিন্তু অষ্টমীর দিনেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাহার গব্বপত্রকে দুই টাকা নগদ দিয়া কেবল এক দিনের জন্য এই পদতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাস্তুসমেত পদতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই এক দিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেকদিন তাহার মনে জাগরুক হইয়া রহিল, তাহার কম্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্তণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পত্রের উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বৃদ্ধিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাহাদের বিষয়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, “কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।”

মা বলিলেন, “সে তো ঠিক কথা, বাবা। কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।”

কালীপদ কহিল, “আমার জন্য কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।”

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়-সম্পত্তি যে কিছুই নাই, সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে বৃত্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, “কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।” কিন্তু, পদ্রুধানক্রমে কোনোদিন শানিয়ার্টির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদের মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারও মাথায় আসিতে পারে, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বৃদ্ধমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, “কালীপদ একদিন উঁকল হইয়া সেই উঁইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন—অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।”

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছার বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উঁইল-চুরি লইয়া কালীপদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মস্তুর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা, তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যান্যটা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালীপদের কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদের গলার একটি রস্কাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন, “এই নোটটি রাখিয়া, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে।” সংসার-খরচ

হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

৩

ভবানীচরণের মূখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাহার কম্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই—এমন-কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পুল বাঁধা হইতেছে, এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। “শুনেছ, ভায়া? গঙ্গার উপর আর-একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে—আজই কালীপদের চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে।”—বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া মূছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। “দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর-শেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!” গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বর্তা তাহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অল্প লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দৃশিচক্ষুতাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই।” মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গঙ্গা যখনই ঘাইবার উপক্রম করিবেন তখনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদের চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহু কষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রায়ে হিসাবের খাতা নকল করিয়া, পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা-উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ্য দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজ্যটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পার এবং মেসের সেই স্যাংসেতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সূঁবিধা এই

যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। সুতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনই হউক, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা শ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক, কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচয় আবশ্যিক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যিক—তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ-জাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল—সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু, আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গে খুবই ভালোবাসে; কিন্তু আত্মীয়দের মর্শকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়—কাহারও সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে, অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজ্রায় রাখিবার জন্য ভালো-লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু, শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিত্র খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু, এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমনে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার-দেখানো, পাঠা-খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা—তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মৃগধর যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন যথেষ্ট মনোহরণের উপযোগী শোখিন সাবান এবং এসেন্স, আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের



জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দৃষ্টিচ্যুতায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সূরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, “তোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।” দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিত, “আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।” বলিয়া সব-চেয়ে শোখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, “হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।” খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মূখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অর্কিণ্ডকর ভারটা নিজেই লইত—অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔষ্যতা সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারী কালীপদ নীচের স্যাংসেংতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া, একখনা ছেঁড়া গোর্গি পরিয়া, বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুর্লিতে দুর্লিতে পড়া মূখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেলো তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁষে নাই—এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুর্হ সমস্যা এক মুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে, তবু কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদের লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিতৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তবু দূরে থাকিবে, শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, অশনে বসনে কালীপদের দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়-চোপড় এবং মশারি-বিছানা যখনই দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো, এবং সে দুইসন্ধ্যা যথাবিধি আহিক করিত। তাহার এই-সকল অস্বভূত গ্রামাতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই-একটি লোক এই নিতৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উন্মোচন করিবার জন্য দুই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু, এই মূখচোরা মানুষের মূখ খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভাঙ্গা দিতে হইল।

তাহাদের পাঠার মাংসের ভোজে এই অর্কিণ্ডনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস

অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধূপ্ধাপ শব্দ ও সবেগে গান-বাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কালিকাতায় আহাৰ ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথা ধরার ব্যামো উপসর্গ জ্বটিল। কখনো কখনো এমন হইত, তিন-চারি দিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কালিকাতায় থাকিতে দিবে না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা কালিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন, কালিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে বাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগায়ে যেমন গাছপালা কোপকাড় আপনিই জন্মে কালিকাতার হাওয়ার সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে, এইরূপ তাহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু, এইরূপ পড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতর কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া সকলের লক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার এক পাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতা-মেলামতওয়ালা মর্চির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।” কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।” “এই-সে, এইখানেই আছে” বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস ভুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, ‘এফ. এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।’

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধূম করিয়া সর্বস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে, কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত

বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এ-পর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই, তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্সা দিতে চায়!'

সরস্বতীপূজা ধুম করিয়া হইল—কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু, কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত—সকল দিন সময়মতো আহার জুটত না। তা ছাড়া, পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কর্মবোধ সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটুকু গাঁদাফুলের শৃঙ্খল পতনের সঙ্গে বিনাভিত্তি দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথা ধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই বাড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরও একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও, বিনা ভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিভলবাসীরা আশা করিয়াছিল, এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু, যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধূতির উপর সেই তাহার চিরকালে চেক-কাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোর্টরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা-কাপড়ে-বাঁধা মস্ত পুটুলি-সমেত টিনের বাস্ক নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মূর্তি তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পুটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুঁরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা-আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মৃৎকরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত, তাহার অবর্তমানে কোঁতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রামাঞ্চলের আদরের ধন; যে আধারে সেগুলি রক্ষিত সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-টাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসম্ভার কোনো লক্ষণ নাই; তাহা কাচের পাঠ নয়, তাহা চিনামাটির ভান্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই

অসহ্য। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগুলিকে তত্তাপোশের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, “ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জ্বল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে—একেবারে দ্বিতীয় ‘ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল’ হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়না কোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধ, ওকে একটা ভদ্রগোছের নতুন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়৷ গেছে।”

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বান্ধুশূন্য বন্ধ ঘরে কালীপদ গা ধুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে, তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, “এবারে কালীপদ কোন্ সাত রাজার ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে, সেটা তোমরা ঝুঁজিয়া বাহির করো।”

এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা; তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে; প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে, সেই অবকাশে জন দুই-তিন অত্যন্ত অমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা ধুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তত্তাপোশের নীচে হইতে আচার চার্টনি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভান্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু, সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীর সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

ধুঁজিতে ধুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিয়া টিনের বান্ধটা ধুলিতেই কয়েকটা ময়লা-কাপড় বই খাতা কাঁচি ছুরি কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বান্ধ বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সমস্ত কাপড়-চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল ধুলিতেই ছোঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো-হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্য কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দেহ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো কেন কাহার কাশি শোনা

গেল। তৎক্ষণাৎ বাস্কেটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছই নয়, তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাস্কে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কিরকম কান্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত, মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বৃঝিয়াছিল, এখন কিছদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তত্ত্বাপোশের নীচে হইতে টিনের বাস্কেটা টানিয়া দেখিল বাস্কেটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল, হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চাবি আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাস্কে খুলিয়া দেখে, তাহার কাপড়-চোপড় সমস্ত উলট-পালট। তাহার বুক দর্মিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সেই মাতৃদস্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলো আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাছে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অটুহাসের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি—জীবনের কত মহত্বকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব-চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহত্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতল-স্পর্শ স্নেহসমুদ্র-মন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়ারকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পারের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেইরকম।

উপরের তলায় অটুহাসা শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল, এ চোরের কাজ নয়। এক মহত্বের সে বৃঝিতে পারিল, শৈলেন্দুর দল কৌতুক করিয়া

তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ধনমদগর্বিত যুবকেরা তাহার মাগের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ— তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পারে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথা ধরার উত্তেজনার তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার—কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদ-ওয়ালার বারান্দায় বন্ধুগণ কেহ বা চোঁকিতে, কেহ বা বেতের মোড়ায় বসিয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদগদস্বরে বলিয়া উঠিল, “দিন, আমার নোট দিন।”

যদি সে মিনতির সুরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, উন্মত্তবৎ ক্রন্দমূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত খাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারওয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত, সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, “কী বলেন, মশায়! কিসের নোট।”

কালীপদ কহিল, “আমার দাঙ্গ থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।”

“এত বড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!”

কালীপদের হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবন্ধ বাঘের মতো গুম্বরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মাঝিয়াছে তাহারা তাহার ঔন্মত্তাকে অসহ্য বলিয়া বিষম আশ্চর্য্য করিতে লাগিল।

সে রাগিত যে কালীপদের কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, “দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।”

সহচররা কহিল, “পাগল হয়েছে! তেজটুকু আগে মরুক—আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্‌ন্‌ আপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।”

যথাসময়ে সকলে শুনিতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদের কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল। ভাবিল, হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংশ্রব নাই, সমস্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী-যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে ‘বাবা’ ‘বাবা’ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-

তিনবার ডাকিল, “কালীপদবাবু!” কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়-বিড় বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, “কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।” দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মূখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু, তাহার মনের মধ্যে বিধিতে লাগিল। সে বলিল, “দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।”

কেহ কেহ পরামর্শ দিল, “পুলিস ডাকিয়া আনো—কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে—কাল যেরকম কান্ড দেখিয়াছি—সাহস হয় না।”

শৈলেন কহিল, “না—শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।”

অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, “এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।”

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল—তত্ত্বাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা দ্রুত হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে; তাহার রক্তবর্ণ চোখদুটা খোলা এবং তাহার মূখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার আত্মীয় কেহ আছে?”

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বলুন দেখি।”

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।”

শৈলেন কহিল, “ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই—আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সম্বন্ধ করিব। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।”

ডাক্তার কহিলেন, “এ ঘর হইতে রোগীকে এখনই দোতলার কোনো ভালো ঘর লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শব্দশ্রবণ ব্যবস্থা করাও চাই।”

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদের মাথায় বরফের পুটুনি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদের বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাস খুঁজিতে হইল। তাহার বাসের মধ্যে দুই তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিষক্রে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি, আর-একটিতে তাহার পিতার। মাতার চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুণি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর

বিছানার পাশে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয়-আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানী-চরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তম্ভ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মূখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল, তাহার মূখের সঙ্গে কালীপদর মূখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন— শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্বন্ত পরম স্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাহার দেবর বটে, কিন্তু তাহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাহার স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাহার বন্ধ ভূষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাহার ছেলেদের বলিয়াছেন, “ভবানীচরণ নিতান্ত অধিক ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস— আমার শব্দর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।” তাহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল, সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন-কি, পিতামহী তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না— কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন-সত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভর্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লঙ্কার সীমা থাকিত না।

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিষয়ে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাহার কষ্ট-সংশ্লিষ্ট অর্ধের অধিকাংশই তাহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, “দেখো যেন অমর না হয়। যদি তেমন বোধ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।” চৌধুরীবাড়ির খবর



পক্ষে হট্ হট্ করিয়া কলিকাতার যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে, প্রথম সংবাদেই তাহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল— ইহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেন— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মূখের কাছে মূখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জ্বর পূর্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না, এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত, তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে, কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখেই কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কাবণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাহার পরমাশ্রয়ী নহে, এ কথা কে বলিবে। বিশেষত, কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাহাকে যেরকম ভক্তিপ্রসূ করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের বুদ্ধি এইপ্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, 'সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগায়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবর্তই বা কী।'

জ্বর কিছু কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চেতনা লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রামা পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর। মনে হইল 'এ কি মন্দ দেখিতোছি!'

তখন তাহার বেশি-কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সংকট উপস্থিত হইবে, সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

এক সময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমনসময় শৈলেন্দ্র একটি পাতে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া

তাহার মূখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছ্‌ পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্ৰ টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, “আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাফ করুন।”

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বদ্বিতে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল, এই যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মূখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধুর মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশি হইত—কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার বাবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শোখিন চানরের সুগন্ধ কালীপদের অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তা-রেখাহীন তরুণ মূখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মূহূর্ত্ত কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাংসেতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকে ঐশ্বর্য-বিচূড়িত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্ৰ বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সুন্দর মূখের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না—আন্তে আন্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।”

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাল জামিয়া উঠিল। শৈলেন তাহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টামাশা চলে। তাহাদের উভয় পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকুরদাদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকুরদাদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা আজ সে নিলম্বভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদের মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায়, যদি তাহারা ইহার আদর বোধে। কালীপদের কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন, সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদের মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান

ছিল—কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। ‘আমরা গরিব’ এ কথাটাকে কোনো ‘কিন্তু’ দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাহাদের ঐশ্বরের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু, সে যে তাহার সুখের দিন ছিল, তখন তাহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত, শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজ্ঞায়া রমাসুন্দরী, যখন তাহাদের সংসারে গৃহিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের স্বেদে দাঁড়াইয়া কী অজস্র আদরই তাহারা লুঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সম্বন্ধা সোনার মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু, এই-সমস্ত সুখস্মৃতি-আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনও সে উইল পাওয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে তাহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাহার সতীসাধনী মার কথা কখনোই বার্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পাড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত, এটা তাহার পিতার একটা পাগলামি মাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগলামিকে আপোসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, “না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।” কিন্তু, এরূপ তর্কে উলটা ফল হইত। তাহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত, কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সেও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য-সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাহার মা লিখিতে পাড়িতে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাস্তব করিয়া লোহার সিঁদুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাহার সামনেই মা যখন বাস্তব খুলিলেন তখন দেখা গেল, অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমন আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, “তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমার ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম সুখের কথা।” শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পাড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ, তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই, এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু, এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না;

অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যান্য আছে, সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলার্শিপ ফস্কাইয়া গিয়াছে, আর তো সেরূপ হইলে চলবে না। শৈলেনকে স্কাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল; এ সম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, “বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।”

শৈলেনও বলিল, “এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর, আমরা তো আছি।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই, ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকরুর্নান্দিকে যখন ঘোঁটা ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।”

শৈলেন হাসিয়া কহিল, “ঠাকরুদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকরুর্নান্দিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।”

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, “আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।”

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবার পালিত জীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরবন্ধের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতোঁছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, এমনসময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম। কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজ্জিক মুখস্ত করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, “এবার তো গাভিক ভালো বোধ করিতেছি না।”

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, “দেখো ঠাকরুদা, তোমারও কষ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, ভাই আমি বলি, আর দেরি না করিয়া ঠাকরুর্নান্দিকে আনানো যাক।”

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক, একটা প্রকাণ্ড জ্বর আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার হাত-পা ধর-ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি

বলিলেন, “তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।”

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা-মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধনিগর্দল তাঁহার বৃকে বঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না— তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল—স্বামীর মধ্যে আবার দুইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, ‘আর আমার সয় না।’ তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

### ৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্রান্তিতে কেবল ক্রমকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, ভবানীচরণের ঘুম হইতেনিহন না। কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকাবে ‘দয়াময় হরি’ বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় তাঁহা সেই জ্যামিতের রেখাগর্দল দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগর্দল হ ত-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয়খণ্ড রয়াল-রীডারের ছিন্নাবশেষ আঁড়ও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়—তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চিটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলদীপ্তিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শব্দক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বৃকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঞ্জর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকা-লতা কণ্ঠের বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে—তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বাগানের ঝরপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের

কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময়—পূজার সময়—কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাহার দারিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। “ওরে বাপ আমার!” বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতার গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল।—বাহিরে বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময় অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বৃদ্ধের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে, তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাহার মনে হইল, কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু, বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে—ও যে ভিজবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যখন তাহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাহার ঘরের সামনে আসিয়া মূহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মূড়ি দিয়াছে— তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু, সে যেন মাথার কালীপদেরই মতো হইবে। “এসেছিস বাপ!” বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলার একবার ‘কালীপদ’ বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুটেদুলিতে বাধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন, একটা পুরাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কী ও।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “সেই উইল।”

রাসমণি কহিলেন, “কে দিল।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।”

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কী হইবে।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “আর আমার কোনো দরকার নাই।”

বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, “আমি বলি নাই কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?”

রাসমণি কহিল, “কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে

এসে পেশাছিল তখন একটি সুন্দর-দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী-একটা দেখিয়াছিলাম।”

“আরে দূর” বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

আশ্বিন ১৩১৮

## পণরক্ষা

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সম্মানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প-কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোলো বছরের ছোটো। মাঝে ষে-কয়টি ভাইবোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া যখন রসিকের এক বছর বয়স তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাখানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু, সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতের ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মূহমূহ জয়শব্দ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চার না—ঠুক্ঠাক্ ঠুক্ঠাক্ করিয়া সূতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনও চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে বলে কৌশলে তাহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সর্বিধা ছিল। থানাগড়ের বাবু তাহার মূর্খ ছিলেন। তাহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় শোখিন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সেজন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড়ো বেশি, তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও সজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর-আব সকল বিষয়েই রসিকের যাহা-কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিন-শো টাকা পণ এবং অলংকার বাবদ আর এক-শো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ, মেয়েটির বয়স সবে চার—এখনো অন্তত চার-পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু, কোষ্ঠীতে তাহার সন্তানের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শত-গ্রহের দৃষ্টি নহে।



রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বশিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার স্যামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লক্ষ্য কম্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের শোখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মূগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটা আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই, সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনেপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন-কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু, তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা-কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা-কোনো বিদ্যা অয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না—তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধাসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ানির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুর্বাড়ির ফোয়ারা ছুঁটিল না। রসিক তখন চাপকান-জোশ্বা-পরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাস্তব হার্মোনিয়াম লইয়া লক্ষ্যে ঠুংনি সাধিতোঁছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনো সুসভ কখনো দুর্ভাগ হইয়া সে লোককে আরও বেশি মূগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, 'এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনো-মতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়!' এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাখানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে, 'আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।'

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিতান্তন লখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধু কেবলই দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পারিল না, এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল, তখন বংশী মনে মনে কহিল, 'আমার আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।'

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বরপ্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুখা—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্তি গাড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পদতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্দুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল সৌরভী, সে বড়ো শান্ত—সে চূপ

করিয়া বসিয়া পুতুল-গড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমতো রসিককে কাঁচা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোঁগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগুণি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত “সৈরি, তুই এর কোনটা নিবি বল্”, তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুঁশ লইতে পারিত, কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমতো জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুল-গড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত, রসিক তাহাদের সকলকেই হুংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না; সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া, বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া, বাম হাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া, চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, “আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্।” সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতি-সত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনো-দিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নতুনগোছের যাহা-কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য বাস্তু হইয়া উঠিত। রসিক কাহারও আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়ো— পাঁচ-শো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

২

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁত-বোনার সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত, ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, ‘দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না।’ তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধু আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ঐশ্বর্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো

জ্বালা হইয়াছে। বরসম্ভা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তব্দ্ব যথেষ্ট দ্রুত বেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরও বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষ্পত্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিটমিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে, এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়িকির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর-একটু হাতে টাকা জমুক, আসছে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' সুবিধামতো বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাছে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভৎসনা করিল; কাহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো-হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কটুক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল, এত বড়ো অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছ্ খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনদেহে মাছ ধরিতে বাসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তম্ভ, ভাঙা উঁচু পাড়ের উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে, এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল, রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাড়ের মধ্যকার মাছ ধরবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাসু করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন তাহার কাছে রসিক পান চাতিবে বলিয়া সৌভাগ্যী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষমা পাইয়াছে, কিছ্ খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌভাগ্যী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মর্ডিমর্ডিক আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল,

বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা, ইহা তো ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত অন্ন চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরন্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু, স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরন্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দুরন্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সম্মানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে, তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মদ্য দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল, এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু, সেরূপ ফল তো দেখা গেল না। 'দাদা মনে করিয়াছেন, সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!' সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমন পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারি আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকম-সকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল সে তো ঘুঁচিয়াই গেল—তার পর সর্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাখানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুঁশি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু-না-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর-যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহুদূরের জন্য তাহার চিন্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল—বংশী তাহাকে খুব বেশি কাজ করাইত না। কিন্তু, ঐ একটুকু কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন নিস্পাদ হইয়া গেল; এরূপ খন্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

এই সময়ে খানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্‌ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু, কী চমৎকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন ভীক্ষু সুদর্শনচক্রে মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মতো মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল, এই বাইসিক্‌ল্‌ নাহলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কী বেশি। এক-শো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই এক-শো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নতুন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা তো সস্তা। বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্যের অরুণসারথি তো সৃষ্টিকর্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবীর জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্‌ল্‌টি তাহার পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তম্ভ করিয়া কেবল এক-শো পঁচিশ টাকার জন্য দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। কাহিল, “আমাকে এক-শো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।”

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মূহূর্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, ‘দূর হোক্‌গে ছাই, এমন করিয়া আর টানা-টানি করা যায় না—দিয়া ফেলি।’ কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! এক-শো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক এক-শো পঁচিশ টাকা ধার শর্ধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল, “সে কি হয়। এক-শো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।”

রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, “এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।”

বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, “এও তো মজা মন্দ নয়। পাণ্ডীকে টাকা দিতে হইবে, আবার পাণ্ডীকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।”

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “আমার অসুখ করিয়াছে।” তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, “থাক্‌, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না।”

বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়স্কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিম্নতচণ্ডল মাকুগুলা ইন্দুর-বাহনের মতো সিম্বিদাতা গণনারককে বাংলাদেশের তাঁতের ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দোড়াইতে লাগিল। এখন এক মূহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধোর অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু, হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মোনিয়ম যন্ত্র আবার লক্ষ্যে ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন পূর্নকিত হইয়া উঠিত; আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্রান্ত দেহ আরও জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্বেগ হইয়া জবাব করিল, “তোমার অশ্রু যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি” ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, “আর মিথ্যা বড়াই করিও, কাজ নাই, তোমার সামর্থ্য যতদূর তের দেখিয়াছি! শূন্য বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।” বলিয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সংগীত জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দল চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতদূর গং জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সপ্তয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কান্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে ‘দাদা’ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা

হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মূখের মধ্যে পুঁরিবার চেষ্টা করিত, সে-সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-কয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়াল রসিক চূপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা এক খাল খুলিয়া ফেলিল, রুদ্ধপ্রায়-কণ্ঠে কহিল, “এই নে, ভাই—আমার এ টাকা সমস্ত তোমারই জন্য। তোমারই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু, তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার—আমার সে শক্তি নাই—তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোমার যা খুঁশি তাই করিস।”

রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, “চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব—তোমার ও টাকা আমি ছুইব না।” বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

## ৪

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি—অথচ সে যে এত বড়ো একটা ভয়ংকর আড়ি করিয়াছে, সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া, আপন-মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, “গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি?”

হার্মোনিয়ম! এত বড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব। কিন্তু, যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল; বলিয়া রাখিল, ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল, সে ডাক অন্তত আরও একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, “সেঁরি কোথায় আছে

একবার ডাকিয়া আনু তো।”

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “সৈরি বলিল, তাহাকে এখন বাড়ি শূকাইতে দিতে হইবে, তাহার সময় নাই।” রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, “চল্ দেখি, সে কোথায় বাড়ি শূকাইতেছে।” রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বাড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর-কোথাও শূকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “রাগ করোঁছিস সৈরি?” সে আঁকিয়া-বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মূখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সূতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগুলো কাঁথা নক্সা ছিল, কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত; সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল, এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সান্দ্রনয়ন অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই-তিন বাসিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রসিকের সাহায্যে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। ইঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাতি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, “সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখাবি না?”

অনেক কষ্টে সৌরভীর মূখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মূখ কাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া।

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল—সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, “সৈরি, এ কাঁথা তোমার জন্যই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম”, তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল বার্ষ কালব্যয়-নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অন্তর্ভুক্তি চলিতে থাকিবে, দুটি বালক-বালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই



ভাব করিয়া লইল; কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রোটা বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রান্না দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কী রান্না হইবে”, বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, “আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না—রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।” স্ত্রীলোকটি বলিল, রসিক তাহাকে বলিয়াছে সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টার মাথা পর্যন্ত মর্দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল তাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান রূপার মর্দি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গোরু দুটি আপন-মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাতে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অক্ষুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলমাণ্ড আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না, কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। ‘উপার্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই’ যেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মর্দিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্লে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলবে না—রহিল এখানকার চন্দনীদেহের ঘাট, এখানকার সুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্গুন মাসে সর্ষেখেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব, এখানকার আয়োদ-উৎসব—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাস্থীয় সংসার এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

## ৫

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই বৃষ্টি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেটন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে, রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে, এই তাহার পল রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে, কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা-নামক পদার্থটাকে খুব করিয়া দৌড় করানো যায়; সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে। কিন্তু, বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মতো দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল, সাক্ষাসে ভারি মজা। কিন্তু, ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অরুচিকর জিনিস আর-কিছুই হইতে পারে না। এই সাক্ষাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিম্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাতে ঘুম হইতে জাগিয়া অশ্বকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শইয়া আছে; মূহূর্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাতে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে। এখানে পোষের রাতে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত-শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে—দেঁরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে, দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাতে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্ধরাতে সে মনে করে, 'কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব।' কিন্তু, ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, আবার সে শব্দ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, 'আমি পনের টাকা ভর্তি করিয়া বাইসিক্লে চাড়াইয়া বাড়ি ফিরিব, তবে আমি পুরুষমানুষ, তবে আমার নাম রসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিক্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড় ঘটি ও থালাবাটি, নিজের যে-কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী যথার্থ এই গশুপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মধ্যে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর, মানুষ বৃষ্টি তাঁর কোন সত্যিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এত বড়ো মাঠ ধু ধু করিতেছে, কোথাও রসিকের জন্য একমুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির কথা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অশ্বকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরদ্বেগে নিরদ্দেশের অভিমুখে

ছুটিয়া চলিয়াছে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দুর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছূ নতুন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, শ্বতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয়, ভদ্র-লোকের ছেলে—কিন্তু মূটে-মজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুইজনের আলাপ হইতে দৌর হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই—সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভাবি একটা লজ্জা বোধ হইল। শূধু তাই নয়, তাহার মনে হইল 'যেন মূক্তি পাইলাম'। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলক্ষ করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মূহুর্তে তাহার সম্বন্ধে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না—আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।'

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতের ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান।" 'আমি তাঁত', আগে হইলে রসিক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ তো লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "তুমি তাঁত! আমি তো তাঁতি খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এত দিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছূ জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিকলচক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর, বছর বরমাসের তো কথাই নাই!—ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির ব্যবস্থা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গন্ডগোল বাধে; তাহার নানা দিগ্দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁতি আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া

উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধ-পাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণধারে একটা ভাল গাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিাগর পালোয়ানের মতো প্যাঁচ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলার একটা অনেক দিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছ-ধরা জাল বাঁধবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চূপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা-প্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছারাময় পথে স্তম্ভ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্দুর দল, সেই চম্পল গোপাল, সেই আঁচলের-খুঁটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-স্নিগ্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী—এই-সমস্ত স্মৃতি, ছবিতে গন্ধে শব্দে, স্নেহে প্রীতিতে বেদনায়, তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রাসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলে কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। খিয়েটারের দীপ-শিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মতো মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এইজন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মূহূর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাতে রাসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোমার বর আসিয়াছে' বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিবস্ত্র হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রাসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুঁটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলই বাঁশের কণ্ঠতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকাই, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না; জাগিয়া উঠিয়া রাসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধু তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধুকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই, এইটেই তাহার কাপড়বস্তার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনো-মতেই হইতে পারে না।

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না। কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জ্ঞানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইন্ধুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থাকিল, তাঁতের ইন্ধুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাবুদের মস্ত তেতলা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিশন এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জ্ঞানকীবাবু অস্বাভাবিকভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এত দিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে; অতএব জ্ঞানকীবাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া মত্ত করিয়া ধাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুন্দর আকাশের গ্রহনকৃত ছাড়া আর-কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু, তাহার শূভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যিক।

একদিন জ্ঞানকীবাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলকাতা পড়িতেন তখন তাহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্ম সমাজের লোক। এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জ্ঞানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নতুন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যাবসায়িও প্রায় সম্পূর্ণ জ্ঞানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতলা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুবোরানীর মতো তাঁহার বন্ধের পার্শ্ব টিক্‌টিক্‌

করিতে লাগিল।

এইরূপে তাহার তহবিল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অল্পবয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেরোটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন, এই তার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই-একটি পাঠকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিল। শিক্ষিত সংপাঠ না হইলেও তাহার চলে—কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় তিনি তাঁতের ইন্স্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক-বংশের ছেলে—তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাহাদের চেয়ে বড়ো।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলোটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছেলোটির পড়াশুনা কিরকম।”

জানকীবাবু বলিলেন, “সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত।”

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, “টাকাকড়ি?”

জানকীবাবু বলিলেন, “যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।”

গৃহিণী কহিলেন, “আত্মীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।”

জানকীবাবু কহিলেন, “পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে: তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি, আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মতো করা যাইবে।”

রসিক যখন দিনে রাতে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সঙ্ঘর টাকা জমাইবার কী উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মন্থেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মন্থর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?”

রসিক কহিল, “না, তাহার কোনো দরকার নাই।” সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে; অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো চুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিকল্ দাবি করিল।

তখন মাঘের শেষ। সর্ষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ও পারে নদীর চরে বাধানে রাখালেরা গোরু-মহিষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া, লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধূতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতির কোট; পারে রঙিন ফুল-মোজা ও চক্চকে কালো চামড়ার শোখিন বিলাতি জুতা। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্‌ চলাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা, অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেনের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মূহুর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল—ছেলেরা সেই দিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, “সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।” গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বেই বাইসিক্‌ল্‌ রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সম্মা হইয়া আসিয়াছে; ঘর অন্ধকার, বাহিরে তামা লাগানো। জনহীন পরিভ্রম্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে, ‘কেহ নাই, কেহ নাই।’ এক নিমেষেই রসিকের বৃকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপতে লাগিল, বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সম্মার্তির যে কাঁসরশটা বাজিতেছিল তাহা যেন কোন একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সামনে বাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রন্ধ কপাট, এই জিগর গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুর গাছ—সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাণ্ড, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশুদুখে গোপালের মূখের দিকে চাহিল; গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নিচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল, “বুকেছি, বুকেছি,—দাদা নাই!” অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, “ভাই রসিকদাদা, চলো, আমাদের বাড়ি চলো।” রসিক তাহার দুই হাত ছাড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সামনে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। “দাদা! দাদা! দাদা!”

যে দাদা তাহার পারের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাজা পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া-কাঁহরা রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মনুহূর্তকালের জন্য দৌঁধিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী-একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুঁটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুদ্ধিতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্‌। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুদ্ধিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুক-ফাটা কাম্বা বন্ধ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্‌ কিনিবার টাকা সম্বন্ধ করিয়াছিল। তাহার এক মনুহূর্ত আর-কোনো চিন্তা ছিল না। ক্রান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুঁটিয়া গম্য স্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, “আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম। আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।”

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল। বিধাতা তাহার সেই কণ্ঠের শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার ম্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে-তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল, সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে। কিন্তু হয়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।



## হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুসগদুলিও কেহই মন্দ নহে। কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুসের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অশ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মূছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুসের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাহার পান্ডিত্য আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের ষোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অশ্কেলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জন্মিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল—যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সেখানে মন্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পশ্কের সঙ্গে পশ্কেজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুস যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককালে বড়োমানুষি চাল। যে সমাজ তাহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনা চেষ্টার আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শব্দ এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষয় মানুসকে চায় যে লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না; কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মানবৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরাটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাঠের

একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাহার রামচরণ, তেমনি তাহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়-রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সূচিক্রম, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার আশ্বকঙ্কালের উপর কোনোপ্রকার আবু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিখিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নতুন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বাটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ডের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বাধিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই—এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিঃপ্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বন্দুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স ষতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিম্বিবাগ্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। সবসম্মুখ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ-কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরাঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপ্ত—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুঁশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মন্থে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু না-কিছু খর্ব করা সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুঁশি হইল তাহা ভালো করিয়া বন্ধুবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে—বেশ! ভালো! কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভৎসনা করিয়া বলে, “তোমার ঐ স্বভাব। কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।”

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে—সন্তোষগুণটি মানুষ্যের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আব-কিছু নাও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্থনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে—ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তুণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতা-বশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিলে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জন্মিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো—তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের টেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-হয়

করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ার, সেগুনি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুণ্ডলির অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাশিষ্ট-সেরেস্ত্য তাহার জন্য জ্বাবাদিহি নাই। কিরণের কানের সোনার কাপণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাকান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জ্যোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও ভাঙিত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লেোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনো-মতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্ষাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই—বহর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধাব লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বঁকে মাছ এত কম আসিল যে জেলেরদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার

অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাস্ত্রীড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্ৰোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আশ্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কতী আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।”

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরও বাড়িয়া উঠে। শ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কতী রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন—বিষয়কর্মের বিরুদ্ধিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী!

সুখদা যখন কিরণের কাছে কাহ্নাকর্টি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বৃকে শেলের মতো বিধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকাব গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির; বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন ঔদাসীনাঁকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মধুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্‌কানের-রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লট্‌কানে-রঙিন চাদর ও বেলফুলের গোড়ামালা প্রস্তুত। রাত্তির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালটি আজ তাহার কাছে কিছতেই রুঁচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এত বড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে!

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকিয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কাঁহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মধ্যে বিস্তর টাকা ব্যয় পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মধু

আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, “ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপন্ন হইব কেন।” বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, “সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।” সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, “উকিলবাবু, বসিয়া আছেন, তাহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।”

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত, মনোহরলাল তাহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সেই কেবল দূটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্ধামী জানেন, কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সম্ভ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে; কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাখীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, “তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!” বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চূপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অন্তর্কুল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরান্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশ দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাহার নখর শরীরটি উন্মাতন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পক্ষীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসম্ভ্যায় সূগন্ধ বায়ু-সহযোগে সেই বস্তান্তটি তাহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শূন্য করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে

চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংস্বেভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কতী সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সদুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমান কাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনূচরগণের চুরির উচ্ছৃঙ্খলিত তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র ষড়্ধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।” সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, “দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে! ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।”

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জন্মিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দীর্ঘ কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অধিক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধুকৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে স্ফোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গোরবেই তাহার স্বামীর গোরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরও বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারে যে গোসাই-গঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারান্দায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অম্বের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, “যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।” কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতার বিস্মিত হইয়া কহিল, “শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।”

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির

হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো-একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বৃষ্টিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলের স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। “কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।” স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, “এখন গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।”

কী সর্বনাশ। থানায় খবর' নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে' তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিশ হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুেষের উপলক্ষ করিয়া পুলিশের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নতুন-পাস-করা। সর্বিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ও দিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতঙ্গর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আর্পিঙ্গেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘাড় এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা বার্ষ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটার টিকিবে কী করিয়া। বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, “তুই থাক, তোর কোনো ভয় নাই।” কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি, কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।” বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কান্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া!



অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়৷ কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনো-দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই!

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লটুকানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লঙ্কার ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাঠী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপদ্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুর্দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগরাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্রমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বৃদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পাড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, “এ পাগলামি ছাড়া আর-কিছুই নহে।” কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, “জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।”

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুককে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্বকট চাঁপাফুলটির মতো পেজব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পদ্রুকের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ

যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়কৃত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইবস্তীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অস্পন্দনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশ কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তুণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া মার্জিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্দেশ্যে করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যে রূপ কাণ্ড ঘটতেছে তাহাতে কোনদিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চূপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুঁলিস তাহা জানে; এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সম্মত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মারিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিভানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গারে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুৎখুৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস

হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চোর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেমসীকে মন্দিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোস্টীর বড়োবউকে কিছতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মৃৎখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তার সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্কের মাপের বাঁধা বরান্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজ্ঞাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য-আহারের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোস্টীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বস্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদবংশের প্রতি যে কর্তব্যের চূড়ি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন স্ত্রীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক্ পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মধুহৃত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। বাহা কিছু ছোটো, অক্ষয়, সুকুমার,

তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অত্যন্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, ষত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা-কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্মের একজন ভাড়াটে; ষতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধা তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলোটের স্ত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মনুণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জন্ম। সেই স্কন্ধবৃক্ষ স্কন্ধশরীর রসরসহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে; কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল, মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবেয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধোত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টো। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির

বিশ্বেষদৃষ্টি ছেলোটর অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তান-সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলোটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলোট বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা-ভাবিজ্ঞ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চাড়িবার চাবুক লইয়া আশ্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবুক'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাই সাই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুভব। এইজন্য সকল-প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পবিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জনা বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাল্য হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিকুটর; তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে, হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বৃদ্ধিলেন, এ পরিবারে কেহ তাহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরান্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা। এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন।"

হার হার, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কাঁচ ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে! তাহার শব্দর বে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে

তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত ষদ্ মধু, যত কৈবর্ত এবং আগড়ার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছ্ অন্ন বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকালে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসম্পন্ন যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে এবং যেখানে যত সিদ্ধক-বাল আছে তাহাতে তালাচাঁবি লাগাই-তেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মূছবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বন্ধাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, “তুমি এখন আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও।”

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, “বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বন্ধিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।”

কিরণ মনে মনে কহিল, ‘দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো! হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।’

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দংশ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মূহুর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চাঁলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখন কোনো-একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, ‘নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।’

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় চুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হৃৎ ছিল না যে, কর্তার বাল খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বালয় চাঁবি লাগানো হয় নাই। সেই বালয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছ্ই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাম্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভাঙ্গা অত্যন্ত বিনয়, কিন্তু তাহার মুখে মধ্যো এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, “কর্তার শ্রাম্ধ সম্বন্ধে—”

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, “আমি তাহার কী জানি।”

নীলকণ্ঠ কহিল, “সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাম্ধাধিকারী।”

‘মস্ত অধিকার! শ্রাম্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।’ বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, “যাও যাও! আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না।”

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রম্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিত্যক্ত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, ‘এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছাবখার হইয়া যাক।’

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপবের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, “জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।”

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। ‘আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছাবখার হইবে।’

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মদহর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, ‘নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।’ তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বীর সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বালক বন্ধ করিয়া সসম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাকের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে

সেই বাসুটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাসু উপড় করিয়া কাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুম্বপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, “তুমি চাঁপাতলার গিয়াছিলে?”

নীলকণ্ঠ বলিল, “আজ্ঞা হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।”

বনোয়ারি। আমার রুম্বালে-বাঁধা কাগজগুলো তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, “আজ্ঞা, না।”

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলার আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মার্জ্জিত করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, ‘যে করিয়া হউক এ কাগজ-গুলো পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।’ কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল রুম্ব বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, ‘উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।’

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মরিবার অধ্যবসার।

এইরূপ মনে মনে ছটফট করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বৃকিতে পারিল না কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে, তাহার শিরের কাছ হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, “জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।”

বনোয়ারি স্তম্ভ হইয়া গেল। হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, “আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।”

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, “আমার বাহা আছে সব তোকে দিব।”

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুম্বালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুম্বালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুম্বালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে জুতোয়া যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলার দূর হইতে এই রুম্বালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।



হরিদাসকে বনোয়ারি বন্ধুর কাছে টানিয়া লইয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নতুন-কেনা কুকুরকে শাস্তি করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মূখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, “হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল।”

হরিদাস কহিল, “আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।”

বনোয়ারি কহিল, “আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।”

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, “নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও। উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।”

বনোয়ারি কিরণের মূখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, “আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।”

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, “এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পর্কিত দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।”

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, “তুমি কোথা হইতে পাইলে!”

বনোয়ারি কহিল, “আমি চুরি করিয়াছিলাম।”

তাহার পর হরিদাসকে বন্ধু টানিয়া কহিল, “এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।”

বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্দ্বী এখন তো তন্দ্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরেশ্বরের কবিতাগুলোও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাতেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাম্ভ পর্বন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুখ লোক তাই লইয়া তাহাকে ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল।

## হৈমন্তী

কন্যার বাপ সব্দর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সব্দর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পনের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ. এ. পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজ্ঞাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ, ঘন ঘন বিচালিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে মান্দুব একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মান্দুকের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয় স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো স্বেচছা থাকে না। যত স্বেচছা ও দৃষ্টিচলিত সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুনঃ কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনার এক রাত্রে পার্শ্বিক উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্মে নাই। বরষ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দাঁকিনে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কম্পনার কিশলয়গর্ভীর মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঙ্ক রেডোল্‌শনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মূখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্সট-বুক-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটি গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম! এমন সূত্রে আমার লেখা শব্দ হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কম বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়া বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলার শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ, সংস্কৃত মূখবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই—আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন প্ৰস্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সম্যাসীটা অটুহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যেষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যেষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রকৃত্যঙ্কিতদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তন্ত্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট।

কোনো কালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখার তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কাম্বোহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলার আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গোরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী, দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে, খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ, ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অক্ষটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো-একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মৃৎস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, “এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো—একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।”

কোনো-একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া, খোঁপার জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবরজন্ত জ্যাকেট পরাইয়া, বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি

একখানি সাদাসিধা মৃৎ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন-তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরংগ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গাঢ়লতার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পাঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শব্দরের ছুটি আর মেলে না। ও দিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শব্দরের এবং তাহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সৌদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সৌদিনকার প্রত্যেক মৃৎ-তটি আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

বিবাহসভার চারি দিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।’

কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শব্দরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শব্দ হইয়া ছিল। আর, তাহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে-একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সম্মান বাহারা জানিত তাহারা তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শব্দর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক’টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম, তাহার মূল্য যেন বৃদ্ধিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।”

তাহার বেহাই বেহান সকলেই তাহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।”

তাহার পরে শব্দরমশায়র মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, “বুড়ি, চলিলাম। তোমার একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।”

মেয়ে বলিল, “তাই বই-কি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার কৃতিপূরণ করিতে হইবে।”

অবশেষে নিত্য তাহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংশয় ছিল না—গর্দটকরেক অপখ্যা ছিল, তাহার প্রতি তাহার বিশেষ আসক্তি—বাপকে সে-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল, “বাবা, তুমি আমার কথা রেখো—রাখবে?”

বাবা হাসিয়া কহিলেন, “মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য, অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।”

তাহার পর বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃ-পরিষ্কার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোটোর দেশে থাকিয়া খোটা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, “সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।”

তিনি বলিলেন, “যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।”

সব-শেষে আমাকে নিভৃত লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, “আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।”

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো-একটা দিক হইতে অর্থ-সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘৃষ দিতেছেন এমনভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গর্দভিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রশ্ন লইবার জন্য সব্দর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তম্ভ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বৃষ্টিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মস্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকমন্ড্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে আভ্যন্তরিক উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বৃষ্টিয়াছিলাম, দানের মন্ড্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে

সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো গ্লুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া। তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শূদ্র সে, কী নির্বিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্প দিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্ক যে তাহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানা প্রকার অশ্ৰুপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অশ্ৰুটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল হৈমর আদরও তেমন বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপন্থিতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে দিতেন না তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিস্তী একটা উত্তর শুনিত হইত।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মৃৎ ঘোর অশ্ৰুকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমরা শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধর করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ বৃত্তিতে ঠিক করিলেন, তাহার বেহাই তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবণতা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধানমন্ত্রী-গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইন্স্কুলের হেড্‌মাস্টার—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ঠাণ্ডা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময় রাস-উপলক্ষে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অক্ষুণ্ণ হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। দু' সম্পর্কের কোনো-এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, “পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল!”

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, “আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপদ বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।”

আমার মা খুব জ্বোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “ওমা, সে কী কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেবে। খোঁটার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই এমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।”

দিদিমারা বলিলেন, “বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।”

মা বলিলেন, “আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।”

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, “কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।”

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।”

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না; বলিল, “সতেরো।”

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি জানো না।”

হৈম কহিল, “আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।”

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটোঁপ করিলেন।

বধুর নির্বৃষ্ণিতার রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, “তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো।”

হৈম চমকিয়া কহিল, “বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।”

মা কহিলেন, “অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে ‘কখনো না!’” এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল; স্বর আরও দৃঢ় করিয়া বলিল, “বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।”

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, “তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?”

হৈম বলিল, “আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।”

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাহার বধুর মৃচ্ছতা এবং ততোধিক একগুয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, “আইবড় মেয়ের বয়স সত্তেরো, এটা কি খুব একটা গোরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলবে না, বলিয়া রাখিতেছি।”

হায় রে, তাহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।”

বাবা বলিলেন, “মিথ্যা বলবার দরকার নাই, তুমি বলিও, ‘আমি জানি না—আমার শাশুড়ি জানেন’।”

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদাস দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে স্তান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মূখের দিকে চাহিল। ভাবিল, ‘আমি ইহাদিগকে চিনি না।’

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আন্তে আন্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, “হৈম, আমার উপর রাগ করিও না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।”

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিখাতা বাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নৃতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ-পর্বন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধুকে ডাক পড়ে নাই। নৃতন বধুর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, “মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।”

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মান্দব। কিন্তু, কেবলমাত্র হৈমকে লঙ্ঘিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা, এ কী কান্ড! এ কোন্ নাস্তিকের ঘরেব মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।”

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উদ্দেশে বাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটু কথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। এক দিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?”

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত ‘তোমার ঋষিবাবা’—এই মেয়েটির সকলের চেয়ে



দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বদ্বিখিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মণ নন, খৃস্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মোয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনো দিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি যাহা বদ্বিখি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।”

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতো পাইতাম। এক দিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মূখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে ষত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পাড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে ষত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য। বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।” এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, “তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।”

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন।”

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, “এইবার অপূর মাথা খাওয়া হইল। বি.এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।”

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বরস সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রম্বে রম্বে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশ বাজাইতেছে।

বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার

প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্য-পথগুলো ফাড়া ফেলিয়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি, তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সে দিকে মল্লিকদের বাগানে কাশনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বৃকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বৃকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বৃকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অভ্যন্তর নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করিব।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমরাগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো-বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মর্ন্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন স্বচ্ছ শূন্য ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মূহূর্তে মূহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মর্ন্তি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেইজন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি সে বিছানায় নাই, হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে যাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না, কখনো মূখ্যমুখি তাহার কাছে দরবার

করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, “বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।”

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এইরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।”

হৈম বলিল, “অসুখ তো নাই।”

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, “অ্যাঁ, এ কী। হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?”

হৈম কহিল, “না।”

এই ঘটনার দিন-দশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মূর্খটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না ‘কেমন আছিস’। আমার শ্বশুর তাহার মেয়ের মুখে এমন-একটা কিছুর দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না!

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বুড়ি, আমরা সঙ্গে যাবি?”

হৈম কাণ্ডালের মতো বলিয়া উঠিল, “যাব।”

বাপ বলিলেন, “আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।”

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্ভিষ্ট হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাহার আর সে দিন নাই। হঠাৎ তাহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুঁশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, “বেহাই, আমি তো কিছুর বলিতে পারি না, একবার তা হলে বাড়ির মধ্যে—”

বাড়ির-মধ্যে উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছুর হইবে না। কিছুর হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যান্য অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, “রোগ-পরিবর্তন আবশ্যিক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।”

বাবা হাসিয়া কহিলেন, “হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে।

এটা কি আবার একটা কথা।”

আমার শ্বশুর কাহিলেন, “জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উঁহার কথাটা কি—”

বাবা কাহিলেন, “অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পান্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।”

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তম্ভ হইয়া গেলেন। হৈম বদিকল, তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঁট হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, “হৈমকে আমি লইয়া যাইব।”

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, “বটে রে—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্দুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুশতাব্দির যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? বৌদিন অস্বাভাবিক লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে বাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বৃকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন শ্বিতীর সীতা-বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যার আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুইজনেরই মূখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভৎসনা করিয়া বলিল, “বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।”

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, “ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।”

ইহার পরে হৈমর মূখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতোছি, মা পাঠী সম্বান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ—থাক, আর কাজ কী।

## বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগর্দাল হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখনটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জ্বরগাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জ্বারে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মান্দুস হয় সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে—আপনার চারি দিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মান্দুসের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভূতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো-একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে—আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কল্দুসে আবিষ্কার করি না; আবার ষোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছবার দিকে আমার কোনো লক্ষই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চল আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মান্দুস আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কামা শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজ্জা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়টার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতেছিলাম। তাহার চিরুণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতে-ছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রোঁটা স্ত্রীলোক আমাকে ভ্রমিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল। তাহার আঁচলে কতকগর্দাল ঠোঙার মধ্যে করবী গন্ধরাজ এবং আরও দুই-চার রকমের কদল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড় হাত করিয়া সে বলিল, “আমার ঠাকুরকে দিলাম।”

বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই-যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবনীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমার ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর বখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল। সকালের রৌদ্রটি পূর্বের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা কে জানি না; অনামনস্ক হইয়া বলিলাম, “আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আর।”

বোষ্টমী পারের ধূলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিরন্ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন কোন দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, “এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলার আনিয়া হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলার দেখিতাম, সে বে বেশ ছিল।”

বলিলাম, গাছতলার এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সম্ব্যাকাসের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পার নাই।

একটুক্ষণ থাকিয়া সে বলিল, “গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।”

আমি মৃদুকিলে পড়িলাম। বলিলাম, “উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চূপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই-যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।”

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া ‘গৌর গৌর’ বলিয়া উঠিল। কহিল, “ভগবানের তো শব্দ রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।”

আমি বলিলাম, “চূপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতাই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।”

বোষ্টমী কহিল, “সেটা আমি বুঝিরাছি, তাই তো তোমার কাছে আসিরা বসিলাম।”

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিরা বসিরাছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলোর মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধু ধু করিতেছে। পূর্বাঁদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শূভ্র কুরাশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুরাশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্ব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুরাশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিরা বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেন্সাদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিরা বসিরাছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে আসিরা আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, “কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।”

আমি বলিলাম, “সে কী কথা।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিরা ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর বখন পাঠ লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।”

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাসত খাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভার আলোচনা না করাই সংগত। আমার মূখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিরা বোষ্টমী বলিল, “যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।”

আমি বলিলাম, “লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।”

সে বলিল, “আমি তো সকলকেই বলিরা বেড়াইয়াছি। শূনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।”

বোষ্টমী বে সংসারে ছিল, উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শূনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি

বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহুদলোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাহার ইচ্ছা, আমারে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার চলে কী করিয়া।”

উত্তরে শূনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়াই আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।”

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়াইতাম না। ভিকাজীবিতার সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মূখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চূপ করিয়া বসিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনাই বলিয়া উঠিল, “না না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া খাওয়া অস্বই অমৃত।”

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিকার অস্বই তাহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল, তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখনকার যে পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহার কিছুই দেয় না, অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দক্ষিণের কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, “এই-সকল দক্ষিণদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।”

এই রকমের সব উঁচু দরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মূখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদুটি রাখিয়া সে বলিল, “তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাহারই পূজা করা হয়। এই তো?”

আমি কহিলাম, “হাঁ।”

সে বলিল, “উহার যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গ আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।”

বলিয়া সে আমাকে প্রশ্ন করিল। তাহার কথাটা এই যে, শব্দ মত লইয়া কী হইবে, সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী, এটা একটা কথা—কিন্তু যেখানে আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যিক যে, আমাকে উপলক্ষ করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও



দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিশ্বান লোকদের স্বাস্থ্য হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বাহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দৃষ্টি চন্দ্র ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, “তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখন আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!”

আমি বলিলাম, “যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।”

আমি যে কত আকরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চাড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, “গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অর্নি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কী ঠান্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলা।”

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নতুন ফুল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।”

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, “তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুঁচিয়া যাইবে।”

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, “আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।”

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেণের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি বোষ্টমী আমার পারের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, “আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, ‘পাগলি,

কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মনুষ্যের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেশী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গোর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মধ্যে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত, তাহার বুদ্ধিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুদ্ধিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠিকতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাহার লোভ অল্প। যেটুকু তাহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি বা তাহা তিনি বুদ্ধিতেও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু, আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুদ্ধিতে বেশি, আমি তাহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাহার গুরুঠাকুরকে। শব্দ ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী কণকাল ধামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ৰদুটিকে বহু  
দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গদ্‌গদ্‌ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি  
কোন্‌ বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই  
তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাহার উপর  
বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে  
যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি  
তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ  
জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই  
আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সেই-সাতাণ্ডিতদের সঙ্গে  
মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া  
এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে মা তখনো পিছাইয়া পাড়িয়া আছে,  
এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার  
জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে  
তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতোছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাঁহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া  
তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোকা, আজ পর্যন্ত তাঁহার  
দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার  
অল্প বয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ  
গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি  
তাঁহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে  
জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, “আমি রাত জাগিতে  
পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।” তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে  
আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন  
বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার  
কাছে থাকিত তখনও ডরে ডরে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই  
আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে বাইতাম তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে  
রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে

লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মর্দি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জর্দিয়া দিল। নিম্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, “বাছা, ছেলেকে দেখিও, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।”

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর-কেহ ছিল না। সপিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীন কালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পান হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, “মা!” ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।” নিবেদন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরও নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পারে যেন ঝিল ধরিয়া আসিল, পান হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকায় হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পান হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে ‘মা’ বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই-সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল।

আমার স্বামীর বৃকে যে কতটা বাঁজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্ভামীই জানেন। আমাকে যদি গাল দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ধনা করিবার জন্য তাহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাহারই মূখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গদরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মোচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ধনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গদরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাখিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব কঁদাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সে দিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গদরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাহার ভক্তি আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গদরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গদরুর কাছে বদ্বিশ্বহীনতার জন্য তিনি বরাদ্দ অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাহার স্ত্রী এবার বদ্বিশ্বের জোরে গদরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্স্বামীর কাছে ধরা পড়িল। তার পর এক দিনে একটি মূহুর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাঙ্গানের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজ্জা কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গদরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজ্জা কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মূখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝোপে তাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলখাল হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছ্র জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজ্জা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্বকিগর্দল আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গদরু আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মৃদু ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সপ্নে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখন আমার স্বামীর মন কেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আধারে এক-একদিন তাহার মৃদু একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বৃষ্টিতে পারি, এই সাদা মান্দুর্বাটী যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বৃষ্টিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুদ্বন্দ্ব কথ্য কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিনপ্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নীচে শব্দইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাহার পায়ের তলার শব্দইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বৃকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জনলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আধারের এক ধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াকে; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মৃদুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, “আর আমি সংসার করিব না।”

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, “আমাব মাথার দিবা, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।”

স্বামী কহিলেন, “তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।”

আমি বলিলাম, “গুরুঠাকুর।”

স্বামী হতবৃষ্টি হইয়া গেলেন, “গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।”

আমি বলিলাম, “আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাহার সপ্নে দেখা হইয়াছিল। তখন বলিলেন।”

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন আদেশ কেন করিলেন।”

আমি বলিলাম, “জানি না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিযো, পারেন তো তিনিই বৃঝাইয়া দিবেন।”

স্বামী বলিলেন, “সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বৃঝাইয়া বলিব।”

আমি বলিলাম, “হয়তো গুরু বৃষ্টিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বৃষ্টিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুঁচিল।”

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, “চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।”

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, “তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।”  
তিনি আমার মূখের দিকে চাহিলেন, আমি মূখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি এক রকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১০২১

## স্মীর পত্র

শ্রীচরণকমলেশু,

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছি, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, “মৃগাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত।” চূর্ণবিদ্যাতে ষম পাকা, দামি জিনিসের ‘পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বৃষ্টিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলায় শেরাল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না—সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন। বাংলাদেশে পিলে ষকুৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বৃক দুর্দুর্ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মায়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুণের তো মায়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেরেমানুষের সংকোচ কিছতে খোঁচে না।



সমস্ত বাড়ির, এমন-কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বন্ধুদের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগোঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশ বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খঁতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মূখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকলে পণ্ডিত গঙ্গামৃতিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্ভিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বলাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তাব কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলা। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষরের সান্দ্রনা, অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ ঘাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মৃত্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠানের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো; ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবলা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগায়ের মেয়ে—তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে বাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলেই, কিন্তু মা হবার মর্ন্তটুকু পেলেই না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিব্রত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সে দিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সম্ভা নেই। সে দিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠানের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জ্বায়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তা হলে যত দূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্ন যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুন্দ্র আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সম্ভ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্বন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বৃক্কের পাজির বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব

বলো—দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া—সে কত বড়ো অপমান। দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বাল্যই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সর্বিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যত দূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মর্শকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারণে খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মনে নেওয়া আমার কর্ম নয়—তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দাঁদি বললেন, “মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।” আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটলুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নাগিশ করে কেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোকের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজের স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোন্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে, অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজোটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সহিতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়ততো

ভাইরা তাকে এমন একটি কোণে ছেড়ে দিতে চায় নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়; কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্য অস্তিত্বকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়ততো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম তার বুদ্ধির মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল। হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে; তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক অনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু, সেই দুই-একদিনের সদর সহবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লক্ষ্মীতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসিপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজ্ঞর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না; মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোকা গেল, পৃথিবীর সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোর ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, “দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পার নি।” যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোকা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও আমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের

গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গাতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগা-গোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বদলদম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মূল স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে ঋৎখৎ-খিটখিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনো রকমের হাত ছিল এ কথা আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামাঘ লোকের বাড়ি-তল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সম্মেদহ করে বসলে যে, বিন্দু পুঁলিসের পোষা মেয়ে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত—তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেয়েও একেবারে সংকোচে মেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দঃমর জোড়া মোটা কোরা কলের ধূতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠানের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দঃশাটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবৃষ্টিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এ দিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমন বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিরত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বৃষ্টি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বৃষ্টি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজ্ঞাপতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, “বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।”

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু

আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, “দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।”

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, “বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনোছি তোর বর ভালো।”

বিন্দু বললে, “বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।”

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাশি বিন্দুর কান্না আর ধামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, “দিদি, বিয়ের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।”

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম; কিন্তু অন্তর্ভামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, “দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।”

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শব্দ হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, “জানিস তো বিন্দু, পতিতই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মর্ন্ত সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খন্ডাতে পারবে না।”

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলাম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছতেই সহাবে না। কাজেই চূপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছ, কিছ, গল্পনা দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, “দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?”

আমি বললুম, “না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।”

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজের তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দির স্বামী পাগল।

“সত্যি বলছি, বিন্দি?”

“এতো বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। স্বশরীরের এই বিবাহে মত ছিল না—কিন্তু, তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।”

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ‘ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।’

বিন্দির স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে মিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দি দুপুরবেলায় পিতলের খালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী খালাসুন্দর ভাত টেনে উঠানে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দি স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার খালা চুরি করে রানীকে তার নিজের খালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দি তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শূতে বললে, বিন্দির প্রাণ শূকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দিকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠান্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দির শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, “এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দি, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।”

তোমরা বললে, “বিন্দি মিথ্যা কথা বলছে।”

আমি বললুম, “ও কখনো মিথ্যা বলে নি।”

তোমরা বললে, “কেমন করে জানলে।”

আমি বললুম, “আমি নিশ্চয় জানি।”

তোমরা ভয় দেখালে, “বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পদলিস-কেস করলে মর্শকিলে পড়তে হবে।”

আমি বললুম, “ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।”

তোমরা বললে, “তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।”

আমি বললুম, “আমি নিজের গয়না বেচে বা করতে পারি করব।”

তোমরা বললে, “উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।”

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ও দিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে—কিন্তু, কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পদলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, “তা, দিক্ থানায় খবর।”

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলাছিল, তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুদ্ধে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়। তাই সব সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, “ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে!”

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পেঁপে দিয়েছে, সতীসাধনী সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয় নি; সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগোঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁকি দিয়ে আমার মধ্যে এমন বৃদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু, আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতার কলেজে পড়াছিল। তোমরা জানই তো যত রকমের ভলিউন্টারি করা, স্কোলের পাড়ার ইন্দুর মারা, দামোদরের বন্যার



ছোট, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দ্বার সে এফ. এ. পরীক্ষার ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, “বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।”

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, “আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।”

আমি বললুম, “সেই যা সব-গোড়ার বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম—কিন্তু, সে তো তোমাদেরই কীর্তি।”

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, “বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?”

আমি বললুম, “বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।”

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর পরে পদলিসের দৃষ্টি আছে—কোন দিন ও কোন রাজনৈতিক মামলায় পড়বে তখন তোমাদের সন্দেহ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শূনে আমার বৃকের মধ্যে শেল বিধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম, অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে “বিন্দু তার খুড়ততো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পেঁাছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড বা ঘটেছে তার কাজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।”

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতার থাকি তবে আবার কোনদিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, “স্বমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।”

শরতের মূখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, “ভয় নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব—ফাঁকি দিয়ে জগমাথ দেখা হয়ে যাবে।”

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মূখ দেখেই আমার বৃক দতে গেল। আমি বললুম, “কী শরৎ? সর্বিধা হল না বৃকি?”

সে বললে, “না।”

আমি বললুম, “রাজি করতে পারলি নে?”

সে বললে, “আর দরকারও নেই। কাল রাস্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়োছিলুম তার কাছে খবর পেলেম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।”

থাক্, শান্তি হল।

দেশসুস্থ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের ভাষাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিতার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি—মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের চিঠিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কাম্বার মধ্যে একটা সান্দ্রনা ছিল। যাই হোক-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধনী বড়ো জ্বালের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে—আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু, আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলার চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়ততো জ্বালের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের ষমুদ্রাপারে যৌদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বৃকের মধ্যে যেন বাণ বিধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন। এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বৃদ্ধবৃদ্ধটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক-না কেন, এক মৃহুর্ভের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চোকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বৃদি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্বন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু, মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দৃঃখে কোন্ অপমানে মানুসকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্যে বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যার চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাটা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তাব গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়িচ্ছিন্ন

মৃগাল

## ভাইফোটা

শ্রাবণ মাসটা আজ বেন এক রাতে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাতে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠান্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু, আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না—কিন্তু, আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্থিত ছিল না। এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পদা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ত্রিমির মতো কিল্‌বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উঁকিলে উঁকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিরোর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অশুভ নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত-ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুনিতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শূচিবায়ন প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছ, জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো-একটা মোড়কের একখানা দাঁড় লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দাঁড় হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মান্দব। মান্দব

বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বালালীলায় মস্ত যে-একটা ফাঁক পাড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মর্দা পৰ্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দস্তবাড়ির ছেলেরা সত্যব্দগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কেন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের ষাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসুয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুর্লভেছে তার সেই বেণীটি সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত—কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-করুণ হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মূঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু, আমরা সম্পূর্ণ বৃষ্টিবার আগেও অনেকটা বৃষ্টি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পাড়িলে সেগুলো চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজার কড়া পাহারা ছিল না। সে ষা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পাড়িবার ঘরের জ্ঞানভান্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কম্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, “অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়।” শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপর আবার একটা ভয়ের ছায়া পাড়িত। অনু যখন তার ছোটো বোনের কান্না ধামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত—তাকে ভুলাইয়া দুখ ষাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, “উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছে পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।”

এমনি করিয়া আমি তাকে বস্ত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে

নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অসুখ ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শূন্যলাম বি. এল. পাস-করা একটি টাটকা মনুসেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব—আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু, কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে এক দিনের মধ্যেই এই হাজার-লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাঞ্ছিত তাহা মনই জানে। কিন্তু, বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও চেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে হো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগাতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল, সংসারে শূন্য সং হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।' খুব কমিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস; সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কর্মতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বৃষ্টিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্ফ্ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত ইলেক্ট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গুণতত্ত্ব, এক্সচেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি বিদ্যার আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু, অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলো কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু টিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা সন্দেহ প্ল্যান এস্টিমেট এবং প্রস্পেক্টস লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ

করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মৃধর তেমন নিম্নদৃক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, “বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।” প্রসন্নের মৃধটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম।

প্রসন্ন কহিল, “ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি শ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।”

প্রসন্নের মৃধে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো তাহা প্রসন্নের সঙ্গে যারা এক ক্রাসে না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে ধুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, “কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা—কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুঝির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছে—কিন্তু তোমাতে যে মণিকাণ্ডনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুঝিতেও তুমি পাকা।”

তখন ব্যবসা-খাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মৃত্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল মোস্তার ডাক্তার শিক্ষক ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকলপ্রকার ব্যবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, “আমার সম্বল নাই যে।”

সে বলিল, “বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।”

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এত দিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, “ঠাট্টা নয় দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।”

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সূদের আশা করিত না; কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠিকবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড় কাগজ কালাী বোতাম সাবান ষতই আনাই বিক্রি হইয়া যায়—একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিস্দার

আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকাও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল—ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লক্ষ কত লাভ হওয়া উচিত—কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালীতে, অতি পরিষ্কার অঙ্কে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নের হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধূলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, “মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু কিছু বদ্বি; কিন্তু আজ হইতে দাদা, তোমার সাক্ষেদ হইলাম।”

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, “যো ধুব্বাণি পরিত্যজ্য—মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।”

আমার রোখ চাড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাটা প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাধিয়া খাড়া করিয়াও, মনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদ-বশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দস্তবংশের সততা, তার উপরে সূদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বোচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যোগদান দিয়া লাল এবং কালো কালীর রেখায় ভাগ করা কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দার। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বদ্বিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নের হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসন্নের মুখে আর কথাই নাই। তার মৎলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।



দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গাচ্ছত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গাচ্ছতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গন্ডুবে টাকার সমুদ্র শূষণ লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না, কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দারওয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছ, কিছ, গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম, বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমন ধনী বলিয়া তাব স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে, কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, 'তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।'

এই টাকা কিছ, খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুন্ডির মেয়াদ আসল এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সিংহ কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণকর আসিয়াছে, তাহার কাছে কৃষ্টি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কৃষ্টি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা। দুর্বলতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেক-কেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বৃকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বৃদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বৃদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্লম ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শূনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু, এইবার বৃহস্পতি অনুকূল—এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্ন হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু, সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, “খোলো দেখি।” খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুরকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে, তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়েছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, “আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।”—এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি অস্তা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরজার স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব! চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তম্ভ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মূখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, “কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।”

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা ছড়াইয়া তার কেমন-একটি কর্ণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চূপ করিয়া আমার মূখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইল।”

আমি বলিলাম, “আজ আর সময় হইল না।”

সে কহিল, “মেয়েদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।”

অনুর সেই মূখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পশ্মটি, দেখিয়া অর্থাৎ সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বৃজিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম বৃষ্টির চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলার একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষয় হইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সের্চিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে

চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবৃষ্টির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বৃষ্টি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চূপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু, অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটুখানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল, আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, “বউদিদি এলেন না?”

আমি বলিলাম, “শরীর ভালো নাই।”

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই বোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ু-কামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি গোপনে চোখ মর্দুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাস্ক আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, “সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।”

আমি বলিলাম, “অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখা-শুন্যার কোনো চিন্তা হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়া।”

অনু কহিল, “এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল।”

আমি চূপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, “একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবাধ ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে—আরও কিছু এ দিকে ও দিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর, যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।”

আমি কহিলাম, “অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।”

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাল্ল খুঁলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বন্ধাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপদ্রব্য ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, “আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।”

অনু কহিল, “আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনদিন বাধবে না।”

আমি কহিলাম, “কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।”

অনু কহিল, “আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বন্ধিবার আমার শক্তি নাই।”

বাল্লের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, “সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিও। আর, এই পত্রার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিও, আমার মাথার দিয়া, তিনি যেন গ্রহণ করেন।”

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মূখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাল্ল হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমনি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা খবর ভালো তো?”

আমি বলিলাম, “এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।”

প্রসন্ন কহিল, “কিন্তু—”

আমি বলিলাম, “সে জানি না—যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসারে লাগিবে না।”

প্রসন্ন বলিল, “তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।”

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যাবা গল্পের বই পড়ে মনে করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উল্টো। টিকার আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অন্যে সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু—কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল

যে, সুবোধের কাছে মূখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু, সুবোধের কী এক রকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না; তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মূর্শকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মূখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কামা। আমি বলিতে লাগিলাম, 'এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ।' আবার মূর্শকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অর্থাৎ নিতরে ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তাব বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব করিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম।

আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল—সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কম্পনা করিত। জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী-একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; শ্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলোকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মূখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার চুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে খতমত খাইয়া যায়; আমার মূখের সাদা কথাটাও সে বদ্বিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনাই বাড়াইয়া চলে, নতুন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পশ্চম বারকার বলাটাকে সর্ষি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার

কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অন্ত তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর, কারও শাস্তি ছিল না।

এ দিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিশ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, “সুবোধকে ডাকিয়া দাও।”

সে বলিল, “সুবোধ শুইয়া আছে।”

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, “শুইয়া আছে! এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!”

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, “প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।”

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাজে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এ দিকে যারা ধন্য দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গাড়মাসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। ষত দিন যাইতেছে ততই তার টিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে; সকালে তাকে বিছানা হইতে জেদ করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়; চলিবার সময় যেন পারে পারে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লম্বিত হইয়া চূপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, “বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন মহাসাগর।” যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, “সে হচ্ছে তুমি, আলস্য-মহাসাগর।” পারৎপক্ষে সুবোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না; কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রুপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ

তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, “টাকা পাই নাই।”

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল ‘টাকা পাই নাই’। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে—কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালো-মানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে শয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, “টাকা বাহির করিয়া দে!”

সেও উশ্বত হইয়া বলিল, “না, দিব না, তুমি কী করিতে পারো করো।”

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি, জাঁজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম; আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিশ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মূহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অনুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে শ্রুত হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম। এ কী করিলাম। ভগবান, আমাকে এ কী বৃশ্চি দিলে। আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বাসকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে; এই অন্ধকার যেন মূহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিভাবে নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলোটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পাকের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পালিস খনন পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন

একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পিড়ল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি বৈখানে বৈখানে প্রসন্ন দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। বে করিয়াই হউক তাহাকে বে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মূখ স্নান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মূখখানি, কী করুণার ভয়ে তার দুইটি চোখ।

আমি বলিলাম, “আর বাবা সুবোধ, আর আমার কোলে আর!”

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্ভূপ করিতেছি। ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া আমার মূখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পপদুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মূখে মাখায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চেতন্য হইল না।

ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “এ বে একেবারে ক্রান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।”

আমি বলিলাম, “আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।”

তিনি বলিলেন, “এ তো এক দিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।”

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চেতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, “বহু বয়ে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েক দিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।”

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্থায়ী গহনার বাস খুলিলাম। সেই পাষার কণ্ঠীটি ভুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, “এইটি তুমি রাখো।” বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু, টাকায় তো মান্দুৰ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দিলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। বে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।



## শেষের রাত্রি

“মাসি!”

“ঘুমোও যতীন, রাত হল যে।”

“হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলাম, মণিকে তার বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—”

“সীতারামপুরে।”

“হাঁ, সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে! ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।”

“শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।”

“ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—”

“তা সে নাই জানল—চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অর্মানি বউ কেঁদে অস্থির।”

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যিক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

“বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠততো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।”

“হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন, আসছে শুব্ব্বারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—”

“বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুঁশি হবেন।”

“ভাবছি আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।”

“সে কী কথা। যতীনকে একলা ফেলে যাবে! ডাক্তার কী বলেছে শুনছে তো?”

“ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—”

“তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী করে।”

“আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে—শুনোই ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—”

“তোমার মায়ের ভাব বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু, যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি বলে রাখছি।”

“তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—”

“তুমি গেলে কোনো কতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু, তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।”

“আচ্ছা বেশ—তুমি লিখো না। আমি ঠুকে গিয়ে বললেই উনি—”

“দেখো বউ, অনেক সরোছি—কিন্তু, এই নিরে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও

কিছুতেই সহিব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।”

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিক ক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সহি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কী সহি, গোসা কেন।”

“দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অল্পপ্রাশন—এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।”

“ওমা, সে কী কথা। যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে শুবছে!”

“আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে। বাড়িতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন করে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি।”

“তুমি খানি মেরেমান্দু যাহোক!”

“তা, আমি ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে বলে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।”

“তা, কী করবে শূনি।”

“আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।”

“ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে!—চলন্দু, আমার কাজ আছে।”

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে—এই ধরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, “মাসি, এই জানলাটা আর একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।”

জানলা খুলিতেই স্তম্ভ রাতি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত বৃগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী এই তারাগুলি যতীনের মূখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মূখখানি দেখিতে পাইল। সেই মূখের ডাগর দুটি চক্কু মোটা মোটা জলের ফোঁটার ভরা—সে জল আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু, দেখো—”

“না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম—সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।”

“মাসি!”

“যতীন, ঘুমোও বাবা।”

“আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও। বিরক্ত হোরো না, মাসি।”

“আচ্ছা, বলো বাবা।”

“আমি বলছিলাম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে। একদিন যখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ করে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—”

“না বাবা, অমন কথা বোলো না—আমিও সহ্য করেছি।”

“মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো-একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—”

“ঠিক কথা, যতীন।”

“সেইজনাই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।”

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া খিয়েটার দৌঁধিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনের পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনের বালিতে চাহিয়াছেন, ‘বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না—ও একটু চাহিতে শিখুক—মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।’ কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বালিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, “আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সূখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সূখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো—সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে!”

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দৌঁধিতে পাইল না।

“আমি ভাবছি মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।”

“অল্প বয়স কিসের যতীন? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি—তাতে কতি হইবে কী। তাও বলি, সূখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের।”

“মাসি, মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—”

“ভাব কেন, যতীন। মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য।”

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে            মন, যখন জাগলি না রে  
তখন            মনের মানুষ এল ম্বারে ।  
তার            চলে যাবার শব্দ শুনে  
                  ভাঙল রে ঘুম,  
ও তোর        ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ॥

“মাসি, ঘড়িতে কটা বেজেছে।”

“নটা বাজবে।”

“সবে নটা? আমি ভাবছিলাম বুঝি দুটো তিনটে কি কটা হবে। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার দুপূর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।”

“কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্বন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।”

“মণি কি ঘুমিয়েছে।”

“না, সে তোমার জন্যে মসৃণির ডালের সুপ তৈরি করে তবে ঘুমোতে যায়।”

“বলো কী মাসি, মণি কি তবে—”

“সেই তো তোমার জন্যে সব পখি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।”

“আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—”

“মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দারে পড়লেই আপনি করে নেয়।”

“আজ দুপূরবেলা মৌরলা মাছের যে কোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলাম তোমারই হাতের তৈরি।”

“কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মছে কেমন তক্তকে করে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত। ও তো তাই চায়।”

“মণির শরীর বুঝি—”

“ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।”

“মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী করে।”

“আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।”

আকাশের তারাগুলি যেন কর্দগাবিগলিত চোখের জলের মতো জ্বল্জ্বল্ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে

আপনার রোগক্রান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্খুস করিয়া যতীন বলিল, “মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—”

“এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।”

“আমি বেশি ক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—”

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এ দিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই মন্ত দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বাকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে—সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু, পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়; কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশ একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুকিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে—সে-সব কথা চলবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল আজকের রাত্রে পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনের এমনতরো নিরাল্পা পাঁচ মিনিট আর কটাই বা বাকি আছে।

●

“একি বউ, কোথাও যাচ্ছ নাকি।”

“সীতারামপুরে যাব।”

“সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।”

“অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।”

“লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না—কিন্তু আজ নয়।”

“টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।”

“তা হোক, ও লোকসান গায়ে সহিবে—তুমি কাল সকালেই চলে য়ো—আজ য়ো না।”

“মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।”

“যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।”

“বেশ তো, এখনো সময় আছে—আমি তাঁকে বলে আসছি।”

“না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।”

“তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অল্পপ্রাশন—আজ যদি না যাই তো চলবে না।”

“আমি জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ এক দিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বোসো—তাড়াতাড়ি কোরো না।”

“তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অন্যথ চলে গেছে—দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।”

“না, তবে থাক—তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে—কিন্তু, যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।”

“মাসি, তুমি এমন করে শাপ দিয়ে না বলছি।”

“ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।”

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন যতীন ঘুমাইয়া পড়বে। কিন্তু, ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বললেন, “এই এক কাণ্ড করে বসেছে।”

“কী হয়েছে। মণি এস না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।”

“গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরও তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ঠান্ডা করে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।”

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জ্বলম্ব করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

“মাসি!”

“কী বাবা।”

“আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক করো না।”

“না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় এ কথা আমি মনে করি নে।”

“মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।”

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় ষোড়শে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দৃষ্টির মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নতুন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বন্ধু মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীরে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্ততঃ রাত্রি মঙ্গলঘণ্টের মতো পুণ্য-ধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, ‘এত দিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল। অনেক কাঁদাইয়াছ—সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।’

## ৪

“কষ্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার বলে মনে হচ্ছে না—এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।”

“পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন।”

“আমার মনে হচ্ছে মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।”

“বাবা, একটু বেদনার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।”

“আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি—ঠিক মনে পড়ছে না।”

“আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।”

“মা বখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলাম—”

“সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।”

“কিন্তু, এই বাড়িটা—”

“কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।”

“মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—”

“সে কি জানি নে যতীন। তুই এখন ঘুমো।”

“আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।”

“সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।”

“তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো-দিন মনে কোরো না—”

“ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বোশ, বাপ।”

“কিন্তু, তোমাকেও আমি—”

“দেখ্ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি!”

“মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—”

“দিয়োঁছিস যতীন, ঢের দियोঁছিস। আমার শূন্য ঘর ভরে ছিল, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভরে পেয়োঁছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুক-মূলুক—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।”

“তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু, মণির বয়স অল্প, তাই—”

“ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—”

“কেন ভোগ করবে না মাসি।”

“না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলাছি, ওর মধ্যে রুচবে না! গলা শূন্যে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।”

যতীন চূপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, ‘এমনিই বটে—আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত বড়োই ফাঁকি।’

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।”

“কম কী দিয়ে যাচ্ছ বাছা। এই ঘরবাড়ি-টাকাকাড়ির ছল করে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।”

“আর-একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শূন্যে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।”

“এসেছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে বসে বসে অনেক কথা



বাতাস করে তার পরে খোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।”

“আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখাছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে—দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েছে—ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ—ওকে দেখতে দাও যে আমি মরাছি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সহিতে পারবে না।”

“বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠান্ডা হয়ে গেছে।”

“না মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।”

“জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।”

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনের মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

“কিন্তু মাসি, আমি তো জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না—সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।”

“মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে—ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।”

“তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস একর্জিবিশনে পাঠানো হবে না—ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।”

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারি মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে—এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

“মাসি, ডাক্তার বৃকি নীচের ঘরে?”

“হাঁ যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।”

“কিন্তু, আমাকে যেন মিছামিছি ঘূমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো ওতে আমার ঘূম হয় না, কেবল কন্ট বাড়ে। আমাকে ভালো করে জেগে থাকতে দাও। জান মাসি? বৈশাখ-স্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই স্বাদশী আসছে—কাল সেইদিনকার রাত্রে সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের বলেছে আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু, আমি তোমাকে

নিশ্চয় বলছি মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা করে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে—তা হলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে বলেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি।—মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভরে উঠেছে আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকাছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মূহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না—না মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সহিতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলাম, আজ কেন তোমার এমন হল।”

“ওরে যতীন, ভেবেছিলাম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখনো বাকি আছে—আজ আর পারছি নে।”

“মণিকে ডেকে দাও—তাকে বলে দেব, কালকের রাতের জন্যে যেন—”

“যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।”

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, “ওরে, আর—একবার আর—আর রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ—সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।”

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “মণি!”

“না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকাছিলেন?”

“একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।”

“কাকে?”

“বউঠাকরুনকে।”

“তিনি তো এখনো ফেরেন নি।”

“কোথায় গেছেন?”

“সীতারামপুরে।”

“আজ গেছেন?”

“না, আজ তিন দিন হল গেছেন।”

কৃগকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ কিম্বিকিম্ব করিয়া আসিল—সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতকৃগ বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শূইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেক কৃগ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, “মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।”

“কোন স্বপ্ন।”

“মাগি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলাছিল—কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মাগি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক’রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।”

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, ‘যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতোছিলাম সে আর টিকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো—প্রবণনার স্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।’

“মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেরোছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথর, আমার সমস্ত জীবন ভ’রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বৃদ্ধে করে মানুষ করব।”

“বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাবে? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্-না।”

“না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।”

“আর বাকিস্ নে যতীন, বাকিস্ নে—একটু ঘুমো।”

“তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।”

“ও তো একেলে নাম হল না।”

“না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে—সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।”

“তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।”

“মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর?—আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?”

“বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্বল—সেইজন্যেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।”

“মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।”

“স্বাই বল বাছা, তুমি নিজেকে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।”

“মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জ্বর্দস্তি করি নি—কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাঁবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বয় নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি বলেই এতদিন এমন করে বসে থাকতে হল—এইবার সত্য হরতো দয়া করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে।”

“কই, কেউ তো না যতীন।”

“মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি বেন—”

“না বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।”

“আমি কিন্তু স্পষ্ট বেন—”

“কিছু না, যতীন—ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।”

“দেখুন, আপনি ঠর কাছ থেকে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাগি এমনি ক’রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শূতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।”

“না মাসি, না, তুমি যেতে পাবে না।”

“আচ্ছা বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।”

“না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়াই নে—শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মান্দুশ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।”

“আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়ার সময় হল—”

“সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে—এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সাস্থনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চাঁকৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন—বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথ্যাকেই না।”

“আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।”

“তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত করো না।—মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো—আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।”

“আচ্ছা, শোও বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।”

“না মাসি, ঘুমোতে বোলো না—ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে।—তুমি শব্দ শুনতে পার না? ঐ যে আসছে! এখনই আসবে।”

৫

“বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো—ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।”

“কে এসেছে। স্বপ্ন?”

“স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছে—তোমার স্বপ্নের এসেছেন।”

“তুমি কে।”

“চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।”

“মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।”

“সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।”

“না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়! ও শাল মিথো, ও শাল ফাঁকি!”

“শাল নয় ষতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে—ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।—অমন করে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে—এখন একটুখানি চূপ কর্।”

আশ্বিন ১৩২১

## অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো বাহার বৃক্ষের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বাঁগিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে ষতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলার আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমূল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিরাছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মূখে সূর্যপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মূখে বিদ্রূপ অবার কেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মান্দু। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মান্দু—বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্বন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অল্পপূর্ণ কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু, ফঙ্গুর বাণীর মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শূঁষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গন্ডুও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সংপাট। তামাকটুকু পর্বন্ত খাই না। ভালোমান্দু হওয়ার কোনো কণ্ঠাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমান্দু। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বস্তৃত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপূরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বরস্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমঞ্জার জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান বাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসদ করিবে না। বাহাকে

শোষণ করা চলবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে বাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুড়ে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পুবেই এম্.এ. পাস করিয়াছি। সামনে ষত দুই পৰ্বন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু ধু করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুণমর্মে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি বলে তবে—”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বদনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।”

হরিশ আসর জমাইতে অস্বীকার করিল। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপড় করিয়া দিতে শ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পল, কাজেই বাপ কেবলই সবুজ করিতেছেন—কিন্তু মেয়ের বয়স সবুজ করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোম্পানির পৰ্বন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুলা পার হওরাটাকে তাহার সংহিতার একেবারে নিবেদন করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য বাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিন্দাদা, আমার পিস্ততো ভাই। তাহার মস্ত রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি যোজো-জানা

নির্ভর করিতে পারি। বিন্দুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!”

বিন্দুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বৃদ্ধিলাল, আমার ভাগ্যে প্রজ্ঞাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চম্পিশের কিছু এ পারে বা ও পারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুন্দর বটে। ভিড়ের মধ্যে দাঁখলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুঁশি হইয়াছিলেন। বোকা শব্দ, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। আমার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দাঁমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিতান্ত নিজীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুঁশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পূর্ণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তার কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভারি এক সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠিকবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বদাই তিনি বৃদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ—ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গারে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুয়ারি করিতে হইলে কেহানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে



বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশ, শখের কন্সট্ প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্ষর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পশ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চাঁড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূলা কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাপে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরষাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মূখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপদ-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সট্ পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরুর করিয়া বরুকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিব্যক্তি করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠিকবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনার ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন—দেওয়া-খোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শব্দ মূখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্রাকে সন্ধ্যা সপ্তে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে এবং স্যাক্রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কন্সটপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজের বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরুর হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা বাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চূপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।”

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?”

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথার আমার সম্পর্ক অনধিকার।

“আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।”

শম্ভুনাথ বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছার বাঁধা গহনা আনিয়া তত্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাহার পিতামহীদের আমলের গহনা—হাল ফ্যাশানের স্ক্রু কাজ নয়—যেমন মোটা তেমন ভারী।

স্যাক্রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই—এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।”

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালার একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাকিয়া যায়।

মামা তখন তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে বাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্রার হাতে দিয়া বলিলেন, “এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।”

স্যাক্রা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।”

শম্ভুনাথ এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।”

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।”

মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লসন—”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “সেজন্য কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষাঘরেরও আহা হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্ত হইল।

বরষাঘরের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কী বল। বসিয়া খাইতে দোষ কিছু আছে?”

মূর্ত্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহায়ে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, “আপনারািককে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা

ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, কমা করিনে। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—”

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শম্ভুনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।”

শম্ভুনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, “আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।”

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লুণ্ঠলুণ্ঠ করিয়া, বরষাত্তের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড্ রসনচৌকি ও কন্সর্ট্ একসঙ্গে বাজিল না এবং অস্ত্রের ঝড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সম্বন্ধ পাওয়া গেল না।

০

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, ‘দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।’ কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সংপাত্তের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরষাত্তরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, ‘বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকবন্দটাকে সমস্ত অন্নসুখ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।’

‘বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব’ বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার খেটুকু বাকি আছে তাহা পূরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জ্বল হইয়া আমাদের পারে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখার তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বাহিতোঁছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে

ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো বে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লঙ্কার রক্তমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কম্পলোকের কম্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দুরত্বটুকু এক মৃহুতে অসীম হইয়া উঠিল।

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিন্দাদার বাড়িতে গিয়া তাহাকে অশ্রুর করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিন্দাদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফূর্লিগের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুকিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাস্তবের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন বুকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লঙ্কার বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে তুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন প্লেকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কম্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে তুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হয় নি বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে—বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের খারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফাঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি ঘরের টোপর পারে দাঁতিকা দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া

চলিয়া এসো। কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শূন্য সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পদ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—আমি বিরাহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নব-বর্ষার জল পড়িল, স্নান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

## ৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পূল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট: স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাজি জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রি কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্গির চলে আস, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজ্ঞানগার আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বসিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনিবর্চনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড, তাহার এক-চক্‌ লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সর, অচেনা কণ্ঠের সর,

এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি—চঞ্চল কালের ক্ষুধা হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমিত কোমলতার এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিত্তে শুনিত্তে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধূয়া—‘গাড়িতে জায়গা আছে।’ আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মারা, সেটা ছিল হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে—শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছ, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মূখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাগেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আদর্শালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বন্ধিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনার পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। শ্বারে শ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না—এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধূয়া—‘জায়গা আছে’। কণ্ঠমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষয় দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলিত্তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাহাই করিলাম না।

তার পরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখন্ড আনন্দের ছবি আছে—তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাকের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মূখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স যোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্ত নির্মল, সৌন্দর্যের শ্ৰুতিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িয়া নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি,

সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক—রজনীগন্ধার শূদ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃত্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতোছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না—ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতক-গর্দল ছবিওয়ালারা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পাঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের বর্না ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উন্মাদিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূক্ষ্মকরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেটন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলে-মানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জ্বাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতোছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতোছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্দেশ্যে করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতোছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দইখানা টিকিট গাড়ির দই বেণ্ডের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল,

“এ গাড়ির এই দুই বেষ্ট আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনা-দিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো ভাড়াভাড়া ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।”

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু, মেয়েটির চলকৃত্যর কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দঃখিত, কিন্তু—”

শুনিয়া আমি ‘কুলি কুলি’ করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, “না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে স্কারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।”

বলিয়া নাম-লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আদালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব স্কারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আদালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মূখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি ছাড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপল্লন চানা-মুঠ খাইতে শুরুর করিল, আর আমি লক্ষ্যের জানলার বাহিরে মূখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থাকিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত—স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী মা।”

মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা—”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

### উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”



আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বদ্বিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার বৃত্ত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্মৃতি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কেন্ ওপারের বাঁশ—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল ‘জায়গা আছে’, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধূয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায়—আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক ১০২১

## তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাতে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্ দব্ করিতেছে। রাতি তিনটের সময় ঝর্ঝর্ঝ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাস তার মাথার বাঁশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আঙ্গিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারঞ্জমশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকমার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প।

নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, ষতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি. এ. পাস না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুস্‌টি শোঁখিন। জীবননিকুলের মধু-সপ্তরের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই নয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফ তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু, কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পন্ডিভমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মূর্নি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মূর্নি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পন্ডিভমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেডমাস্টারের কাছে সম্মান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সম্মতি হইতে পারে। অধ্যক্ষ ছেলাদের যারা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার বাচি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যদুর্গে সিঁধলাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মারী; তারা বরদাকে বড়ো জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষার ফেল করিল তখন তার

সাম্বন্ধ হইল এই যে, সে ষশম্বী মাস্টারমশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু, এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর-এক দল মাস্টার নিযুক্ত হইল; তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফার্মস্ট্ ডিভিসনে পাস করিতে পারে তবে তাঁদের বক্শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা ষথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজার্মিনের ঠিক আগের রাতে পাড়ার কবিবাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জ্বোলাপের বাড়ি খাইল এবং ধ্বস্তরীর কৃপায় ফেল করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ-অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বঁচিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতার ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, “এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।”

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?”

সে বলিল, “বিলাতে।”

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেন্স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বোর্ডিংটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো একজার্মিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি.এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মূর্খকিল! বি.এ. পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি.এ. পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি.এ. পাস বিদ্যাপর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মূনি করিতেছেন কী! তিনিও কি জটা মূড়াইয়া বি.এ. পাসে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, ‘বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।’ আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলো তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-মোড়াটা মাখন বোচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, ‘দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!’ স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে

কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি.এ. পাসের অধীন নয় এবং যেটাতে দারা স্দুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সম্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল স্কুলঘরে মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরো-গুলো পরীক্ষাদর্গের ভ্রমাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক-টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

‘আমি সম্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।’

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলোর ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে—আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপড় করা; তেলের-দাগে-মলিন চোঁকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকায় উৎপাত ও জীর্ণতার চূড়ি-মোচনের জন্য একটা পুরাতন এট্লাসের মলাট পাতা; এক ধারে একটা শূন্য প্যাক্‌বাল্লের উপর একটা টিনের ভোরপে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ভিল্লনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলো পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা কাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্‌ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাল্ল-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি করিয়া পড়িবে। সম্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সান্দ্রনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ষয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুঁকি বলিয়া ডাকিত, স্বশ্রবণবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনার বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাস্ত্রী ছিলেন চিররুগ্ণা—কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাস্ত্রীর ভাষা ছিল খুব প্রথর; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন, তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বল দেওয়া এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মৃত্যুহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্ভামী বুদ্ধিতেন, ব্যর্থ মৃত্যুহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মৃত্যুহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গাঁতকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মূখে ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের বাহু বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন, 'খন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে—এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বাড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এ দিকে বৃষ্টি নেই, ও দিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জ্বালাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু, তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল বলে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারও মূখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলে তাঁর মূখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মূখ একেবারে জ্যেষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলোটো বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বেগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শূন্য করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে শূন্য করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি সে যে ডামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অল্প বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বন্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতম মূনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বৃষ্টি কৈরাগো একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ

করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সেনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুখ সকলেই তার প্রতি অন্যান্য করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সাক্ষ্য, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঝিগুপ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাকে এমন-কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া, তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন— তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিন্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রৌলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আল্‌মারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর।'

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, খামা, চূপড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাস্কের ভিড় জমাইয়া ঘরকমার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে— এমন সময় সংসারের সমস্ত বাস্তবতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানলার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ 'জর বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সম্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্ত্র মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতার বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সম্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শব্দ হইল। সম্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শব্দরের কাছে বধুর আবদারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছু-কাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু, তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সংকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সম্যাসীও যথেষ্ট জুড়িতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী। বিশেষত

জটোখারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ঘন্টা লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু, ষোড়শীর মূখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পাড়িত। পিসি তাকে লইয়া বাসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি।— বরদার যে ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে-বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাভূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বৃকি কিছ, কিছ, মেলে; বৃকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বাহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়—কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বাসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধ্যানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধ্যানই তার সুখ। এই সন্ধ্যানই তার স্বামী, তার জীবনবোবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধ্যানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়া ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অর্তিধি আসিয়া পৌঁছবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধ্যান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোস্তমাকে গাড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সন্তা, তেজঃপূর্ণ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারী, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর-কিছ, ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাকিদুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাকিও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনার লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শায়, এক বেলা বা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গারে তার গেরুরা রঙের তসর, কিন্তু সাধবোয় লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিন্ধির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্ধুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরুর করিল। মৃদুস্বাভাষ মৃদুস্বভাষ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পশ্চিমশায়র বলিলেন, একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতার সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধনী স্ত্রীর পায়ের ঘূলা ও আলীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভরে সম্ভ্রমে চূপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গারের তসরের

রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ-যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠান্ডা হাওয়া দিভেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চূপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্মিল্ করে, সে যেন তার বৃক্কের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠ-বিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্রান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। একে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তন্ত গ্লানের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল, যা তাঁর চতুর্দুর্গের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে ধূনির সঙ্গে গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে, তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস্মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী তো কচ্ছ-সাধনের কাটা গাড়িয়া আজও সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙকে আরও ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পাড়িল, “আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।”

পণ্ডিত বলিলেন, “মা, তোমার তো এ-সকল পন্থার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।”

তার পূণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জন্মিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির বি-চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাঠী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পূণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গোরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে তার মূখে বাধে—তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চূপ করিয়া রহিল।

মাথনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, “বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলা তো।”

মাখন বলিলেন, “সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ সেইখানেই তোমার নাগাল কজন লোকে পায়।”

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মানুসও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো—অর্থাৎ খার-দার, ঘুমার, এবং পরের কুৎসাখচিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর-কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সম্মান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুসও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলার ঠৈরব নদের ধারে



খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে বরণ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু, তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িটা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল—একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটুকিলে। এই পালক তিনটি যে সবুজ রজ তম, ঝক্ ঝঙ্কঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পরশু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভৈক্ষ লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম.এস্-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাবজজ তাঁর সমস্ত পেন্সন এই নৈমিষারণ্য-ফন্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাহার পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কর্মিটির গৃহী-সভা হইতে হইল। গৃহী-সভার কর্তব্য, নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সম্মাসী-সভাদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী-সভাদের প্রস্থার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় ধার্ম্যমিটরের পারার মতো সত্য অক্ষটার উপরে নীচে উঠানামা করে। অংশ কম্বার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অক্ষের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়োকিছু বাকি রহিল না এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, “দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।”

মাখন উদ্‌বিন মূখে বলিলেন, “তাই তো, কী করি।”

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, “মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিকবে।”

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন-সকল কথা উন্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।



বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না তা আমি কেমন করে জানব।”

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তম্ভ হইয়া চোখ বৃজিয়া রহিলেন; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, “জীবিত আছেন।”

“কেমন করে জানলেন।”

“সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্বীলোক হরেও

সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী করে নিয়েছেন।”

ষোড়শীর শরীর-মন প্ৰলোকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।”

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন; তার পরে বলিলেন, “একখানা আয়না নিয়ে এসো।”

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছ?”

ষোড়শী শ্বিধার স্বরে কহিল, “হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।”

“সাদা কিছু দেখছ কি।”

“সাদাই তো বটে।”

“যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো?”

“নিশ্চয়ই করফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।”

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতোছিল এখন সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, “মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোনদিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।”

ষোড়শীর মূখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন— বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন! কেবল উত্তরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে: এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, “ভয় কী বাবা!”

মাখন বলিলেন, “আমরা দাঁড়াই কোথায়।”

ষোড়শী বলিল, “নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।”

মাখন বদ্বিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চূপ করিয়া ভামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়পরা এক যুব টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, “চিনতে পারছেন না?”

“এ কী। বরদা নাকি।”

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্-এক কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, “আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় করে দিতে পারি।”

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

## পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভ্যেদী নেশা আছে, তারই আওতার অন্য-সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মস্তটা ছিল এই—

যাবজ্জীবন নাই-বা জীবন

কণক কৃষ্ণা বহিঃ পঠেৎ।

ষাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথের অভাব, তারা যেমন করে টাইম্‌টেবুল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসম্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর-কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয়, বল, অনামনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শ্বশুরের পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন বখা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুম্‌ম্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চকুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যিক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ার বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়— স্নোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি.এ. এম.এ. এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিত্তোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টেলিমির পৃথিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ত্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পত্রপত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদর্শন করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল-বেল্‌ফাম পেরিয়ে কার্ণাইল-রাঙ্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টার-মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওয়ার কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাপন নয়— সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি জার্মান ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলাম। আধুনিকতার যে এক্সপ্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্সলি-ডার্মিনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসনকেও বিচার করতে ডরই নে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্লিস্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক

সাহিত্যে সম্ভা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সম্মান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দূ-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না, অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক শ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনিতা তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরোনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপসা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ার কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে বাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির শ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এ দিকে আমার নাম হচ্ছে অশ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল শ্বিতাশ্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাণ্ড-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নতুন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়, তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদা কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যার ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকমার নড়াচড়া এবং রাসাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর চুকুটিভঙ্গী ভবই জ্ঞানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু, ভবেব তিন চক্র; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে কীপ হয়ে গেছে। সুতরাং, অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর চুচাপে কিরকম চাপলা উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বৃদ্ধে নিয়োজিতেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি ডাল-কানা এবং আমার গৃহস্থালির কোর্টরে কোর্টরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উজ্জ্বল চেটে ও শূঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দয়কার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা করে করে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যারামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম,

কিন্ধা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। বাদের বাধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—বারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্ হন্ করে পারচারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার শ্বেতদলটি জমে নি তখন আমার একমাত্র শ্বেত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরভেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন, সৌজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেন্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক বৃদ্ধিশাস্ত্রই বল, তার মধ্যে সমতা কিন্ধা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃন্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনিনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিস্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে বর করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, “মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।” তাঁর স্ত্রী ও শ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, “এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।”

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বৃদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাধ্যমে কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুস করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চৈরে যোগ্য, এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় বৃগের ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বৃদ্ধি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, “সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।” অনিলা বললে, “মাস্টার রেখোঁছ, ইন্সকুলেও যাচ্ছে।” আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি

নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বললে না, না'ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না আমি কলেজে পাস করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিও-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলিছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার পাঁচে পাঁচে বিদ্যোগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবৃষ্টিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জন্মে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার শৈশবের নিয়ে বেগ'স'র তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলাম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বৃষ্টি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন, অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুদেব যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে পৃথিবী মূহূর্তে মূহূর্তে নতুন নতুন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি বাথার ভার বৃকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্ঘর্ষী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্ররাস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গত ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মর্ষিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন শৈশবের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম বাথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করতে আমি ও দিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পরলা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উম্মব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রতীতি ত্রিস্রাকান্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্প দিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাশন্দুর্মোহি, এবং ধরে নেওয়া যাক তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো জানতেই পারতুম না। কারণ, কণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যান্যনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব, সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মূন্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথা মূন্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুন্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্বত তাদের ভয় করেন।

মনে বুদ্ধলুম, সিতাংশুমৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি-ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মূন্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ডুক্কেপমাত্র না ক'বেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, টাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপচাত-মত্বা বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শ্রুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যার গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম, আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ! কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটো তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের স্ফারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়াল মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়াল আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অস্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি জ্বর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই



আমার তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মূহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাতে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুঁরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলাম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশাস্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসূক্ষ্মা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিত। আজ সেই অপরিমিত দানবটাই টাকার খালিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার শ্বেতগর্দূল তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলাম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন. আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যিক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বৃদ্ধো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলাম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলাম, কেবল যে আমার শাসি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে সেটা তেমন আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমার শ্বেত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিত ছিলাম; এমন সময় একদিন লক্ষ করে দেখলাম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বদ্বললাম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চার। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়—শুদ্ধ অমতে ওর

পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মর্দাড়া দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বোরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি.এ. পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি.এ. পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারতুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুণিল শব্দ। তিনি তিনটে বন্দ্য বাজাতে পারেন—কর্নেট, এসরাজ এবং চেলা। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ-অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শব্দ শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলাম, আমার শৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা-নম্বরের চেলা বেঞ্জে উঠলেই যারা গার্ণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, “পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুড়েছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য-কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।”

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললাম, “দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগ্য বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।”

কানাইলাল হেসে বললে, “যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের খুলোর মাহাশ্মা, পতিদেবতা-পুঙ্কর পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।”

আমি বললাম, “না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।”

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধাবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতি আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁরা-তবলার সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কর্মিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি, কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কর্মিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মূখে বতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলাম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে

সিতাংশুদমৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু, তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকালবেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ার চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুৎ বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে, কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশু এসরাজ বাজাচ্ছে—ঐ যন্ত্রটার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেমসী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে—সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিরে দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো-কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার শ্বেতগুলির অনেকেই পরলা-নম্বরে টোঁনিস খেলতে, কন্সট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুপ্তদের উদ্ধার করা ছাড়া আর-কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ট্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পরশুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুঁর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ট্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িঘর মূলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছারাটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাটকের পঞ্চমাস্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ট্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের শ্বেতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজার ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম, “তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ছুলো না।”

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, “কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।”

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, “সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে নাকি।”

আমি বললুম, “হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বেগ্‌স’র উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাটনি পর্যন্ত।”

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, “অশ্বেতবাবু, আমি বালি, আজ থাক্।”

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেলবেলার আশ্বহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গল্পনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “তুমি কোথা থেকে শুনলে।”

সে বললে, “পয়লা-নম্বর থেকে।”

পয়লা-নম্বর থেকে! বিবরণটা এই—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে বখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অস্বাভাবিক সঙ্গ নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অস্বাভাবিক কাছ থেকে রাতে সিতাংশুমৌলি এই খবর পেয়েই তখন সেখানে গিয়ে পুঁজিসকে ঠান্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

বাস্তবাস্ত হয়ে তখন অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলাম, অনিলা বৃদ্ধি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করছে। বখন লক্ষ করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাতে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি অভিযোগ করে বললুম, “আমাকে কিছ্ বল নি কেন।”

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে—কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জার অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত ‘তোমাকে বলে লাভ কী’ তা হলে আমার জবাব দেবার কিছ্ই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব—সংসারের সুখ দুঃখ—নিরে কী করে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছ্ই জানি।

আমি বললুম, “অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।”

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়বার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, “কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।”

আমি বললুম, “আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।”

সে বললে, “তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।”

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের স্নোকটা তত বেশি কিছ্,

নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার শ্বেতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলি চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনোদিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখন শূতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম, “শোবে না?”

সে বললে, “বাসনগুলো তুলতে হবে।”

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার-চশমা-চাপা-দেওয়া এক-টুকুরো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে— ‘আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।’

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা-কিছু জমিয়েছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মর্দির দোকানের দেনার হিসাবও টাকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম—আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম—কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ার তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাতে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাক্ করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নবাতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলাম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যান্য আমার ঘরে জ্বল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টল্‌স্টয় টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে স্ফুর্ন্যাস্ফুর্ন্য করে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন সূনিশ্চিত করে ঘটতে পারে তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে

যথোচিত হাল্কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। বোদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই-দিনকার কথাটা মনে করে শূন্য হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুস কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বৃন্দবৃন্দ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক্ গে—কিন্তু, জগতে সবই তো বৃন্দবৃন্দ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিকে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে কুখায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেয়ালটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতের বাঁধা এক-তাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পরমা-নম্বর থেকে এসেছে। বৃন্দটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুকরো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গাঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

‘আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবে আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

‘আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু, দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘূমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ—আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি—কিন্তু, আমাকে ভুল বৃদ্ধো না। আমি তোমার কোনো কতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই প্রার্থাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাকবে না।’

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত—কিন্তু তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘূমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার শ্বেতদলকে এবং নবান্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং, যাকে আমি কোনোদিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার কৃত্তির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

‘বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্ভাগীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই শ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।’

বোঝা যাচ্ছে, শ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলাকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম, সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলাকে দেখি নি। ভয় হল, পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেলে একবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, “আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি—সেটি এই দেখুন।”

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড-কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, ‘আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খোঁজ পাবে না।’

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ, এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

## পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজ্ঞাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপক্ষে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘূমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘূম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কেউ দারুণগ্রহ ব্যাপারে ম্ভিতীয়, এমন-কি তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট বোর্ডে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোন্দ বছর বয়সে এন্ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হর নি। ইন্দুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্যে আমার পৃথিবীর সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোন্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পাণ্ডিত-মশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষার পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলাম সাতকীরার কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাদের বসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা বৃত্ত; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমাণ্বিক প্রয়োজনে আমাদের পাণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্যে মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলাম। সে পক্ষে যে আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই।—আমার তো কলকাতার কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পূর্নবিচ্ছেদদঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবন্ধু মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ করে, যত্ন করে, তাঁর দিন কাটতে পারে। পাণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত—কারণ, সে শিশুও বটে, সূশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যা-দায়মোচনের পারমাণ্বিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেরেটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পাণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর ‘পরিবার’ কাল রাতেই মেরেটিকে নিয়ে বাসার এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের বাটখারার বোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারী হয়। মা বললেন, মেরেটি সুলক্ষণ—



অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সাম্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে পন্ডিভমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবস্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার-বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, “সন্দ, পন্ডিভমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।”

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গারে কলকাতার দোকানের এক সার্টিনের জ্যাকেট—সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে—রঙ শামলা; ভুরুজোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মূখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বৃকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বললুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার—আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়, বিধাতা এই বয় দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য-সমস্ত বৃত্তের উপর চটা ছিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর বেলায় তিনি মূখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি; কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু, মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুলের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোন্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেললুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহুকালটা অনুশোচনার গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন প্রেশীর—কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশবাস্ত হরে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই গ্রস্ততা

আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব-একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর স্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অর্কিণ্ডকরতা থেকে হঠাৎ এক মূহুর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ করে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁকি করতে লাগল। বাবা বেরকম মাকে কতবোয়র বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার চর্চা নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনাভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা বেরকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ভার করতেন, আমি কম্পনার কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যান্ড-নোট থেকে আরম্ভ করে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে বসে তার খাওয়ারই হল না এবং জানলার ধারে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মূচছে এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্রে দেখতে পেলেম, এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আশ্বিনভরতর সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু, আমার মনের মধ্যে গাহস্থ্যর যে চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল; এই কম্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই—রবিবারে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছাড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থার খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ইবং তন্দ্রাবেশে নলটা নীচে পড়ে গেল। বারান্দার বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আলুমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বললুম 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল। আমি গিরে দেখলুম, তিনের শেল্ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম, কিন্তু কাশীকে জুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নিবৃশ্চিত্যর দোবে স্বামীর বিপ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই জুলতে পারলে না।

বাবা ডাকান্তি উদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার

সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মৃদুহৃৎে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরীতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাক্তারি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্ধলুপ্ত বলে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্ভতার কথাটা চারি দিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনকণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাঁক রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি করদিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, ষথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শূভকর্মে সকলেই তাঁকে ষথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদা ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদী ছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে ঘাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শূন্যেছেন। ছেলেরটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শূভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবল বেগে মামলা ডিসমিস এবং প্রচণ্ড ভেঙ্গে শাস্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদচ্যুতি এবং রাঙতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান—এবং ছুটি ফরোবার পূর্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চূপসে গেল—আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

২

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন—তার পরে আমার প্রতি বারে বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ঠিক করি নে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম্.এ. পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোর্ফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোরাখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্ডন করে ডিগ্রির পাওয়া গেল, এবার অর্ধসাগর-মন্ডনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্টন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাজাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে যাকি

আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপহাসকার আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডেপুটি ছিলেন তখন মদ্রাশ্বির বাজার এমন কথা ছিল না, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন্ এবং পেন্সন্ থেকে চাকরি একই বংশে খেরা-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্ভিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্নেন্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্ট্রোল্টর, তাঁর অর্থগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষে কমলালেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিভরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ার আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম্.এ. পাস-করা ছেলে কন্যাটারিকের পক্ষে খুব 'প্রাংশুলভ্য ফল'। এইজন্যে কন্ট্রোল্টরবাবু আমার প্রতি 'উদ্ভাহ' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলাম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি—অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনারাসে পৌঁছিল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোর-পেরোর; তখন খাঁচা স্তীর হাড়া অন্য কোনো রকমের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শব্দ তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে অর্থ আমার মনে ছিল সে অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারি দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাস্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কুশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঞ্জিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকমার গারদে পায়ের বোঁড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরার ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন মদ্রাশ্ব আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলাম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রুপ করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাটারিকের টাকার খলির হাঁ-করা মদ্রাশ্বের সামনে এসে পড়লাম। বাবা বললেন, শব্দস্য শীঘ্রম্। আমি চুপ করে রইলাম; মনে মনে ভাবলাম, একটু দেখে-শুনে বকে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলাম—কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেরেটি পদতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তাঁর প্রত্যেক চুলটি পাট করে, তার ভূরুটি একে, তাকে হাতে করে গড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষার গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে করলা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাখেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত;

তার অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তার সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তার মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় ষত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বৃষ্টিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সর্কুড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্কির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের ষষ্ঠেট শ্রম্মা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি শ্রম্মা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে এটা তিনি সহিতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম “মা, এ মেয়ের ষোগ্যপাত্র আমি নই”, তিনি হেসে বললেন, “না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!”

আমি বললুম, “তা হলে আমি বিদায় নিই।”

মা বললেন, “সে কী সন্দ, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।”

আমি বললুম, “মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বৃষ্টি থাকারও চাই।”

মা বললেন, “শোনো একবার! এরই মধ্যে তুই তার কম বৃষ্টির পরিচয় কী পেলি।”

আমি বললুম, “বৃষ্টি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।”

মায়ের মুখ শূন্য হয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায় ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছা বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অভ্যস্ত বেশি রাগারাগি জ্বলন্ত না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান-আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সঙ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সমস্ত নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অল্পপাত করে, কাজ উন্মার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, ‘ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।’ কলেজে লজিকে পাস করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত বৃষ্টি কৃতকের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন, তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঠাট্টা সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর-কিছুই নেই। অথচ আমি যদি

তাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পশ্চিমশায়কে মাও একদিন কথা দিইয়েছিলেন, শুধু সে কথার শুধু যে আমার বিবাহ ফেসে গেল তা নয়, পশ্চিমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল—তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বৃষ্টি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিংহলিজম্‌টাই যে আইডিয়ালিজম্ এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে ধামিয়ে রেখেছি, কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে কথাটা মূখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধানিবেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্রটি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পশ্চত্যা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে, অবলাজাতি স্বভাবতই অধিক বলে মাথা হেঁট করে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু, বিশ্বকর্মা লজ্জকের পাকা ছাঁচে ঢালানো করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথার বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য আর্জিটেশনে প্রস্থাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পাকেও জখম করে। ষোঁবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোঁওয়ালুম। বাবা বললেন, "মাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আছে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিম্ব হলে বটে, কিন্তু মাঝখানে মা থাকতে ক্ষণ ক্ষণে মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল। আজ সেই কারণে যে মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব স্মার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন ষোঁবনের দুর্নিবার দুর্দশায় একটি বোড়শীর প্রতি (যেসের অক্ষটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছদ সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মূখ করেছিলুম, কিন্তু খবর পেয়েছিলুম কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিংহলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ষোঁই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ

খেরোছি, রাতে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্ট্ খেলোছি, তাদের মধ্যে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনোছি। আমার মর্শকিল এই যে, র্যাসেলস্ ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্ স্টীল পড়ে আমি ইংরেজি পাকিওছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মূখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইংরেজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মধ্যে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বর্ষিক সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি-গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুভা হইছিল। কিন্তু, রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপূরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই-যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মেব নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বৃদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বৃদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্ত-চিন্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্পন্দন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্সেস্টের একটু খুঁত কিম্বা কাটা-চাম্‌চের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পদতুল, এরা বিলিতি পদতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের-দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়ে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মালো; আমি ঠিক করলুম, ওদের বৃদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কান্ড প্রকান্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবানু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবানুর পরিবর্তিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষ-মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স ষত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনোছি ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবৃদ্ধির দূটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে—সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পার আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোকা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বৃদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি; কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বৃদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি কোনো সাবালক মেয়ে অত্যন্ত কালের নোটিশেই আমাকে

বিরে করতে অত্যপমান আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার প্রশ্ন আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুত সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের-বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ান ঠেকেছে, কিন্তু ঘাটে এসে পেঁছন্ন নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনার সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অশ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পশ্চিমতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ার ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পশ্চিমতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের স্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় স্বপ্নস্বপ্ন জান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই কিনা বাধায় আমি পশ্চিমতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—কিন্তু তিনি নাৎনিতে পরিবৃত। সবগর্ভি তাঁর স্বকীর্তি নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃন্দ এদের নিয়ে আপনার বার্ষিকের অপরাহ্নকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরশতক আর্ষাস্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নৃড়িগর্ভির চারি দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগর্ভিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, “পশ্চিমতমশায়, ব্যাপারখানা কী।”

তিনি বললেন, “বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন—এই আমার সেই চাঁদের মালা।”

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বৃদ্ধিতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। পশ্চিমতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি, চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পশ্চিমতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বৃদ্ধলুম, আমার দিন শূন্য, আমার রাতি শূন্য। পশ্চিমতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ—এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পশ্চিমতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাধ-কেদারার দুই হাতের দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বালো মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুরুষ; বার্ষিকো নাৎনি, নাভবউ।



এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম—দেখে তার নিরীতিশয় নীরসতার হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মৃথ ধুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দৌঁড় করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চাঁদ্রিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ খিলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে অংশে মূলতুর্বা পড়েছে সে অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতার তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গাতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতি-বাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না,' এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সম্মুখের সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যান।"

ঘটনাটি এই—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরোলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল—এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে, সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন জ্ঞাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্তিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, জ্ঞাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং শ্বিষচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্ভামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুঁশি হন নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরোলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁশুতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যান্য মকদ্দমা তিনি কিছতেই নিতেন না। প্রথমটা ভাতে তাঁর বত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিরে বসেছেন

এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। ষাদের উপর সাহায্যবিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, “সাধুলোক পাই কোথায়?”

তিনি বললেন, “আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।”

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলার মারা ঘন। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলাম, “এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শূন্য করে মরে গেছে—না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—”

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ার ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, “হিয়ার হিয়ার!”

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণ বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেওয়ালির রাতে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়—কোনদিন তিনি মারা যাবেন, এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, “যদি এর পাঠ জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।”

আমি বিশ্বপতিকে শূন্যকন্যা স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলাম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলাম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত মামুদের পাকবস্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ বের করে পুতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে—তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃত্যুস্তরের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললাম, “পাঠ আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।”

“কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—”

“না দেখেই হবে।”

“কিন্তু, পাঠ যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।”

“পাত্রেয় নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।”

“তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—”

“সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেসে যেতে পারে।”

“মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।”

“বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি ষতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।”

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনাছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সহই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, “পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।”

যে মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রম্মা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জ্বলে বিলিতি কাগজ পড়াছ, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, “আমার নাম দীপালি।”

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বৃষ্টিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই—সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, “আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।”

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপ্যন্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতার ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, “জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?”

সে বললে, “না, কোনো পাত্রকেই না।”

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বই আমার অভিজ্ঞতা বেশি—বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ বলে মনে হল না। আমি বললুম, “যে পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?”

আমি বললুম, “সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রম্মা করে।”

“কিন্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।”

“আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।”

“আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিলে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।”

বললুম, “কাজ আছে, জুড়িয়ে দিতে পারব।”

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, “আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?”

আমি বললুম, “আমি কাল সকালেই যাব।”

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যি মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।’

এমন সময় কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্রের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছূতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে পড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া করে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রদর্শনের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, “যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।”

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি, কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয়, আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মত বিবাহ না সেরে রাখার মূলতর্কি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম উপর-ওয়ালী প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্রাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চম বছর বয়সে আমার ঘর নাৎনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

## নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জমোঁছিল পোলিটিক্যাল লস্কাকাণ্ডের পালার। হাল আমলের উত্তরকাণ্ড আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হল। সবাই জানেন, এই নাটোর পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপূর পেরিয়ে পৌঁছল আন্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারানির পাথের আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এ পারের হাজতেই আমার ভোগসম্মিত। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্বন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম করে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুলেলাম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্ভাগী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্বন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি বলে যিনি পরিচিত তিনি আমার স্বেপার্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক বৃবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন—সে জানেও না যে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। বন্ধন ভেল-খানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তার পরে বাবার দেহান্তে বন্ধন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন নি, তখন সূখে দুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বদ্বালেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই বলে স্নেহ তো ঘুচল না।

তিনি বললেন, “বাবা, যেখানেই থাক আমার আশীর্বাদ রইল।”

আমি বললাম, “সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিয়ে যে মাকে আর দেখতে পাই নি তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।”

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতার

চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, “তোমার স্নেহগঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনোছি, আমি করিও ভগ্নীরথ।”

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মূছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছদ্দ ম্বিধাও হল, বললেন, “অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেয়েটার কোনো-একটা গাঁত করে শেষ বয়সে তীর্থ করে বেড়াব—কিন্তু, বাবা, আজ যে তার উল্টো পথে টেনে নিয়ে চললি।”

আমি বললুম, “পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আশ্বাদান কর'-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আশ্বা।”

সব চেয়ে একটা মৃতি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আন্দামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুর্লিসের বাহুবন্ধনে বন্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মৃতি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুষ্টিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিম আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে সঁপে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজ্ঞাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা চুটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অল্প। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর স্বশরকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেন। করি নি। আমার ভাবী চরিত-লেখক এ কথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালীতে লেখা আছে বলে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষত্রবৃগের পরবর্তী বৃগের হাওয়া বইল। পূর্বেই বলোছি, এখনকার পালার আমরা প্রধান নারক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ যে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিতই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্তায়ন করবার ইচ্ছে এক কালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগ্য-আকাশে লাল-পাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকতে তাঁর আর খেরাল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন পূজোর বাজারে ছিল খন্দরের পিকোর্টিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে খবর আমার কুষ্টির নক্ষত্র ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খন্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুর্লিস সার্জন দিলে ধাক্কা। মূহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল। সূতরাং অনতিবিলম্বে ধানার হল আমার গতি। তার পরে বথানিয়মে হাজতের লালারিত্ত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে বলে গেলেম, “এইবার

কিছুকালের জন্যে তোমার মৃত্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ করে নাও গে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবার ষোলো-আনা মন দিলে দেব মানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।”

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়োঁছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবি-দাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সুখ সম্মান সৌজন্য সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়োঁছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় বলে মনে করতাম।

মেয়াদ পূরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারি দিকে খুব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, ‘এন্কোর! এক্সেলেন্ট!’ মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল—আর, মিস্টারমিতরে জনাঃ, রস পেলো দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমণ্ডের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বোঁড়ি-হাতকড়ার দাগ বার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায়, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, “ওহে, পূজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।”

জিজ্ঞাসা করলেম, “কবিতা?”

“আরে, না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।”

“সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।”

“এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।”

“সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুকুরো টুকুরো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদক চক্রে তেমনি টুকুরো টুকুরো করে সংখ্যায় সংখ্যায় ছাড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।”

“নাহয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।”

“কিরকম ঘটনা।”

“তোমার সব চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে কাজ।”

“কী হবে লিখে।”

“লোকে জানতে চায় হে।”

“এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।”

“মনে থাকে যেন, সব চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।”

“অর্থাৎ, সব চেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি লোকের তাতেই সব চেয়ে মজা। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু, নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।”

“তা তো হবেই। বেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরিয়া-গোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—”

“আগে লেখাটা দেখো, তার পরে মরদস্তুর হবে।”

“কিন্তু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। যিনি বস দর হাঁকুন, আমি

তার উপরে—”

“আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।”

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, “তোমাদের ইনি—বুঝতে পারছ? নাম করব না—ঐ-যে তোমাদের সাহিত্যধর্মধর—মস্ত লেখক বলে বড়াই—কিন্তু, যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তার স্টাইল যেন ডসনের বৃট আর তালতলার চিটি।”

বুঝলেম আমাকে উপরে চাঁড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্যমাত্র, তুলনায় ধর্মধরকে নাঁবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।—

‘সন্ধ্যা’ কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহাসালি বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপুরুষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারও সেবাসুশ্রুষ্কার হস্তক্ষেপমাত্র বর্নাস্ত করি নি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, “পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মৃত্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে তাইয়ার্কি, ঠেবাজা—সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।”

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, “আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।”

নির্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভুলেছিলাম, স্নেহসেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষুর কুলি নিয়ে দারিদ্র্যগোরবে মগ্ন তখন খবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সময়ে সেটা নবম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার সূতোর দামে সূর্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন ‘ভিক্ষুর অন্ন খাচ্ছি’ বলে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাঘ্রবোধীর অনামনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষয়। চমক ভাঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পূলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে-একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অবৈতবৃন্দি দ্বারা তার সম্বয় করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম : নিস্ত্রেগুণো ভবাজর্ন। হায় রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বজ্রাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে শরীর কাবু হত না সে পড়ল অসুস্থ হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি-বা ছাড়লে জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হৃদয় প্রায় হয় না, বিকেল বেলা জ্বর হতে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগুলো টন্‌টনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই বলে অমিয়াটার কি



ধর্মজ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপূর্বে অসুখে-বিসুখে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন— আমিই বাধা দিয়ে বর্লোছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বর্লোছেন, “অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বর্লোছি, তোর আরামের জন্যে নয়।”

আমি বর্লোছি, “হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।”

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শূরে শূরে মনে মনে ভাবছি, ‘নাহয় এক সময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গুরুজনের আদেশের ‘পরে এত নিষ্ঠা এই কিসকুগে!’

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু, অসুখ করে পড়ে আছি বলে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার তার এত অভাবনীয় উন্নতি হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তার হৃৎকম্প হয় না; অনাধাসনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে কুঁলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তার এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী বলে ভক্তি করে— ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালাঁতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে না কাউকে পাওয়া যেত। এখন এক-গ্লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের ‘পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিবিদিনের নিয়মবিবুদ্ধ হলেও রোগশয্যার হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ে শব্দ শুনলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায় কেবলই উস্খুস্ করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বলি, “অমিয়া, আজ নিশ্চয় তোদের মিটিং আছে।”

অমিয়া বলে, “তা হোক-না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ—”

আমি বলি, “না না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।”

কিন্তু, প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দম্কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরও অনেক উৎসাহী বৃদ্ধ আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে বৃদ্ধলক্ষ্মী বলে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন স্বয়ম্বাহাদুর, পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনার কাঁখে কুঁলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারী নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অভ্যন্তর বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হয়ে না থাকলে তাকে মানার না।

খেতে শূতে তার সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এ পাড়ার ও পাড়ার খবর পেঁছন্ন। কেউ যখন বলে এমন করলে শরীর টিকবে কী করে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, “আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব”; সে তাতে ক্ষুন্ন হয়—ক্রান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দুঃখগোরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগস্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি যে তার এত বড়ো জেল-খাটা দাদা—উল্লাসকর-কানাই-বারীন-উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার শ্বিতীর অধ্যায় পার হয়ে তার যে দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! যেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মোতাত জোগাবার জন্য বলেছি, “অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্য নয়, তোর জন্য বর্তমান যুগ।” আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে—যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কাঁড়কাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি : বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গানের রৌওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলার কক্ষালের আনু নেই—আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ ভাবছিলাম, এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর বলে নয়, ওর সর্বাপেক্ষে মরণদশা দেখা দিয়েছে বলে। প্রাণের সংগীতসভার ওর অস্তিত্বটা বেসরুরো, ওর রুগ্নতা বেরা দাঁবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাঁবি করে, ‘শিয়রের কাছে চূপ করে বসে থাকো।’ প্রাণের দাঁবি, ‘দিকে বিদিকে চলে বেড়াও।’ রোগের বাধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়—এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাঁবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে করে গীতা খুলে বসলাম। প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পেঁচোছি, মনটা রোগ-অরোগের স্বন্দ ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষামণ্ডলীভূত একটি মেয়ে। এ পর্বন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি; বিশেষভাবে তার পরিচয় জানি নে—তার নাম পর্বন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পারে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথা ধরার, গারে বাধার, ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর করে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য দুঃখস্বীকারের অর্ধ নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পারের কাছে তারই প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেরেছি,

কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিশ্চয়গুণ্য হবার উমেদার, এই জেল-খাটা পূর্বরূষের বহু কালের শূকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্বেই বলেছি, সেবার আমার অভোস নাই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে পূজা-অর্চনাষ তারা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ বাড়িতে আর সর্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পূজোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালো-রকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাধাবিধি নেই, আর দেবম্বিজ যেখান থেকে খাঁতির না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না- বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কারণে অমিয়াকে তিন টিলেমির ঢালু তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেলা থেকে অশ্বেক আন ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট। বছরে বছরে মিশনারি ইন্সকুল থেকে ফ্রক্ পবে বেণী দু'লিয়ে চারটে-পাঁচটা করে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় বিবর্তী হইয়েছে সে বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কোঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আব-কি। এমনি করে পরীক্ষা-দেবার কাছে সিদ্ধির মানত করে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাত্তে সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাস-গ্রহণেও যেমন পাস-ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো করে তার যে খাঁতি - পড়াশুনো ছেড়ে তার চেয়ে খাঁতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ সে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুসালিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগোঁয়ে পোষা মেয়েগুলির পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাথাসদনে সে সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠানোর জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, “সে কী কথা—এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে। অনাথ হোক সনাথ হোক, মেয়েরা চায় খর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেয়ে কস্তাবন্দী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।”

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট করে পারে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সংকুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মূখের সামনে ধরে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নববয়সের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নতুন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়; আমার কাছে তারই সাহায্য আবশ্যিক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে শুভদল খুব বিচলিত—এই নিয়ে তারা একটা

ধুমধাম করবে বলে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিয়ন্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মূখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা যদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, “দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—”

প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ করে বলে ফেল্লেম, “পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।”

পুলিস-সার্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্য মিথ্যে কথা বলে ফেললুম। এবারেও শাস্তি শব্দ হল। অমিয়া আমার পায়ে কাছ বসল। হরিমতি তাকে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কী-একটা বললে, সে ঈষৎ মূখ বাকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ন আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি ‘দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টোঁকে না দুর্ঝ!’

ধড়ফড় করে উঠে বসে বল্লেম, “অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জমা করে ফেলি।”

“এখন থাক্-না দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই-না?”

‘না, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী করে তোর মাথায় এল তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস বর্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অর্থাৎ বিরাত, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তার স্থান হয় না—এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি : With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।”

অমিয়ার পা টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না—তবু এম্পারিনের বাড়ি গিলে বসে গেলেম।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গলির মোড় থেকে ভালুক-নাচওয়ালার ডুগ্‌ডুগি শোনা যাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন যুগলকুমারী কতব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নিজের বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে স্থিখা করতে করতে কখন হঠাৎ এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোকা গেল, কাল অমিয়ার মূখের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মিটিং বসেছে। অমিয়া বান্ধ থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা করে বলে

ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করছে। ভাগ্যে বলি নি।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সময়ে অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মৃদুশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তার পাখার গতি খুব মৃদু হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে বসে খুব শক্ত সুরে বললে, “দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সে-সব ধনীঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরি নয়। গরিব মেয়ে, বারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জনে বাধ্য দেয় মাঠ। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে, যেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ—তা হলে—”

বুঝলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেম, “অর্থাৎ, তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী! তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে; বুদ্ধিতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।”

আমার ক্ষান্তস্বভাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই ‘অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্’। ফল হল এই যে, অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে—তার নাম প্রসন্ন। তাকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, “দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।” সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মূখে বলে যে তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে এমনতরো টেপার্টোপ করে কেবলমাত্র তাকে অপদস্ত করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যার রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো, নববঙ্গের ভাইফোঁটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করলে, অস্টটা তারই উদ্দেশ্যে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কন্টকেনৈব কন্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হল। তবুও শেল্যকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দাঁখি—কিন্তু, সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরও দুই-চারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশ-বিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা করে দিলে, যাতে পালা করে আমার নিতাসেবা চলে। এ দিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছ, না বলে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন, “একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।”

আমি হেসে বললেম, “পুজোর বাজারে চলবে না কি।”

“একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হাল্কা-রকমের জিনিস।”

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইছে।  
লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাল্কা প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল।

ঠিক সেই মূহুর্তে এল অনিল। বললে, “মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা  
পড়ুন।”

চিঠিতে আমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে;  
এ কথাও বলেছে, আমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন আমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু  
জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রম্মাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে  
বললেম, “পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই স্খলিত হলে যায়, এ তো তোমরা  
আমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পক্ষ, তাতে পক্ষের চিহ্ন নেই।”

নববঙ্গের ভাইফোটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোটা রয়েছে তৈরি, কপাল  
মেরেছে দৌড়। আর শুনোছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লার স্বরাজ-প্রচারের কী-  
একটা কাজ নিয়েছে।

আমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে  
ফিরে আসার পর শশ্রুবার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দুটো খালাস পেয়েছে।

## সংস্কার

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ বলে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কবুল করলে অপবাধের মাত্রাটা হালকা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী-একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে কবে বেরিয়েছিলেন - চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়োবাজাবে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি করে তাঁর নাম দিয়েছিল ধুবরতা। আমার নাম গিরীন্দ্র; দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর প্রতি বলেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ করে না। বিধাতার কৃপায় পৈত্রিক উপভোগের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদ-আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শকেনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত চিলে, কিছুই বেশি করে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ঘটেছে তার অব মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিভেব বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল—তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার ব্যতী প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মিলে না বলে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা বলে স্বীকার করতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থাবলীসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি। আমার শত্রুরাও কবুল করবে যে, সে বই পাড়েও থাকি; বন্ধুরা খুবই জানেন যে, পাড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।—সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মানুষ এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে আমি রবিবারে আসন্ন জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণ-বিহারী। ছাদে বসে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভেদ তখন আমাদের পক্ষে সন্দিগ্ধ ছিল না। তখনকার পলিস কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিঁড়িগানের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-শ্বেতপায়ন বলেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা বলেই সেদিন দেশভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পজ্জা মেলা শব্দ হয়েছিল। যে সরোবরে তাঁর শ্বেতপশ্ম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে

না, বরঞ্চ বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মীগণের সদৃশ্যস্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খন্দর পারি নে; তার কারণ এ নয় যে, খন্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই, বা বেশভূষার আমি শোঁখিন। একেবারে উন্টো—স্বাদেশিক চাল-চলনের বিরুদ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুখালু রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার পূর্ববর্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শাট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দুটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেলাল করতুম না—ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল।

সে বলত, “দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোতে আমার লজ্জা করে।”

আমি বলতুম, “আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ে।”

আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, “তোমার সঙ্গে বেরোতে আমার লজ্জা করে।” তখন কলিকা যে দলে ছিল তাদের উর্দি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে দলে ভিড়েছে তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম করে মেনে নিতে পারে না। কনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে ব্যথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাতে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না; পৃথক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুর্নিবারভাবে সুড়সুড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিষ্খন্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য-মাত্র ছিল না। বৃন্দ্রের অভিমান থাকতে বিনা তর্কে তার ভংসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি—স্বভাবের প্রবর্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টিতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, “মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা বোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাট বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বৃন্দ্রের স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খন্দর-পরাটা সেইরকম মালা-তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।”

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্তা বৃষ্টি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা



বললে, “দেখো, খন্দর-পরার শূচিতা যৌদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বন্ধ হয় তখন সেটা হয় সংস্কার; তখন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে ম্বিধা করে না।”

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আশ্রিত বাক্য; তার থেকে কোটেশনমার্কা করে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বর্চিন্তিত বলেই জানে।

‘বোবার শত্রু নেই’ যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিলুম না দেখে কলিকা ম্বিগুণ কোঁকে উঠে বললে, “বর্ণভেদ তুমি মূখে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই কর না। আমরা খন্দর পরে পরে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।”

বলতে যাচ্ছিলুম, ‘বর্ণভেদকে মূখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মর্গির কোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মূখস্থ বাক্য নয়, মূখস্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।’ তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীর্ণ পুরুষমানুষ মাত্র, চূপ করে রইলুম। জানি আপোসে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক শূরু করি কলিকা সেগর্দালিকে নিয়ে বোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছাড়িয়ে কচালিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুমহল থেকে। দর্শনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, “কেমন জ্ঞান।”

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দু-কালচারে সংস্কার ও স্বাধীন বৃষ্টি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতার আমাদের দেশকে অন্য-সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তন্ত চায়ের ধোয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনার বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পত্রলেখায় মর্নিডিত অর্নিডিতপত্রবতী নবীন বহির্গর্দাল সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে; শূভদৃষ্টিমাত্র হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুষ্ঠন মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্বরাগ প্রতি মূহূর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তবু বেরোতে হল; কারণ, ধুবরতার ইচ্ছাবগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন-সকল ঘূর্ণির্প ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্প একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে শ্বলোদর হিন্দুস্থানি ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা-প্রকার অপখ্য সর্টি হচ্ছে তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা ছান্না। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োরারিরা নানা বহুমূল্য পুজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শূন্যতে পেলেম মার-মার ধর্নি। মনে ভাবলুম, কোনো গাটিকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফুকতে ফুকতে উস্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার বৃড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একটু আগেই রাস্তার

কলতলার স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে কাটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা সেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সপো চলোঁছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সপো বা কিছুর সপো তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুন্নয়ন করছে, “দাদাকে মেরো না।” বড়োটা হাত জোড় করে বলছে, “দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, কসুর মাফ করো।” অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সপো কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলুম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, “করছ কী। ও যে মেথর!”

আমি বললুম, “হোক-না মেথর, তাই বলে ওকে অন্যায়ে মারবে?”

কলিকা বললে, “ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।”

আমি বললুম, “সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।”

কলিকা বললে, “তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না—হাড়িডোম হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!”

আমি বললুম, “দেখছ না স্নান করে ধোপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।”

“তা হোক-না, ও যে মেথর!”

শোফারকে বললে, “গঙ্গাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।”

আমারই হার হল। আমি কাপড়বুঝি। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর বুদ্ধি বের করেছিল—সে আমার কানে পৌঁছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

## বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীব-জন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে—তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না—কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগাম্ভীর, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চূপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পূর্বাদকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিক্তে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিষে ওঠে, কন্ কন্ করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শূন্যতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছানের উপর বিকলবেলাকার বোদন্দুব পড়ে আসে, গা বুলে বেড়ায়, সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমার বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অবাক স্মৃতিতে; কল্পনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভারে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন-মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনোঁছ সব নিয়ে জোড়া-তড়া নিয়ে, অতি পুরানো বটের কোঠেরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, সোণমা-বেণমা, তাদের গল্প। ঐ ডাবা-ডাবা-চোখ-মেল-সর্বদা-ত্রিকয়ে-থাক; ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেঁধে নীচে পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আন্তরগটা একটা স্থির পন্থা তা ওর মনে হয় না; ওর নোংরা হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িরে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায়ই তারই সেই ঢাল বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াত গড়াত ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি সাগত আর ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের বোদন্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্ত আস্ত গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তম্ভ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্-ছম্ করে—এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কাজের দাদা-মশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কৌকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য-গাঞ্জয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে-একটা বয়সভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গেল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বন্ধেছে। এইজন্যে বাথটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে অমূল্যিক পাড়ে; ও কিছ্ বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিঁরিয়ে চলে যায়। ওর সংগীরা ওকে খাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছাড়ি দিয়ে দু'পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নের—ওর কানতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রতাহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কান্টকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম্ন ফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শোঁখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কারিকর কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলা-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কারিক বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে বন্ধুতে পেরেছিল, কতকগুলো বাথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলাই—ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাকি আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপাথক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে—দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পচে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দু'লোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃত-

ভান্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাভণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহনির্শি আকাশে উচ্ছ্বাসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেরেছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলাম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়াছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জারগায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলাম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হার রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই বাগ্ন হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পান্না দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বৃদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে—আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললাম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পাশে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললাম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড় হলে চার দিকে তুলো ছাড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কারিকর কাছে। কোলে বসে তার গলা ছাড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে কাদতে বললে, "কারিক, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কারিক আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ' আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলাম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লক্ষ্যের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজারগায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতর নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠেছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিবে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিবে বেড়ার ধারে পুতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই অঁকে ওঠে, আর ওর কার্ক বলে, “আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।”

আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে—বখন এই ছেলোটী তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেরাল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলোটী আমার নিঃসন্তান ঘরে কার্কর কোলেই মানুব। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কার্দার শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিরে গেলেন সিম্লেয়—তার পরে বিলেত নিরে ঝাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কার্কর কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কার্ক গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিরে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার ঝবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়াল ছাবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিন্তকে ছাড়িয়ে গিরে বলাই অনেক বড়ো হরে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এতদ্র অসংগত হরে উঠেছে যে আর প্রশর দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কার্ককে এক চিঠি পাঠালে, “কার্ক, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।”

বিলেত ঝাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিরে যেতে চাইলে।

তার কার্ক আমাকে ডেকে বললেন, “ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়াল ডেকে আনো।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “কেন!”

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, “সে গাছ তো কাটা হরে গেছে।”

বলাইয়ের কার্ক দুদিন অয় গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পরন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিরে গেল, সে যেন ওর নাড়ী ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওর কেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বৃকের মধ্যে কত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রশনের দোসর।

## চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইন্সকুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা করবই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব-একটা দর্শন স্পর্শনি ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাতে হাতে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া মালিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রূপেয় সোনায়ে কাগজে দাঁড়িয়ে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পক্ষে অবিজ হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিনীর প্রশস্তধারার পাকা বাধানো ঘাটে এসে পৌঁছেছে। গান্ধী-বাগ্‌ওয়ানা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার খুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল।

গোবিন্দব পৈতৃক ভাই মকুন্দ যখন উকিল-লীল; সম্বরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সংগে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারে অন্নবস্তুর সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংস্কপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সংগে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দব 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে দ্রাঘুপ্যন্তর কানে মন্ত্র নিলে— 'পয়সা করে'।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্টে কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর ব্যতিক্রম ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়লা দিয়ে, জাহ্নব রস—ফলসার রস—জব্বার রস—শিউলি-বোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আঘাটের আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে জ্বাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সভাবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, এক তাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্বাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী

অনাবশ্যক খেরালে অবধা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিরে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মদুকুন্দর স্বভাবে অশুভ একটা আত্মবিরোধ ছিল—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিঘ্নবৃদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পরস্যা তাঁর কাজের মধ্যে দিগে বখেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মৃত্ত; অন্তর্গত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাখ্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিরে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অবধা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিরে কটাক্ষ করলে মদুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছ্ রঙ, কিছ্ রঙিন রেশম, রঙের পেন্সিল, কিনে এনে সত্যবতীর অস্ত্রাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিঁধকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিরে বলতেন, "বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।" একদিন একটা মানুুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দড়টোকে পাখির মূন্ড বলে স্থির করলেন; বললেন, "সত্, এটা কিন্তু বার্ষিকের রাধা চাই—বকের ছবি বা হয়েছে চমৎকার!" মদুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনার ছেলেমানুষি কল্পনা করে মনে মনে যে রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রব্র, আশা করতে পারতেন না; শিল্পসাধনার তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিরে অশুভ অত্যাতি করতেন সেদিন সত্যবতী কেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্তর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট করে বুকোঁছিলেন যে, তাঁর কলজাড়িত সম্পত্তির তার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার বার চালনার কৌশলে ফুটো নোকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলোট সম্পূর্ণভাবে গিরে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জামিরে দিলেন, সর্বান্ত্রে এবং সকলের উপরে পরস্যা। গোবিন্দর এই উপদেশের মতো এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জার কুণ্ঠিত হ'ত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পরসার সাধনা চলল। তা নিরে কথার কথার আলোচনা না করে তার উপরে যদি একটা আত্ম থাকত, তা হলে কতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়—কিন্তু, সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে চিত্রভাব মদুকুন্দর, তার মতো একটি অসামান্য মৰ্বাঙ্গা আছে, সেই সব চেয়ে ঔর্যকিত; তাকে আঘাত করা, বিদ্গুপ করা, সাধারণ রুচস্বভাব মানুুষের পক্ষে অভ্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছ্, কিছ্ উপকরণ আবশ্যক। এককাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অসামান্য সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ কেন তাঁর মাথা



কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে। ভৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্প-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম করে দেয়ালের গায়ে পর্ষন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতার কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দুদেব শিশুর চিন্তকেও প্রলুপ্ত করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি—বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না—বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অম্ভুতত্ব নিয়ে খুব অটুহাস্য জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রুপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট হিসাবে ফাঁকি—এমন-কি, তার টেকনিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মাসির বাড়িতে। ম্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, “এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্ট মূর্তি তাজা বেরিয়েছে—এর মধ্যে দাগা-বুলানোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের করে আমাকে দেখাও।”

কোথা থেকে বের করবে। যে গুণী রঙে রঙে ছায়ার আলোর আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিবি দিলে তাঁর মাসিকে বললেন, “এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।”

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে প্রাণের ছায়ার আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন।

নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনভরো ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে ‘ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সমিবেশঃ’ বললে অত্যাতি করা হবে। এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্সুরোরেন্স আপিস কিছতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুঁশি তাই করছেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মস্ত-চোখ-মেলা ছেলোটিকে তঁধেবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন করে উঠলেন, “কী হচ্ছে রে!”

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মূখ হল কীকাসে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষার চূনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চূনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন। চূনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতে। সেইখান থেকে ছেলের কাছা শব্দে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খন্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চূনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এ’রুই পরে তার স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, “কেন তুমি চূনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।”

গোবিন্দ বললেন, “পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী।”

সত্যবতী বললেন, “আখেরে ও যদি পথের ভিক্রক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বে’র চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।”

গোবিন্দ বললেন, “আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।”

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চূনির হাত ধরে বললেন, “চল, বাবা।”

চূনি বললে, “কোথায় যাবে, মা।”

“এখান থেকে বেরিয়ে যাই।”

রঙ্গলালের দরজায় এক-হাটু জল। সত্যবতী চূনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, “বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও একে পয়সার সাধনা থেকে।”

## চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ন। আমি লাভ করেছি কাপড়দুশতা দিয়ে, সে কথা আমার স্ত্রীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে; যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বচ্ছ সাবাস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ পুরুষ ডুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম হোসে মাল খালাস করে নিরেছে সমাজের ছাড়চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহার-ওরালার সরকারি প্রতাপ উপরওরালার দেওয়া তকমার জোরে; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান; তার ধরো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্ষায়। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সূনেতার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আঁপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফলসার সবরং, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো রূপোর খালার গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইসক্রীমের যন্ত্রে জমানো, শাসে রসে মেশানো, তালশাস এক-পেয়াল্লা, আর পিরিচে একটামাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছুর নয়, কিন্তু বোঝা যায় দিনে দিনে নতুন করে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন করে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর, 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সূনেতার, নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল সূনেতার। ওর নিজের বয়স আর্টিস্টশ, কিন্তু সবসময় সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আঙ্গিক অনুষ্ঠান।

সূনেতা ভালোবাসে শান্তিপূরে সাদা শাড়ি কালো-পাড়-ওরাল্লা। খন্দর-প্রচারকদের যিকারকে কিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিরেছে, কিছুতেই স্বীকার করে নি খন্দরকে। ও বলে, 'দাঁশ তাঁতির হাত, দাঁশ তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সূতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিরে।' আসল কথা, সূনেতা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে নতুনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উন্মাসিত হয় ওর সাজে—আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমের রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মৌকি পরস্যা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সূনেতা আপন মনপ্রাপ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধরে।

ওর শত্রু লগাটে কুম্ভুর্বিন্দুর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত কিস্ময়ের বাণী। ওর নির্খল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছ হতে হয় নি সাধারণ জগতের যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। অন্যদে আপনাকেই জানি আর-একজন যখন প্রেমে জ্বেনেছে আমার আপনকে।

২

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। বাকে বলে ঘুমিয়ে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নয়। আশ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীর-মনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট্‌ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ার দৌড়খাপ করি, শিকারে শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, 'যে কাজ পাছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে।' হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, পুর্নকের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামী। সুনেশার জন্মীপতি অধ্যাপক; ইম্পীরিয়াল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জর্জাল 'নিস্‌পেক্টের সাহেব' হয়ে সোজার হ্যাট পরে বাঘ-বালুকের চামড়ার মেকে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গুরুত্ব কমিয়ে রাখত, সেই সঙ্গে কমানত আমার পদের গৌরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনার। কী জানি, এই লাঘবে মেয়েদের আত্মাভিমান বৃদ্ধি কিছ কন্ন করে।

এ দিকে ডেস্ক-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার বৌবনের ধারা আসছে তৌতা হয়ে। অন্য কোনো পুর্ন হলে সে কথাটা নিশ্চিত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধি-বিস্তারকে দুর্বিপাক বলে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, সুনেশা মৃদু হরোছিল শব্দ আমার গুণে নয়, আমার দেহসৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বরচিত যে বরমালা অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনার। আশ্চর্য এই যে, সুনেশার বৌকন আজও রইল অক্ষয়, দেখতে দেখতে আমিই চলছি ভাঁটার মধ্যে—শব্দ ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে আনল আমার মেয়ে অরুণা। আমাদের জীবনের সেই উবারুপরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তারুণ্যের নবপ্রভাতে। দেখে পুর্লকিত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। শৈলেনের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবির্ভূত। বৌবনের সেই কিপ্রশান্তি, সেই অজস্র প্রফুল্লতা, আবার কপে কপে প্রতিহত দুর্ভাগ্যের স্মারমান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেইদিন আমি যে পথে চলতুম সেই পথ ওরও সামনে, ভেঁমনি করেই অরুণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও সৃষ্টি করছে, কেবল যথেষ্ট লক্ষ্যমোচন নই আমিই। অপর পক্ষে অরুণা জানে মনে মনে, তার বাবা বোকে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্রে অরুণা অপ্রের করুণা নিয়ে চূপ করে এসে বসে আমার পারের কাছে মোড়ান। ওর মা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি পারি নে।

অরুণার মনের কথা ওর মা যে বোকে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই

‘প্রভাতে মেঘডম্বরম্’, বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই স্নেহের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু স্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনার নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার ব্যেস হোক আগে, তার পরে, ইত্যাদি। হায় রে, বিবেচনা করবার ব্যেস ভালোবাসার ব্যেসের উল্টো পিঠে।

কয়েকদিন আগেই এসেছিল ‘ভরা বাদর মাহ ভাদর’। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রথম মৃদুতা অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অরুণা আমার লাইব্রেরি ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ার জানলার সামনে সে চূপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, পূর্বে হাওয়ার বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

স্নেহটাকে কিছু বললেন না। তখন শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ আবির্ভাব স্নেহের পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকে বললেম, “গণিতে আমার ষেটুকু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়ান্টাম্ খিওরিটা যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাই, আমার সেকলে বিদ্যেসাধ্য অত্যন্ত বেশি অর্থব্ হয়ে পড়েছে।”

বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অরুণা তার বাবার চাতুরি স্পষ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়ান্টাম্ খিওরির ঠিক শুরুর্তেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়ফড়িয়ে উঠে বললেম, “জরুরি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।”

টেলিফোনে আওয়াজ এল, “হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।”

আমি বললেম, “না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।”

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরুর্ত করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বার্তি জেরলে।

স্নেহটা এল ঘরে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, “মিটিংরলজিস্ট্, তোমার মুখ দেখলে বড়ের সিগনাল দিত।”

ঠাট্টায় ষোগ না দিয়ে স্নেহটা বললে, “কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্নর দাও বারে বারে।”

আমি বললেম, “প্রশ্নর দেবার লোক অদৃশ্যে আছে ওর অন্তরায়ার।”

“ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমানুষিটা কেটে যেত আপনা হতেই।”

“ছেলেমানুষির কসাইগিরি করতে হাবই বা কেন। দিন যাবে, বরস বাড়বে, এমন ছেলেমানুষি আর তো ফিরে পাবে না কোনো কালে।”

“তুমি গ্রহনকণ ঘান না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।”

“গ্রহনকৃত কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দুজনে বে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।”

“তুমি বুঝবে না আমার কথা। যখন আমরা জন্মাই তখন আমাদের বথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনার আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীষ। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।”

“বথার্থ দোসর চিনব কী করে।”

“নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।”

০

আর লোকনো চলল না।

আমার স্বশুর অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনোদি পশ্চিম-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতুষ্পাঠীর আবহাওয়ায়। পরে কলকাতার এসে কলেজে নিয়েছেন এম.এ. ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনই বুদ্ধিপন্থি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈরায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিদ্ধ; আমার স্বশুরও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেরেছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনকৃতের উপর, একরকম গোড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে সুনেন্দ্রা; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনকৃতের কড়া পাহারা।

আমি ছিলাম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেন্দ্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সুযোগ হয়েছিল বারবার। সুযোগটা যে ব্যর্থ হয় নি সে খবরটা বেতার বিদ্যুৎবার্তার আমার কাছে ব্যস্ত হয়েছে। আমার শাশুড়ির নাম বিভাবতী। সাবেক কালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম ঘটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনকৃত তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইষ্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন, “ভরে ভরে তুমি পেরোদাগুলোর কাছে সেলাম ঠুকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।”

স্বামী বললেন, “ঠকবে। রাজা থাকলেও বা, না থাকলেও তা; লাঠি-ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেরোদার দল।”

শাশুড়ি-ঠাকরুন বললেন, “ঠকব সেও ভালো। তাই বলে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জ্বতোর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না।”

আমার শাশুড়ি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অব্যাহত। অবকাশ বুঝে একদিন তাঁকে বললেন, “মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পারে ধরব অধ্যাপকের।”

তিনি বললেন, “অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাহা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।”

দিলেম এনে। তিনি বললেন, “হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “মেয়ের মা?”

বললেন, “আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।”

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে বুঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা বুঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, “সুনেত্রার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সহিতে পারব না।”

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অক্ষয়াল থেকে সুনেত্রাকে উদ্ধার করে আনলেম। চোখের জল মুছতে মুছতে মা বললেন, “পুণ্যকর্ম করেছ বাছা।”

তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

### ৪

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে বললেম, “আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।” নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের কাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে সুনেত্রাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, “সুনি, আমাকে তোমার বখাৰ্ব দোসর বলে মান তুমি?”

“এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।”

“তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?”

“নিশ্চয় মানে, আমি বুঝি জানি নে?”

“এতদিন তো একত্রে কাটল আমাদের, কোনো সংসর্গ কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।”

“অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।”

“সুনি, দুজনে মিলে দুঃখ পেরোছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলের মারা গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি বখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল করে দাদা নিরেছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্বতারা। পুত্রের ছুটিতে যাঁড়ি যাওয়ার পথে নৌকোডুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মরা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম, বিবরবৃষ্টিহীন অধ্যাপক কল রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই কল স্বীকার করে নিলেম। কেনন করে জানব এই-সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দৃষ্টগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না।”

সুনেচা কোনো উত্তর না করে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, “সব দুঃখ-দুর্ভাগ্যের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।”

“নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।”

“মনে করো, যদি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়, সেই কতি কি বেঁচে থাকতেই আমি পূরণ করতে পারি নি।”

“থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।”

“সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সঙ্গে এক দিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।”

চুপ করে রইল সুনেচা। আমি বললেম, “তোমার অরুণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, এইটুকু জানা যথেষ্ট; বাকি সমস্তই থাক্ অজানা, কী বল, সুনি।”

সুনেচা কোনো উত্তর করলে না।

“তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিলুম, বাধা পেরোছি। আমি সংসারে শ্বিতীর-বার সেই নিষ্ঠুর দুঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণার। ওদের দুঃখনের ঠিকুজির অঙ্ক মিগিরে সংশয় ঘটেতে দেব না কিছুতেই।”

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে পারের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাচ্ছে। সুনেচা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললে, “কী বাবা শৈলেন! এখনি তুমি যাচ্ছ নাকি।”

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, “কিছু দেরি হয়েছে গেছে, ঘাড় ছিল না, বন্ধতে পারি নি।”

সুনেচা বললে, “না, কিছু দেরি হয় নি। আজ রাতে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে হবে।”

একেই তো বলে প্রশ্ন।

সেই রাতে আমার ঠিকুজি-সংশোধনের সমস্ত বিবরণ সুনেচাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, “না বললেই ভালো করতে।”

“কেন।”

“এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।”

“কিসের ভয়। বৈষবায়োগের?”

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনি। তার পর বললে, “না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে শ্বিগ্গদু মৃত্যু।”



